الإسلام
والطب الحديث

Islam and Modern Medical Treatment

ইসলাম
ও
আধুনিক চিকিৎসা

আল্লামা মুফতী দিলাওয়ার হোসাইন

প্রিন্সিপাল, শায়খুল হাদীস ও প্রধান মুফতী

জামি‘আ ইসলামিয়া দারুল উলূম ঢাকা (মসজিদুল আক্‌বার)

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও প্রধান মুফতী

মারকাযুল বুহূস আল ইসলামিয়া ঢাকা

ইসলাম ও অধুনিক চিকিৎসা

আল্লামা মুফতী দিলাওয়ার হোসাইন

প্রথম প্রকাশ : রজব, ১৪৩০ হি. জুলাই, ২০০৯ ঈ.
দ্বিতীয় সংস্করণ : রজব ১৪৩২ হি. জুন ২০১১ ঈ.
(পরিবর্ধিত পরিমার্জিত)
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশনায় : সা'দ প্রকাশনী, মিরপুর-১, ঢাকা
বর্ণবিন্যাস : ক্যাটকো কম্পিউটার্স
১/এইচ, ৩/৪, মিরপুর, ০১৭১৪-৩২৩২৯৬
মুদ্রণে : মোহাম্মাদী লাইব্রেরী, ঢাকা।

হাদিয়াঃ ৪০০.০০ টাকা, US $ 25.00

প্রাপ্তিস্থানঃ
মারকাযুল বুহূস আল ইসলামিয়া ঢাকা
ই/৩/২১, মিরপুর-১২, ঢাকা-১২১৬
জামিআ ইসলামিয়া দারুল উলূম ঢাকা
(মসজিদুল আকবার), ব্লক- সি ও ই, প্লট- ম-৩, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬
০১৯১৯-০০১২০০, ০১৯২০-৭১৩১৪০
ইদারাতুল মা'আরিফ আল ইসলামিয়া ঢাকা
৬৮, রূপালী হাউজিং এষ্টেট, মিরপুর-৩, ঢাকা-১২১৬
মীজান লাইব্রেরী এন্ড ষ্টেশনারী, জামিআ মার্কেট,
(মসজিদুল আকবার), মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬
মোবাইল ঃ ০১৯১১-৪৭৪০৬৬
ইসলামিয়া কুতুবখানা
নিরালা পট্টি, হরিনাথদত্ত লেন, যশোর।
০১১৯৭১০০৯৬৯, ০১৯১৩৯৯৭৪৭১
এবং দেশের অভিজাত লাইব্রেরীগুলোতে পাওয়া যাচ্ছে।

Islam o Adhunik Chikitsa (Islam and Modern Medical Treatment): Written by, **Allama Mufti Delawar Hossain**, Principal of JameaIslamia Darul Uloom Dhaka (Masjidul Akbar), Mirpur-1, Dhaka- 1216 and Founder Director of Markajul Buhus Al-Islamia Dhaka, Mirpur- 12, Dhaka- 1216. Published by: Saad Prokashoni, Mirpur-1, Dhaka, Bangladesh. email: m.masum87@gmail.com
1st Edition: July 2009, **2nd Edition: June 2011**
Price: Tk. 400.00 Only, US $ 25.00

আল্লামা মুফতী দিলাওয়ার হোসাইন দা. বা. এর
সংক্ষিপ্ত জীবনী

যে সকল প্রাতঃস্মরণীয় দ্বীনের কাণ্ডারী তাঁদের প্রতিভাদ্বীপ্ত জীবন ও অবিস্মরণীয় অসামান্য অবদানের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহের দিক-নির্দেশক জ্যোতিষ্কের ন্যায় অনুকরণীয়, বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমে দ্বীন, প্রখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন, শ্রেষ্ঠ মুফতী, অভিজ্ঞ ফকীহ, বিশিষ্ট ইসলামী অর্থনীতিবিদ ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতী দিলাওয়ার হোসাইন দা. বা. তাঁদের অন্যতম।

তাঁর ব্যস্ততম জীবনে তিনি ইসলামী জ্ঞান-গবেষণা, যুগ চাহিদার শরয়ী সমাধান, বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান গ্রন্থ রচনা, জ্ঞানের প্রচার-প্রসার ও পৃষ্ঠপোষকতা, ওয়ায-নসীহত এবং আধ্যাত্মিকতার এক বিরল ব্যক্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করছেন। তাঁর জীবন ও কর্ম আমাদের জন্য এক অনুপম আদর্শ।

জন্ম ও বংশ ঃ

বাংলাদেশে ১২৫৪ খৃষ্টাব্দে হযরত শাহ জালাল মুজাররাদে ইয়ামানী (রহ.) এর সাথে ইয়ামান থেকে ৩৬০ জন আউলিয়ায়ে কিরামের আগমন ঘটে। তাঁদের মধ্যে অন্যতম একজন ছিলেন হযরত মোল্লা দিওয়ান শাহ (রহ.)। তাঁরই বংশের অধঃতন ১১তম পুরুষ হলেন আল্লামা মুফতী দিলাওয়ার হোসাইন দা. বা.। তাঁর পিতার নাম হযরত মাওলানা দ্বীন মুহাম্মাদ (রহ.)। তিনি বাংলাদেশের অন্যতম জেলা কুমিল্লার অন্তর্গত মনোহরগঞ্জ সাবেক লাকসাম থানাধীন বান্দুয়াইন গ্রামের মোল্লাবাড়ীতে ১৩৮৪/১৩৮৬ হিজরীতে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম আলেম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

ইল্‌মে দ্বীন অর্জন ও শিক্ষা জীবন ঃ

তিনি চার বছর বয়সেই তাঁর আম্মাজান, বড় ভাই মৌলভী মুহিব্বুল্লাহ ও সেজ ভাই মাওলানা নুরুল্লাহ এবং তাঁর আব্বাজানের কাছে কুরআনে কারীম পড়া শেখেন। সে বছরেই অর্থাৎ ১৩৮৭ হি. মোতাবেক ১৯৬৭ ঈ. সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং সেখানে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেন।

এরপর ১৩৯৪ হি. মোতাবেক ১৯৭৩ ঈ. সালে জামি'আ হুসাইনিয়া মাদানিয়া মুনশিরহাট মাদরাসায় ভর্তি হন এবং সেখানে আমাদের দেশের কওমী মাদরাসার প্রচলিত সিলেবাস এর অধীনে হিদায়াতুন নাহব জামাত (অষ্টম শ্রেণী) শেষ করেন। এ সময়ে প্রত্যেকটি পরীক্ষায় মুমতায তথা ষ্টার মার্ক নিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। সেখানে উর্দূ ও ফার্সি ভাষা এবং এ দু'ভাষায় রচিত বিভিন্ন বই-পুস্তক অধ্যয়ন করেন। মাদরাসায় ভর্তি হওয়ার প্রথম বছরেই উর্দূ ও দ্বিতীয় বছরে ফার্সী ভাষায় তাঁর আব্বার কাছে চিঠিপত্র লেখা আরম্ভ করেন। মাদরাসার প্রাথমিক এ পাঁচ বছরে তিনি উর্দূ ও ফার্সী রচনাশৈলীতে পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করেন। এক্ষেত্রে তাঁর পৈতৃক দিক থেকে জন্মগত প্রভাবও কম ছিল না। কারণ তাঁর আব্বাজানও একজন বড় আলেম, কবি, বাগ্মী, ওয়ায়েয এবং ফার্সী ও আরবী ভাষায় যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। ১৩৯৯ হি. মোতাবেক ১৯৭৮ ঈ. সালে ইত্তেহাদুল মাদারিস পটিয়া বাংলাদেশ (কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড) এর অধীনে অনুষ্ঠিত সপ্তম মারহালার কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে প্রথম বিভাগে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। এ মাদরাসায় তিনি দীর্ঘ পাঁচ বছর পড়ালেখা করেন।

এখানে উচ্চস্তরে আর কোন জামাত (শ্রেণী) না থাকায় তিনি ইস্তেখরার মাধ্যমে ১৩৯৯ হি. মোতাবেক ১৯৭৮ ঈ. সালে চাঁদপুর শাহ্‌রাস্তি থানার জামি'আ ইসলামিয়া আরাবিয়া খেড়ীহর মাদরাসায় জামাতে কাফিয়ায় (নবম শ্রেণীতে) ভর্তি হন এবং সেখানে দীর্ঘ চার বছর ইলমে দ্বীন অর্জন করেন। বিশেষ করে সরফ, নাহব, ফিক্‌হ, উসূলে ফিক্‌হ, বালাগাত, মানতিক ইত্যাদি শাস্ত্রে খুবই পারদর্শীতা হাসিল করেন। তিনি

সেখানেও সকল পরীক্ষায় মুমতায তথা ষ্টার মার্ক নিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং পুরস্কৃত হন।

অতঃপর তিনি দ্বীনী ইলমের পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে ১৪০৩ হি. মোতাবেক ১৯৮২ ঈ. সনে বাংলাদেশের অন্যতম ইসলামী বিদ্যাপিঠ ও ইলমী মারকায জামি'আ কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ ঢাকায় জামাতে জালালাইন-এ ভর্তি হন এবং ১৪০৫ হি. মোতাবেক ১৯৮৫ ঈ. সালে দাওরা হাদীস (মাস্টার্স) শেষ করেন। সেখানে বড় বড় আলেমে দ্বীন বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ উস্তাদগণের নিকট ধারাবাহিকভাবে তিন বছর ইলম অর্জন করেন। একই ধারাবাহিকতায় সেখানেও তিনি কঠোর পরিশ্রম, চেষ্টা-মেহনত ও সাধনার মাধ্যমে ইলম ও মারিফাতের উচ্চ শিখরে উপনিত হতে সক্ষম হন। এখানেও প্রতি পরীক্ষায় পূর্বের ন্যায় মুমতায তথা ষ্টার মার্ক নিয়ে উত্তীর্ণ হন। দাওরায়ে হাদীসের বার্ষিক পরীক্ষায় প্রতি বিষয়ে কমপক্ষে ৪০ ও উর্ধ্বে ৬৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত লিখেছেন।

এ সময়ে তিনি ইলমে মা'রিফাতের তৃষ্ণা ও পিপাসা উপলব্ধি করে প্রখ্যাত বুযুর্গ শায়খ মুহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর (রহ.) এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন।

উচ্চ শিক্ষা অর্জনে বিদেশ গমন ঃ

উচ্চ শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে ১৪০৫ হিজরী মোতাবেক ১৯৮৫ইং সনে পাকিস্তানের সাবেক রাজধানী করাচী গমন করেন। সেখানে পাকিস্তানের সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠ সর্ববৃহৎ ইসলামী মারকায 'জামি'আ দারুল উলূম করাচী' যাকে 'পাকিস্তানের কর্ডোভা' ও 'পাকিস্তানের আযহার' বলা হয়। দ্বীনি ইলমের উচ্চতর গবেষণামূলক সর্বোচ্চ স্তর 'তাখাস্‌সুস ফিল ফিক্‌হ ওয়াল ইফতা' (পিএইচ.ডি.) তথা ইসলামী আইনের উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা এবং দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাবলীর শরয়ী সমাধান প্রদান (ইফতা) বিভাগে ভর্তি হন। এখানেও তিনি পূর্বের ন্যায় ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, কঠোর পরিশ্রম, নিরলস অধ্যাবসায়, প্রচুর অধ্যয়ন, গভীর গবেষণা এবং ফাতওয়ার প্রশিক্ষণে নিবেদিত হন। প্রথম এক বছরেই

অধ্যয়ন করেন প্রায় দশ হাজার পৃষ্ঠা। ফলে ইলমের গভীর সাগরে পৌঁছার জন্য ব্রত হলেন শায়খুল ইসলাম মুফতী তাকী উসমানী (দা. বা.) এর সূদীর্ঘ ১১ বছরের অবিচ্ছেদ্য সান্নিধ্য গ্রহণের মাধ্যমে। এখানেও তিনি প্রত্যেক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং দুই পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান ছাড়া বাকী সকল পরীক্ষায় প্রথম স্থান অর্জন করেন।

অতঃপর ফিকহে হানাফীর মূলনীতি বিষয়ক এক অনবদ্য কিতাব 'আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ির' এর প্রথম অংশের ৪র্থ কায়েদা হতে শেষ কায়েদা পর্যন্ত ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করেন ছয় খন্ডের আঠারশ' পৃষ্ঠার এক বিশালাকার দফতরে। যা ছিল তাঁর অভিসন্দর্ভ বা থিসিসপত্র। যখন তিনি এর ছয় খন্ড পূর্ণ করে ১৪১০ হিজরীতে শাইখুল ইসলামের কাছে জমা দেন, তখন তাঁর পাশে থাকা মাকতাবায়ে দারুল উলূম করাচীর নাযেম বলেছিলেনঃ

"আমার জানামতে এ থিসিসপত্রটি জামি'আয় এ যাবত জমা হওয়া থিসিসপত্রগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় থিসিসপত্র"।

শায়খুল ইসলাম মুফতী তাকী উসমানী (দা. বা.) এই থিসিসপত্রটির দুই খন্ড দেখার পর একদিন তাঁর পিঠে মমতা মাখা ও আদর ভরা হাতে থাপ্পড় মেরে বললেনঃ

"আমি তার দু'খন্ড পড়ে দেখেছি, তা আমার মনকে ভরে দিয়েছে খুশিতে, আর চক্ষুদয়কে ভরে দিয়েছে শীতলতায়"।

তাঁর এই মাকালা দেখেই হযরত শায়খুল ইসলাম মুফতী তাকী উসমানী (দা. বা.) তাঁকে জামি'আ দারুল উলূম করাচীতে নিয়োগের প্রস্তাব দেন এবং পরবর্তীতে তা কার্যে পরিণত করা হয়।

আধুনিক অর্থনীতি শিক্ষা

১৪১১ হি. মোতাবেক ১৯৯১ ঈ. সালে শায়খুল ইসলাম মুফতী তাকী উসমানী (দা. বা.) এর কাছে তিনি "আধুনিক অর্থনীতি" কোর্স সম্পাদন করেন।

সাধারণ শিক্ষায় ডিগ্রী অর্জন

তিনি দ্বীনী ইল্‌ম হাসিলের পাশাপাশি সরকারী সাধারণ শিক্ষায়ও ডিগ্রী অর্জন করেছিলেন। এক কথায় তিনি দ্বীনী ও পার্থিব উভয় শিক্ষারই সমাবেশ। তিনি পাকিস্তানের জেনারেল শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ১৯৮৭ ঈ. মোতাবেক ১৪০৭ হি. সনে এস.এস.সি. পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে প্রথম বিভাগ অর্জন করেন। এরপর ১৯৮৯ ঈ. মোতাবেক ১৪০৯ হি. সনে এইচ.এস.সি. পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং ১৯৯১ ঈ. মোতাবেক ১৪১১ হি. সনে ডিগ্রী পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ অর্জন করেন। এ পরীক্ষাগুলোর জন্য তাঁকে মাদরাসা থেকে ছুটি নিতে হয়নি। এস.এস.সি পরীক্ষার সময় মাদরাসার বার্ষিক পরীক্ষার ছুটি ছিল। যেদিন ইফতা ২য় বর্ষের পরীক্ষা শেষ হয় এর পরদিন থেকে এস.এস.সি পরীক্ষা শুরু হয়। আর বাকি এইচ.এস.সি ও ডিগ্রী পরীক্ষার সময় তিনি দারুল উলূমের রচনা বিভাগের সদস্য ও উস্তাদ হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। যোহর থেকে মাগরিব পর্যন্ত মাদরাসার পক্ষ থেকে তার উপর কোন দায়িত্ব ছিল না। আর পরীক্ষাগুলো হতো ২টা থেকে ৫টা পর্যন্ত। তিনি এ সময় গিয়ে পরীক্ষা দিয়ে আসতেন। ডিগ্রী পরীক্ষার মাত্র ১৫ দিন পূর্ব থেকে মাদরাসার দায়িত্বের ফাঁকে ফাঁকে এ সংক্রান্ত লেখা-পড়া আরম্ভ করেন ও পরীক্ষায় অংশ নেন। ফলে তাঁকে এর জন্য কোন ছুটি নিতে হয়নি।

শিক্ষা পরবর্তী জীবন ও কর্ম ঃ

১৯৯০ ঈ. মোতাবেক ১৪১০ হিজরীতে জামি‘আ দারুল উলূম করাচী থেকে পাস করে বের হওয়ার পর প্রিয় মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করেন। যে মাতৃভূমি, পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে বিদেশে সুদীর্ঘ পাঁচটি বছর অতিক্রম করেছেন। তাই তিনি তাঁর শায়খ ও মুর্শিদ শায়খুল ইসলাম মুফতী তাকী উসমানী দা. বা. এর কাছে যান ও

মনের অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেন। শায়খুল ইসলাম এত বছর যাবত তাঁর মাঝে লক্ষ্য করেছেন আশার নিদর্শন, আভিজাত্য ও শ্রেষ্ঠত্বের ছাপ, নিরীক্ষণ করেছেন তাঁর ইলম-আমল ও তাকওয়া এবং পর্যবেক্ষণ করেছেন তাঁর উৎকর্ষ স্বভাব-চরিত্র ও ভদ্রতা। তাই তিনি তাঁকে বললেনঃ

"তোমার ভবিষ্যত পরিকল্পনা কী?"

তদুত্তরে তিনি বললেনঃ এখন তো দেশে যেতে মন চায়, পরবর্তীতে মুরব্বীদের যা পরামর্শ হয় তাই করব। একথা শুনে তিনি বললেনঃ

"পুনরায় ফিরে এসো, তুমি এখানেই থাকবে।"

অন্যদিকে তাঁর সহীহ বুখারী ও সুনানে তিরমিযীর উস্তাদ ও মুরব্বী হযরত শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক সাহেব দা. বা. করাচীর এক সফরে গিয়ে তাঁকে বলেছিলেনঃ

"দিলাওয়ার! দেশে ফিরে আসলে আমার সাথে কথা বলা ব্যতীত অন্য কোথাও খেদমতের জন্য কথা দিওনা।"

তাই তিনি স্বদেশ ও মাতৃভূমি বাংলাদেশে ফিরে এসে তাঁর মুরব্বী শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক দা. বা. এর সাথে সাক্ষাত করতে যান। হযরত শায়খুল হাদীস তখন জামি'আ রহমানিয়ার সামনে বসে উযূ করছিলেন। তাঁকে দেখেই বললেনঃ

"তুমি দেশে এসেছ? ভবিষ্যতের পরিকল্পনা কী?"

তিনি উত্তরে হযরত শায়খুল ইসলাম আল্লামা মুফতী তাকী উসমানী দা. বা. এর কথাটি শুনালেন যে, তিনি দারুল উলূম করাচী ফিরে যাওয়ার জন্য বলেছেন। তাঁর কথাটি শুনা মাত্র তিনি বললেনঃ

"পুটি মাছের কল্লা খাওয়ার চেয়ে কাতল মাছের লেজ খাওয়া ভাল।"

এ কথা বলে তিনি পুনরায় পাকিস্তান যাওয়ার দিকে ইঙ্গিত করলেন। অর্থাৎ এ দেশে থাকলে বড় বড় কিতাব পড়ানোর সুযোগ হবে। আর সেখানে হয়ত প্রথমে ছোট কিতাব পড়াতে হবে, তথাপিও সেখানে থাকা ভাল হবে।

এরপর তিনি তাঁর শায়খ ও মুর্শিদ শায়খুল ইসলাম মুফতী তাকী উসমানী দা. বা. এর কাছে পত্র মাধ্যমে যোগাযোগ করে তাঁর সান্নিধ্যে পুনরায় ফিরে যাওয়ার অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন। অতঃপর যখন দারুল উলূম করাচীতে গিয়ে উপস্থিত হন তখন শায়খুল ইসলাম তাঁর প্রেরিত পত্রের পাশে তাঁকে জামি'আর দারুত তাসনীফের (রচনা বিভাগের) সদস্য হিসেবে নিয়োগ দানের কথা লিখে দেন। যাতে তিনি "আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ির" (الأشباه والنظائر) কিতাবের অবশিষ্টাংশের ব্যাখ্যার কাজ শেষ করতে পারেন এবং পুরো অংশের ব্যাখ্যা একই নিয়ম ও ধাঁচে সজ্জিত হয়। তাই তিনি ১৯৯১ ঈ. মোতাবেক ১৪১১ হিজরীর ১৫ই রবিউল আওয়াল তারিখ থেকে এই মহতি কাজ সম্পাদনে আত্মনিয়োগ করেন এবং উক্ত কিতাবের শুরু হতে দ্বিতীয় কায়দার শেষ পর্যন্ত ব্যাখার কাজ বিশালাকায় চার খণ্ডে বারশ পৃষ্ঠায় সম্পাদন করেন। এর পাশাপাশি মুফতীয়ে আযম পাকিস্তান মুফতী রফী উসমানী দা. বা. ও শায়খুল ইসলাম মুফতী তাকী উসমানী দা. বা. এর বিভিন্ন মাকালা ও রচনাবলীতে সহযোগিতা করতেন।

এ সকল কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও ছাত্রদের এবং বিভিন্ন উস্তাদের জন্য বিভিন্ন জটিল ও দুর্বোধ্য মাসআলা সমূহের সমাধান পেশ করতে ও এর উদ্ধৃতি-কিতাব খুজে দিতে অনেক সময় ব্যয় করতেন। যার কারণে তাঁর উস্তাদ হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুল্লাহ সাহেব (বার্মী) তাঁর নাম রেখেছিলেন **"উকদা হল"** তথা জটিল ও দুর্বোধ্য বিষয়ের সমাধানকারী। তাছাড়াও ১৪১৪-১৪১৬ হিজরী পর্যন্ত দুই বছর ইলমে নাহব ও ইলমে সরফ প্রভৃতি শাস্ত্রের বিভিন্ন কিতাব পড়ানোর দায়িত্বও পালন করেন।

এখানে সর্বপ্রথম প্রাপ্ত বেতনের কিছু অংশ দারুল উলূম করাচীরই বোর্ডিং-এ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি কল্পে দান করেন।

এভাবে দীর্ঘ ছয় বছর কাটানোর পর তিনি তাঁর মায়ের সাথে সাক্ষাতের লক্ষ্যে ১৯৯৫ ঈ. মোতাবেক ১৪১৬ হি. দেশে ফিরে আসেন।

অতঃপর তাঁর অত্যন্ত স্নেহ পরায়ণ ও মমতাময়ী মা তাঁকে আর পাকিস্তানে ফিরে যেতে দেননি।

এদিকে তিনি এবং তাঁর নিকটতম বন্ধু ও সহপাঠী মুফতী আবুল হাসান মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ও তাঁরই সহোদর মুফতী আবদুল মালেকের করাচী থাকা কালে দেশে ফিরে এসে সুন্দর ও মান সম্পন্ন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পরিকল্পনা করতেন। এই পরিকল্পনাকে সমনে রেখে মুরব্বীদের পরামর্শক্রমে তাঁরা আল্লাহ পাকের উপর পূর্ণ ভরসা করে উপকরণবিহীন অবস্থায় ঢাকার মুহাম্মাদপুরে একটি ভাড়া বাড়ীতে ১৯৯৫ ঈ. মোতাবেক ১৪১৬ হি. সনে "মারকাযুদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়া ঢাকা" নামে একটি নবধারার প্রতিষ্ঠানের সূচনা করে তাদের পূর্বের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেন। তাঁরা সকলে এই প্রতিষ্ঠানে দ্বীনী ইলমের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে নিজেদের জান-মালকে বিসর্জন দেন।

আরও আশ্চর্যের বিষয় হল, তারা এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে, এক বছর পর্যন্ত তাঁরা দরস (পাঠ) দানের কোন বিনিময় গ্রহণ করবেন না। তাঁদের এই ত্যাগ-তিতিক্ষার ফলে এই প্রতিষ্ঠান আজ বাংলাদেশের আনাচে কানাচে বরং বিদেশেও সুনাম-সুখ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

আল্লামা মুফতী দিলাওয়ার হোসাইন সাহেব দা. বা. সেখানে দীর্ঘ ছয় বছর শিক্ষকতা, দরস, ফাতাওয়া তথা সারা দেশের বিভিন্ন সমস্যাবলীর সমাধান প্রদান এবং জনসাধারণকে সুন্দর উপস্থাপনা ও সাবলীল ভাষায় ওয়ায-নসীহত এর মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। বিশেষভাবে আধুনিক মাসআলা-মাসাইল ও নব উদ্ভাবিত সমস্যাবলী এবং জটিল-দুর্বোধ্য বিষয়াবলীর সমাধান পেশে সকলের কাছে সমাদৃত হন। যার ফলে তাঁর সাহচর্যে এসে বহু ইলম পিপাসুরা শুধু তাদের পিপাসাই নিবারণ করেনি বরং অন্য ইলম পিপাসুদের পিপাসা নিবারণের পাথেয়ও জোগাড় করে নিয়েছেন।

এরই মাঝে তিনি ২০০০ ঈ. সনে মিরপুরের ১নং সেকশনে গড়ে তুললেন একটি বৃহৎ ইসলামী প্রতিষ্ঠান, যার নাম রাখলেন "জামি'আ ইসলামিয়া দারুল উলূম ঢাকা"। এই প্রতিষ্ঠানটির বাউন্ডারির ভিতরস্থ

মসজিদে (মসজিদুল আকবার) তিনি ১৯৯৮ ঈ. সন থেকে অদ্যাবধি খতীব হিসাবে নিয়োজিত রয়েছেন। এখানে তিনি প্রথম স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর দাওরায়ে হাদীস ও তাখাস্‌সুস ফিল ফিকহি ওয়াল ইফতা বিভাগ পর্যন্ত ক্লাস চালু করেন। আল্লাহ পাকের অশেষ কৃপায় মাত্র দু'বছরের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠানটি আলেম-উলামা, মাদরাসার তালিবে ইলম, জেনারেল শিক্ষিত-অশিক্ষিত সর্বশ্রেণীর মানুষের আস্থার প্রতিক ও সকল সমস্যার শরয়ী সমাধানের আশ্রয়কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে এবং এ যাবতকাল পর্যন্ত তার ঐতিহ্য ও সুনাম-সুখ্যাতি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে।

এভাবে কয়েকটি বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর ২০০৭ ঈ. সালে ইলমে দ্বীনের উচ্চতর গবেষণামূলক শিক্ষার সর্বোচ্চস্তরের পাঁচটি বিভাগ চালু করেন। বিভাগগুলো যথাক্রমে-

[১] আত তাখাস্‌সুস ফী উলূমিল কুরআন ওয়া তাফসীরিহী (তাফসীর বিভাগ)

[২] আত তাখাস্‌সুস ফিল হাদীসিশ শরীফ (হাদীস বিভাগ)

[৩] আত তাখাস্‌সুস ফিল ফিকহি ওয়াল ইফতা (ফিকহ ও ইফতা বিভাগ)

[৪] আত তাখাস্‌সুস ফিল লুগাতিল আরাবিয়্যা ওয়া আদাবিহা (আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ) ও

[৫] আত তাখাস্‌সুস ফিস সীরাতি ওয়াত তারীখ (ইতিহাস বিভাগ)

প্রতিটি বিভাগই দু'বছরের মেয়াদে সুউচ্চ মানের কারিকুলামে সন্নিবেশিত এবং সুচারুরূপে পরিচালিত। তন্মধ্য হতে ৫ম বিভাগটি আমাদের জানা মতে ইতিপূর্বে এই ভারত উপমহাদেশে আর কোথাও চালু করা হয়নি।

তিনি অতি সুনাম-সুখ্যাতি ও দক্ষতার সাথে অত্র জামি'আর প্রিন্সিপাল, শায়খুল হাদীস এবং আত তাখাস্‌সুস ফিল ফিকহি ওয়াল ইফতা বিভাগের চেয়ারম্যান ও প্রধান মুফতী হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

২০০৬ ঈ. সালের রমযান মাসে "মারকাযুল বুহূস আল ইসলামিয়া ঢাকা" এর সূচনা করেন। আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে এটিও বর্তমানে

ইলমী তাহকীক, উচ্চতর গবেষণা ও আধুনিক সমস্যার সমাধানে সর্বস্তরের আলেম-উলামা ও সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছে সমানভাবে সমাদৃত হয়েছে। সূচনালগ্ন থেকেই এখানে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মেধাবী ও জ্ঞানপিপাসু তালিবে ইলমরা ভিড় জমাচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে ইলমী তাহকীক ও গবেষণার ঝাণ্ডা নিয়ে। এসব কিছু মূলতঃ আল্লাহ পাকের অশেষ কৃপায় আর আল্লামা মুফতী দিলাওয়ার হোসাইন সাহেব দা. বা. এর ইখলাছ, তাকওয়া-পরহেযগারী, বিনয়-নম্রতা ও ইলমী ময়দানে পাণ্ডিত্য এবং অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার বরকতে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর হায়াত ও দ্বীনী খেদমতে আরও বেশি রবকত দান করুন। আমীন!

২০০০ঈ. সনে তিনি নিজ গ্রাম বান্দুয়াইনে "দারুল উলূম বান্দুয়াইন" নামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

এ ছাড়াও তিনি আরও কয়েকটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। সবগুলি তাঁরই তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় পরিচালিত হয় এবং সেগুলির প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হিসাবেও তিনি অধিষ্ঠিত আছেন।

উস্তাদদের দৃষ্টিতে আল্লামা মুফতী দিলাওয়ার হোসাইন দা.বা.

১. তাঁর উস্তাদ উলূপাড়ার হুযুর হযরত মাওলানা আব্দুল ওয়াদুদ রহ. [খলীফা, হযরত মাওলানা আব্দুল হালীম রহ. ওলামা বাজারের হুযুর] মুনশীরহাট মাদরাসার বার্ষিক মাহফিলে সকলের সামনে বললেনঃ (তখন তিনি বার্ধক্য জনিত কারণে অত্যন্ত দূর্বল ছিলেন, আরেক জনের কোলে করে স্টেজে আসেন)

> "আল্লাহ তা'আলা আমাদের দেশের জনগণের পথ প্রদর্শনের জন্য একজন পথ প্রদর্শক পাঠিয়ে ছিলেন, তিনি ছিলেন হযরত মাওলানা আফতাবুদ্দীন রহ.।[১] তাঁর

---

১ তিনি ছিলেন মুফতী সাহেব হুযূরের অত্যন্ত দ্বীনদার পরহেযগার বুযুর্গ দাদীর ছোট ভাই অর্থাৎ তাঁর আব্বা জানের ছোট মামা। কুমিল্লার সর্ববৃহৎ ও প্রাচীনতম মাদরাসা দারুল উলূম বরুড়া তাঁরই প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান।

ইন্তেকালের পর মানুষ কোথায় যাবে? কার থেকে রাহনুমায়ী নিবে? তাই আল্লাহ পাক আরেকজন বুযুর্গ পাঠালেন, তিনি হলেন, হযরত মাওলানা গিয়াসুদ্দীন সাহেব রহ।[২] তাঁর ইন্তেকালের পর মানুষ কোথায় যাবে? তাই আরও দুইজন পাঠালেন, তাঁরা হলেন, হযরত মাওলানা দিলাওয়ার হোসাইন রহ.[৩] এবং হযরত মাওলানা মহিববুর রহমান রহ.।[৪] তাঁদের ইন্তেকালের পর মানুষ কোথায় যাবে? তাই আল্লাহ পাক আরও দু'জন পাঠালেন, একজন মুফতী দিলাওয়ার হোসাইন সাহেব ও অপর জন মুফতী হিফজুর রহমান সাহেব। আপনারা এ দু'জনের কাছে যাবেন, ইনশাআল্লাহ! হিদায়াত পাবেন।"

এ সময় আমাদের উস্তাদ মুফতী দিলাওয়ার সাহেব হুযুরও স্টেজে উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর মুফতী সাহেব হুযুরের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ

"দিলাওয়ার! এক সময় আপনাকে পড়ানোর সময় মেরেছি, এমন জানলে মারতাম না, আমাকে ক্ষমা করে দিবেন"

কথাটি বলে তিনি কেঁদে ফেললেন।

২. এ উলুপাড়ার হুযুরই একদিন নাথের পেটুয়া মহা সম্মেলনে আসার পথে হঠাৎ বলে উঠলেনঃ

"মুফতী সাহেব! যাওয়ার সময় তো ঘনিয়ে এসেছে, আখেরাতের পুঁজিতো কিছুই যোগাড় করতে পারিনি। আল্লাহ পাক যখন জিজ্ঞাসা করবেন, আব্দুল ওয়াদূদ!

---

২ হযরত মাওলানা মুফতী হিফজুর রহমান সাহেব (বর্তমান প্রধান মুফতী, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, সাত মসজিদ, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা) এর নানা।

৩ আমাদের মুফতী সাহেব হুযূরের নানা শশুর ও তাঁর আব্বা জানের খালাত ভাই।

৪ মুফতী হিফজুর রহমান সাহেবের আব্বা ও আমাদের মুফতী সাহেব হুযূরের আব্বাজানের মামাত ভাই।

কি নিয়ে এসেছ? তখন আমি আপনার কথা বলবো যে, ইয়া আল্লাহ! আমি দিলাওয়ারকে পড়ায়ে এসেছি।”

৩. উলুপাড়ার হুযুর তাঁর জানাযার নামায পড়ানোর জন্য তাঁর সুযোগ্য শাগরিদ হযরত মুফতী সাহেবকে অসিয়াত করে যান। অতঃপর তাঁর ইন্তিকালের সময় তাঁর ইমামতিতেই হাজার হাজার লোক তাঁর জানাযার নামায আদায় করে। এতে বুঝা যায়, এ ছাত্রের উপর উস্তাদের কি পরিমাণ আস্থা ছিল।

৪. তাঁর আরেকজন উস্তাদ হযরত মাওলানা ছিদ্দীকুর রহমান সাহেবও বলেছেনঃ

“আল্লাহ পাক যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, ছিদ্দীক কি নিয়ে এসেছ? তখন আমি দিলাওয়ারকে পেশ করব।”

৫. তাঁর উস্তাদ শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক (দা. বা.) বি-বাড়ীয়া ভিট ঘরে তাঁর ওয়ায শুনে তাঁকে দেখা করতে বলে লোক পাঠান। কিন্তু তিনি ভয়ে যাচ্ছিলেন না। তিন বারের পর দেখা করতে গেলে তাঁকে দেখেই হযরত শায়খুল হাদীস (দা. বা.) বললেনঃ

“ভয় পেয়েছ না? এই জন্য ডাকিনি, আমি তোমার ওয়ায শুনে খুশি হয়েছি। এভাবে একবার আমাকেও আমার ওয়ায শুনার পর আমার উস্তাদ হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী রহ. ডেকেছিলেন, আমিও তোমার ন্যায় ভয়ে যেতে গড়িমসি করেছিলাম। অতঃপর হুযুরের খিদমতে হাযির হলে হুযুরও আমাকে এ কথা বলেছিলেন যে, “ভয় পেয়েছ, না? এজন্য ডাকিনি, আমি তোমার ওয়ায শুনে খুশি হয়েছি। দেখ! ওয়ায করবে, তবে আমার নিয়মে।” আমিও তোমাকে এ কথাগুলো বলব: শুন! ওয়ায করবে। তবে আমার নিয়মে তা’লীম-তা’আল্লুম তথা মুদাররিসি (শিক্ষকতা) ছাড়তে পারবে না, এটা ঠিক রেখে ওয়ায করবে।”

৬. মুফতী সাহেব হুযুর যখন ঢাকার মিরপুর-১ এ জামি'আ ইসলামিয়া দারুল উলূম ঢাকায় দাওরায়ে হাদীস খোলার সিদ্ধান্ত নিয়ে বুখারী শরীফ পড়ানোর জন্য শায়খুল হাদীস সাহেবের কাছে যান, তখন হুযুর বললেনঃ

"আমি তো সামান্য একটু পড়াব, বাকিটুকু কে পড়াবে?"

উত্তরে হুযুর বললেনঃ

"হুযুর! আপনি দু'আ করলে বান্দা হিম্মত করবে।"

তখন শায়খুল হাদীস সাহেব বললেনঃ

"হ্যাঁ, তুমি পড়ালে ঠিক আছে। না হয় আমি পড়াব না।"

৭. তাঁর উস্তাদ হযরত মাওলানা শামছুল আলম সাহেব (মুহাদ্দিস, হাটহাজারী মাদরাসা ও লালবাগ মাদরাসা) তাঁর তাফসীরে বায়যাবী শরীফের পরীক্ষার খাতা দেখে ৯২ নম্বার দিলেন এবং বললেনঃ

"এ সিলসিলা ধরে রাখতে পারলে একদিন কাজে লাগবে।"

এরপর থেকে তাঁকে দেখলেই পাকিস্তান গিয়ে আরও বেশি উচ্চ শিক্ষা অর্জনের জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। পরবর্তীতে তাই হয়েছে।

৮. তাঁর উস্তাদ হযরত মাওলানা আব্দুল মান্নান সাহেব (বড় হুযুর) তাঁর মেধা ও তাঁকে লেখা পড়ায় মনোযোগী দেখে নিজের ছেলে বলতেন।

৯. হেদায়াতুন নাহব থেকে ফারেগ হওয়ার পর কেউ কেউ তাঁকে আলিয়া মাদরাসায় পড়ার পরামর্শ দেন, একথা শুনে বড় হুযুর বললেনঃ

"দিলাওয়ারকে পড়াতে পারবে এমন শিক্ষক ওখানে কে আছে?"

১০. তাঁর অত্যন্ত শরীফ উস্তাদ হযরত মাওলানা ক্বারী ফজলুর রহমান (দা. বা.) তাঁর এক ছাত্রকে ছেলে বললে, আমাদের মুফতী সাহেব হুযুর বললেনঃ হুযুর আমি কি আপনার ছেলে নই! উত্তরে হুযুর বললেনঃ

"তোমাকে ছেলে বলবো কেন? তুমি তো আমার বাবা।"

তাই হুযুর তাঁকে সব সময় **'বাবা'** বলে ডাকেন।

১১. মুফতী সাহেব যখন খেড়ীহর মাদরাসা থেকে লেখা-পড়া শেষ করে লালবাগ মাদরাসায় আসেন তখন তাঁর উস্তাদ মাও. সাইফুল্লাহ সাহেব (লৎসরের হুযূর) ছাত্রদের সামনে তাঁর বিরহে ক্রন্দনরত অবস্থায় বলছিলেন,

"দিলাওয়ার জন্মগত (مادرزاد) ওলী ছিল। অর্থাৎ মাতৃগর্ভ থেকেই ওলী হয়ে জন্ম গ্রহণ করেছে।"

১২. খেড়ীহর মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা জনাব মরহুম আলহাজ্ব আব্দুল ওয়াদুদ খান সাহেব রহ.[৫] ও এভাবে বলতেনঃ

আল্লাহ পাক হাশরের মাঠে যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, আব্দুল ওয়াদুদ! কি পুঁজি নিয়ে এসেছ? তখন আমি চার জন কে পেশ করব। তাঁরা হলেনঃ

(১) দিলাওয়ার [প্রধান মুফতী, জামি'আ ইসলামিয়া দারুল উলূম ঢাকা]
(২) আব্দুল মালেক [শিক্ষা সচিব, মারকাযুদ্দাওয়া আল ইসলামিয়া ঢাকা]
(৩) রশীদ আহমাদ [মুহাদ্দিস, উজানী মাদরাসা]
(৪) হোসাইন আহমাদ [ভাইস প্রিন্সিপাল, খেড়ীহর মাদরাসা]

পদ ও দায়িত্ব

প্রিন্সিপাল ঃ

E জামি'আ ইসলামিয়া দারুল উলূম ঢাকা, মিরপুর-১, ঢাকা। (১৪২১ হি. থেকে বর্তমান);

E জামি'আ আশরাফিয়া চারাবাগ, সাভার, ঢাকা। (১৪২৫ হি. থেকে বর্তমান)

---

৫ তিনি মুফতী সাহেবের উস্তাদ নন। তবে তিনি তাঁর একজন মুরব্বী হিসেবে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি মুফতী সাহেবকে অত্যন্ত মুহাব্বাত করতেন।

E দারুল উলূম বান্দুয়াইন, কুমিল্লা। (১৪২১ হি. থেকে বর্তমান)।

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ঃ

E মারকাযুল বুহুস আল ইসলামিয়া ঢাকা, মিরপুর-১২, ঢাকা। (১৪২৭ হি. থেকে বর্তমান)।

শায়খুল হাদীস ঃ

E জামি‘আ ইসলামিয়া দারুল উলূম ঢাকা, মিরপুর-১, ঢাকা। (১৪২৩ হি. থেকে বর্তমান);

E জামি‘আতুল উলূম আল ইসলামিয়া (রেলওয়ায়ে কলোনী) কওমী মাদরাসা, সিরাজগঞ্জ। (১৪২৭ হি. থেকে বর্তমান)

প্রধান মুফতী ঃ

E জামি‘আ ইসলামিয়া দারুল উলূম ঢাকা, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬। (১৪২১ হি. থেকে বর্তমান);

E মারকাযুল বুহুস আল ইসলামিয়া ঢাকা, মিরপুর-১২, ঢাকা-১২১৬। (১৪২৭ হি. থেকে বর্তমান)।

চেয়ারম্যান ঃ

E আত-তাখাস্‌সুস ফিল ফিকহি ওয়াল ইফতা (উচ্চতর ইসলামী আইনশাস্ত্র ও ফাতওয়া) বিভাগ।

জামি‘আ ইসলামিয়া দারুল উলূম ঢাকা, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬। (১৪২১ হি. থেকে বর্তমান);

E মারকাযুল বুহূস আল-ইসলামিয়া ঢাকা, মিরপুর-১২, ঢাকা-১২১৬। (১৪২৭ হি. থেকে বর্তমান)।

পৃষ্ঠপোষক ঃ

E আন্‌-নাহদাতুল আদাবিয়্যাহ, জামি‘আ ইসলামিয়া দারুল উলূম ঢাকা এর আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ থেকে প্রকাশিত মাসিক আরবী পত্রিকা।

খতীব ঃ

E মসজিদুল আকবার, মিরপুর-১, ঢাকা। (১৪১৯ থেকে বর্তমান);
E ছাপড়া মসজিদ, আজিমপুর, ঢাকা। (১৪২৮ থেকে বর্তমান) [প্রতি ইংরেজী মাসের প্রথম শুক্রবার]।

চেয়ারম্যান ঃ

E নির্বাহী পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ, মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী বাংলাদেশ (ইসলামী ফেকাহ একাডেমী বাংলাদেশ)। (১৪৩০ হি. থেকে বর্তমান)

রচনাবলী

১. আশ শরহুন নাযির (তাসকীনুল আরওয়াহ ওয়ায যামায়ির)
আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ির এর কাওয়ায়িদ অংশের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ১০ খন্ড [আরবী] (প্রকাশিতব্য)

২. শবে বরাতের তত্ত্বকথা [বাংলা] (প্রকাশিত)

৩. ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা [বাংলা] (প্রকাশিত)

৪. আস সরাহা ফী লায়লাতিল বারাআহ [আরবী] (পাণ্ডুলিপি)

৫. শবে বরাত কী হাকীকত [উর্দূ]
(প্রকাশিত-পাকিস্তান, বাংলাদেশে প্রকাশিতব্য)

৬. আততিব্য়ান ফী লাইলাতিন নিসফি মিন শা'বান [উর্দূ] (প্রকাশিতব্য)

৭. আল জুন্নাহ ফী তাহকীকি হাদীসি আল হাসানু ওয়াল হোসাইনু সায়্যিদা শাবাবি আহ্লিল জান্নাহ [আরবী] (প্রকাশিত, পাকিস্তান)

৮. আল আম্বার আলাল মিম্বার [আরবী] (পাণ্ডুলিপি)

৯. মানারাতুস সিরাজ ফী মাকানাতিয যিওয়ায [আরবী] (পাণ্ডুলিপি)

১০. খাইরুল কালাম ফিস সালাতি ওয়াস সালাম আলা খাইরিল আনাম [আরবী] (পাণ্ডুলিপি)

১১. নায়নুল আমাল ফী ইসকাতিল হামাল [উর্দূ] (প্রকাশিত, পাকিস্তান)

১২. তাতাব্বুয়ি রুখাসিল মাযাহিব ওয়া আহকামুহা [আরবী] (পাণ্ডুলিপি)

১৩. মাজমূআতুল ফাওয়াইদ [আরবী] (পাণ্ডুলিপি)

এছাড়াও তাঁর লিখিত আরোও অনেক ছোট ছোট পুস্তিকা ও প্রবন্ধ পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত রয়েছে।

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العلمين، وصلى الله تعالى على سيِّدنا محمَّدٍ خاتَم النَّبيِّين، وعلى آله وأصحابه الطَّيِّبين الطَّاهرين، وأسأل الله تعالى القبول الحسن فى الدَّارين. آمين!

আরো বিস্তারিত জানতে তাঁর জীবন ও কর্মের উপর সংকলিত স্বতন্ত্র বইটি পড়ুন।

সংকলনে
মা'সূম বিল্লাহ
মুহাদ্দিছ ও মুফতী
জামি'আ ইসলামিয়া দারুল উলূম ঢাকা
মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى جعل لكلّ داء دواء، ولكل مرض شفاء، وشرح صدور الفقهاء، الذين اجتهدوا لاستخراج أحكام الشَّريعة الغرَّاء، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمَّد سيِّد المرسلين وخاتَم الأنبياء، وعلى آله وأصحابه الأتقياء، ومن تبِعهم بإحسان إلى يوم اللقاء، خصوصاً من استنبطوا الأحكام الفروعيَّة من الكتاب والسُّنة وإجماع الأمَّة والقياس ببذل جهدهم العلاء.

আদিকাল থেকেই বিভিন্ন ধরণের চিকিৎসা পদ্ধতির প্রচলন চলে আসছে। আর এর উপর ভিত্তি করে অনেক মাসআলা-মাসাইলও বিভিন্ন কিতাবাদিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যে, ইসলামের দৃষ্টিতে কোন্ ধরণের চিকিৎসা পদ্ধতি বৈধ আর কোন্ ধরণের চিকিৎসা পদ্ধতি অবৈধ। তেমনিভাবে ইসলামের বহু হুকুম-আহকামও চিকিৎসা ও চিকিৎসা পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। বিশেষ করে রোযা সংক্রান্ত অনেক মাসাইল তম্মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান বিশ্বে অন্যান্য বিষয়াদির পাশাপাশি চিকিৎসা বিজ্ঞানও উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছে গেছে। এক সময় যার কল্পনাও ছিল দুষ্কর।

প্রাচীনকালে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের গঠন প্রণালী যে রকম মনে করা হত, তার অনেকটাই বর্তমানে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। আগে যা থিউরি (Theory) ও ধারণার উপর নির্ভরশীল ছিল, বর্তমানে তা প্র্যাকটিকাল (Practical) ও বাস্তব ভিত্তিক। যার কারণে দু'যুগের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান বিদ্যমান। আর এর উপর ভিত্তি করে বহু মাসআলা-মাসাইল ও হুকুম-আহকামে নানান সমস্যার

সৃষ্টি হয়েছে। তাই এ বিষয়ে নতুন করে গবেষণামূলক কিছু চিন্তা-ফিকিরের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এবং এ কাজের গুরুত্বও অনেক বেড়ে গেছে।

মারকাযুদ্দাওয়া আল ইসলামিয়া ঢাকার প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই এ বিষয়ে পাঠ দান অধমের দায়িত্বে অর্পিত ছিল। অধম বিভিন্ন কিতাব ও নিজের চিন্তা-গবেষণা থেকে দীর্ঘ ৯ বছর যাবত পাঠ দান করে আসছিল।

মারকাযুদ্দাওয়া আল ইসলামিয়া ঢাকার প্রথম বছরের তালিবে ইল্‌ম, আমার অত্যন্ত স্নেহাস্পদ, মাওলানা মুফতী হারুন (বর্তমান শিক্ষা সচিব, মারকাযুল বুহূস আল ইসলামিয়া ঢাকা) আমার দরসগুলোকে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করেন। পরবর্তীতে জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম ঢাকা এর ১৪২৬ হিজরী সনের তাখাসসুস ফিল ফিক্‌হি ওয়াল ইফ্‌তা বিভাগের তালিবে ইল্‌ম মাওলানা হাবীবুল্লাহ, মাওলানা ইসমাঈল, মাওলানা ইমরান, মাওলানা মুস্তাফিজ, মাওলানা হানীফ, মাওলানা জুনায়েদ, মাওলানা সাইফুজ্জামান, মাওলানা ইহ্‌তিশাম, মাওলানা আইয়ূব ও মাওলানা ইয়াসীন তা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেন এবং তারা এর উপকারিতা উপলব্ধি করে প্রকাশেরও উদ্যোগ নেন। মাশাআল্লাহ্! তারা সকলেই রুচিশীল ও চিন্তাশীল আলেম। সকলেই বর্তমানে বড় বড় প্রতিষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য খেদমতে নিয়োজিত আছেন। আমি দু‘আ করি আল্লাহ পাক তাদেরকে আরো উন্নতি দান করুন ও দ্বীনের সহীহ্ খাদিম হিসেবে কবুল করে নিন। আমীন!

আমি তাদের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। কেননা উল্লিখিত বিষয়ের উপর এ পদ্ধতিতে লিখিত কোন কিতাব অদ্যাবধি আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। আশা করি কিতাবটি ইলম পিপাসু উলামায়ে কিরাম ও মুফ্‌তীয়ানে ইযামের পিপাসা নিবারণ করবে। এর পাশাপাশি জেনারেল শিক্ষিত বিশেষ করে ডাক্তার মহলেরও অনেক উপকারে আসবে। ইনশাআল্লাহ!

বলা বাহুল্য, বক্ষমান এ কিতাবটি আমার স্বহস্তে লিখিত কোন রচনা নয় বরং উল্লিখিত কিছু তালিবে ইল্‌ম কর্তৃক অধমের এ বিষয়ের কিছু দরস ও আলোচনার সংকলন সমষ্টি। তবে অধম উক্ত সংকলন পুনরায়

দেখে কিছু সংযোজন ও বিয়োজন অবশ্যই করেছে। অতএব, এ কিতাবটির ব্যাপারে নিম্ন লিখিত কথাগুলো মনে রাখা আবশ্যকঃ

১. কিতাবটি কোন (নিয়মিত) রচনা নয় বরং এ বিষয়ে অধমের পাঠ দানের সংকলন সমষ্টি। এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, পাঠ দানের পদ্ধতি ও রচনা কখনও এক হয় না। দ্বিতীয়তঃ পাঠদানকে হুবহু লিখনিতে পরিবর্তন করাও সহজ কাজ নয়। কারণ পাঠ দান হয় যবানে যা 'যিন্দাহ' আর লিখনি হয় কলমে যা 'মুরদা'। তাই যবান দিয়ে যা বুঝানো সম্ভব কলমের আঁচড়ে তা হুবহু প্রকাশ করা যায় না। অতএব, কোনো কোনো বিষয় বুঝতে অসুবিধাও হতে পারে। তবে মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করলে আশা করি বুঝে আসবে। ইনশাআল্লাহ্!

২. এ বিষয় পাঠ দানের সময় সম্বোধন করা হয়েছে ফিক্হ ও ইফ্তা বিভাগের তালিবে ইল্মদেরকে। তাই কথাগুলো অনেকটা ফিক্হী ও ইলমী ধাঁচে উপস্থাপন করা হয়েছে। স্বভাবতই ফিক্হী (ইসলামী আইনের) পরিভাষা অধিক হারে ব্যবহৃত হয়েছে। যা অন্যদের জন্য বুঝতে কিছুটা সমস্যা হতে পারে।

৩. কিতাবটিতে যে সমস্ত সিদ্ধান্তবলী পেশ করা হয়েছে এগুলোকে অধমের (চুড়ান্ত) সিদ্ধান্ত মনে করা ঠিক হবে না বরং এগুলোর দ্বারা উদ্দেশ্য বিজ্ঞ আলেমদের গবেষণার দ্বার উম্মুক্ত করা মাত্র। তবে এগুলো অধমের دلى رجحان তথা অগ্রাধিকার প্রাপ্ত মনোভাব অবশ্যই।

৪. বিষয়টি নিঃসন্দেহে ইজতিহাদ, ইসতিম্বাত ও গবেষণামূলক। অধমের মধ্যে এ ধরণের কোন যোগ্যতা নেই। তবে অধমের জীবনের সবচেয়ে বড় সম্বল, অধমের উস্তাদ, পীর ও মুরশিদ শায়খুল ইসলাম আল্লামা মুফতী তাকী উসমানী (দা. বা.) এর একটি অমূল্য বাণী:

"এখন যা বুঝে আসে তাই লিখে ফেল, পরবর্তীতে ভুল প্রমাণিত হলে رجوع তথা প্রত্যাহার করে নিও। যদি চাও যে, আমার কাজটি একেবারেই ত্রুটিমুক্ত ও নির্ভুল হোক তাহলে আর কাজই হবে না"

যা অধমকে কিতাবটি প্রকাশ করার সাহস যুগিয়েছে।

৫. কিতাবটিতে যে সমস্ত ডাক্তারি ও চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্যাবলী উল্লেখ করা হয়েছে তা আমার শ্রদ্ধেয় মেঝ ভাই জনাব ডা. আলহাজ্ব আবূ ইউসুফ সাহেব (যিনি আমার অনেক বড় মুরব্বী এবং আমার লেখা-পড়ার পিছনে যার নিষ্কলুষ মহব্বত ও অবদান না থাকলে হয়ত আমি এ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারতাম না) ও তাঁর ছোট ভায়রা জনাব ডা. মোয়াজ্জেম সাহেব থেকে সংগৃহিত। আর গাইনি বিষয়গুলো নেয়া হয়েছে আমার ডাক্তার ভাইয়ের শ্যালক (আমার মামাতো ভাই) এর স্ত্রী জনাবা ডা. বিলকিস সুলতানা (পান্না) এর কাছ থেকে। আল্লাহ পাক তাদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন!

উল্লিখিত কথাগুলোকে সামনে রেখে কিতাবটি অধ্যয়ন করলে আশা করি তেমন কোন সমস্যা অনুভব হবে না।

অধমের দু'জন প্রিয় ছাত্র মাওলানা আব্দুস সবূর ও মাওলানা মা'সূম এর কথাও উল্লেখ করতে হয়। তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মাসআলার উদ্বৃতি বের করা এবং আরো বিভিন্ন কাজে যথেষ্ট শ্রম দিয়েছেন। বাস্তব বলতে গেলে এ পর্যন্ত যাদের কথা উল্লেখ করেছি পরিশ্রম তাদেরই। আল্লাহ্ পাক তাদের ইল্‌ম ও আমলের মধ্যে আরও বরকত দান করুন। আমীন!

শেষ প্রান্তে এসে অধমের সহধর্মিনী মাওলানা সাঈদা আখতারের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। কেননা সে আমার অন্যান্য লিখনি ও রচনাগুলোর ন্যায় এ কিতাবটিকেও অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে অধ্যয়ন করেছে এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অনেক পরামর্শও দিয়েছে। তার প্রায় প্রত্যেকটি পরামর্শই সঠিক ও উপকারী হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। অধম যেহেতু দেশের বাইরে দীর্ঘকাল লেখা-পড়া করেছে তাই অধমের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে দুর্বলতা রয়েছে। আল্লাহ পাক অধমের সহধর্মিনীকে দিয়ে এ দুবর্লতা অনেকটা কাটিয়ে দিয়েছেন। فلله الحمد والشكر আমি দু'আ করি আল্লাহ তা'আলা তাকে আরও উন্নতি দান করুন এবং দ্বীনের একজন সহীহ খাদিমা হিসেবে কবুল করুন। আমীন!

শেষকথা, অত্যন্ত সতর্কভাবে কিতাবটি নির্ভুল করার চেষ্টা করা হয়েছে। তারপরও ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। এছাড়াও কোন তত্ত্ব ও তথ্যের ব্যাপারে কারও দ্বিমত থাকতে পারে। কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে যথাযোগ্য দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে কোন সুহৃদ পাঠক অনুগ্রহপূর্বক পরামর্শ দিলে নিঃসংকোচে তা গ্রহণ করে নেয়া হবে এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে দেয়া হবে। আর তার কাছে থাকব চিরকৃতজ্ঞ।

পরিশেষে সকলের কাছে দু'আ প্রার্থী যে, আল্লাহ পাক এ ক্ষুদ্র খিদমতটিকে সকলের জন্য উপকারী হিসেবে কবূল করেন। অধম ও এর পিছনে যাদের সামান্যতম শ্রম রয়েছে তাদের সকলের নাজাতের অসীলা বানিয়ে দেন। আমীন!

তাং ১০-৭-১৪৩০ হিজরী

দিলাওয়ার হোসাইন
জামিআ ইসলামিয়া দারুল উলূম ঢাকা

দ্বিতীয় সংস্করণের
ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي خلق كل شيء ثم هدى ، جعل لكلّ داء دواءً ، والصلاة والسلام على سيِّدنا محمَّد سيِّد الأنبياء و المرسلين ، وعلى آله الطيبين ، و أصحابه الطاهرين ، صلاة و سلاماً دائمين إلى يوم اليقين . و بعد!

আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কোটি-কোটি শোকর ও প্রশংসা, যিনি আমাদেরকে তার মনোনিত ও পছন্দীয় দ্বীন, ইসলামের সাথে জুড়ে রেখেছেন। এ ছিলছিলারই ক্ষুদ্র একটু খিদমাত "ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা" বইটির সংকলন ও প্রকাশ। বইটি বের হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই এর কপি শেষ হয়ে যায়। আসা শুরু হয় চতুর্দিক থেকে ফোন ও বিভিন্ন ধরণের বার্তা। কেউ বইয়ের চাহিদা প্রকাশ করে, আবার কেউ শোকরিয়া জ্ঞাপন করে ইত্যাদি। এমনকি জেনারেল শিক্ষিত ও ডাক্তার মহল থেকেও এর চাহিদা প্রকাশ পেতে থাকে। কারণ, দৈনন্দিন নিত্যনতুন রোগ ধরা পড়ছে ও এর চিকিৎসা আবিস্কার হচ্ছে। এতে অনেক ধর্মপরায়ণ রুগী এমনকি ডাক্তারও দ্বিধায় পড়ে যান যে, এ সকল চিকিৎসা এ পদ্ধতিতে করা ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ কি না? তাই জোর দেয়া হয় অতি দ্রুত বইটি পুনঃমুদ্রণের।

এর মধ্যে আরো কিছু নিত্যনতুন বিষয় সংযোজনের প্রয়োজন দেখা দেয়।

এ দিকে বইটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তাখাসসুস ফিল ফিকহি ওয়াল ইফতা বিভাগের সিলেবাসভুক্ত করা হয়। তাই নতুন বিষয়ের সংযোজনের পাশাপাশি বইটিকে সিলেবাসভুক্ত বইয়ের ন্যায় নতুন করে সাজানোর প্রয়োজনবোধ করি। আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করে কাজটি শুরু করে দেই। আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে শত ব্যস্ততার মাঝেও কাজটি এখন পরিসমাপ্তির দ্বারপ্রান্তে।

এ সংস্করণে,

১. বিষয়বস্তুগুলো নতুন ধাচে সাজনো হয়েছে।

২. বেশ কিছু মাসআলা সংযোজন করা হয়েছে।

৩. আলোচনা সহজে বুঝার লক্ষ্যে উদ্ধৃতিগুলো টিকায় স্থানান্তর করা হয়েছে।

বইটি বের হওয়ার পিছনে উদ্বুদ্ধ করেছে ও অনেক শ্রম দিয়েছে আমার স্নেহাস্পদ ছাত্ররা। এদের মধ্যে অনেক অনেক শ্রম ও সময় দিয়েছে: মাও. মুফতী হানীফ, শিক্ষা সচিব, জামিআ ইসলামিয়া দারুল উলূম ঢাকা, মাও. মুফতী আব্দুস সবূর, উস্তাযুল হাদীস ওয়াল ফিকহ, জামিআ ইসলামিয়া দারুল উলূম ঢাকা, মাও. মুফতী মা'সূম বিল্লাহ, উস্তাযুল হাদীস ওয়াল ফিকহ, জামিআ ইসলামিয়া দারুল উলূম ঢাকা। আমি দু'আ করি আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদের ইলম ও আমলে আরো বরকত দান করুন। আমীন!

বইটিতে কোন ভুল-ভ্রান্তি দৃষ্টিগোচর হলে অবগতির অনুরোধ রইল।

আল্লাহ পাক বইটিকে পাঠক, লিখক ও বইটি প্রকাশের পিছনে যাদের সামন্যতম অংশ রয়েছে সকলের জন্য উপকারী ও পরকালে নাজাতের উছিলা হিসেবে কবূল করুন। আমীন!

দিলাওয়ার হোসাইন
জামিআ ইসলামিয়া দারুল উলূম ঢাকা
১১/৭/১৪৩২ হি.

সূচীপত্র

মুফতী দিলাওয়ার হোসাইন দা. বা. এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ৩
প্রথম সংস্করণের ভূমিকা ২০
দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা ২৫

১ম অধ্যায়
চিকিৎসা ও চিকিৎসা পদ্ধতি

তিব্ব (طب) এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ৩৫
চিকিৎসা বিজ্ঞান (علم الطب) এর উদ্দেশ্য ৩৬
আলেমদের জন্য চিকিৎসা পদ্ধতি বিষয়ক মৌলিক
ধারণার প্রয়োজনীয়তা ৩৬
ইসলামের দৃষ্টিতে চিকিৎসা গ্রহণের অবস্থান ৩৭
উপকরণের প্রকারভেদ ও তার হুকুম ৩৯
চিকিৎসা কি তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী? ৪৬
একটি প্রশ্ন ও তার জওয়াব ৪৭
হযরত গাংগুহী (রহ.) এর একটি ঘটনা ৪৯
আলোচনার সারসংক্ষেপ ৫২
চিকিৎসার জন্য পর্দা লঙ্ঘন ও গুপ্তাঙ্গ দেখা ৫২
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক চিকিৎসার অবস্থান .. ৫৪
মধু সম্পর্কে কিছু আশ্চর্য কথা ৫৬
একটি প্রশ্ন ও তার জবাব ৫৭
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সকল কথা ও
কাজ কি অহীর ভিত্তিতে ছিল না? ৫৯
সুন্নাতের প্রকারভেদ ৬০
সুন্নাতে হুদা কাকে বলে ৬২
সুন্নাতে হুদার প্রকারভেদ ৬২
সুন্নাতে গাইরে হুদা কাকে বলে ৬৩
সুন্নাতে গাইরে হুদার প্রকারভেদ ৬৪

১. অভিজ্ঞতা নির্ভর সুন্নাত (السنة الخبرية) এর উদাহরণ ৬৫
২. ধারণা ভিত্তিক সুন্নাত (السنة الظنية) এর উদাহরণ ৬৫
৩. রসম-রেওয়াজ তথা প্রথাগত সুন্নাত (السنة الرسمية) এর উদাহরণ ৬৭
৪. প্রয়োজনীয় সুন্নাত (السنة الضرورية) এর উদাহরণ ৬৮
দস্তরখান সম্পর্কে কয়েকটি মাসআলা ৭০
৫. উপকারী সুন্নাত (السنة الطبية) এর উদাহরণ ৭৫
একটি সংশয় ও তার নিরসন ৭৬
৬. অভ্যাসগত সুন্নাত (السنة العادية) এর উদাহরণ ৭৭
একটি ভ্রান্তির নিরসন ৮০
সুন্নাতে আদিয়ায় কি ছাওয়াব হয়? ৮০
মাথায় বাবড়ী চুল রাখা ৮১
৭. অন্যকে খুশী করার তথা আনন্দদায়ক সুন্নাত (السنة التفريحية)
এর উদাহরণ ৮১
৮. সতর্কতামূলক সুন্নাত (السنة الاحترازية) এর উদাহরণ ৮৩
৯. বাধ্য-বাধকতামূলক সুন্নাত (السنة الإجبارية) এর উদাহরণ ... ৮৪
১০. কাহিনীমূলক সুন্নাত (السنة القصصية) এর উদাহরণ ৮৪
১১. শ্রুতিগত সুন্নাত ও দেশ-বিদেশ থেকে আগত ব্যক্তিদের কথার
উপর ভিত্তি করে যা বলেছেন, (السنة السماعية) এর উদাহরণ ৮৫
১২. সাময়িক সুন্নাত (السنة الوقتية) এর উদাহরণ ৮৭
১৩. রসিকতামূলক সুন্নাত (السنة المزاحية) এর উদাহরণ ৮৮
১৪. আপতিত সুন্নাত (السنة الاتِّفاقيَّة) এর উদাহরণ ৯০
১৫. ভদ্রতাসূলভ সুন্নাত (السنة المجامليَّة) এর উদাহরণ ৯১
১৬. কূটনৈতিক সুন্নাত (السنة الدِبْلوماسِيَّة) এর উদাহরণ ৯১
১৭. চিকিৎসামূলক সুন্নাত (السنة الطبيَّة) এর উদাহরণ ৯২
সুন্নাতে গাইরে হুদা কি ইবাদত? ৯৩
বিজ্ঞ ডাক্তারের পরিচয় ১০১
চিকিৎসার জন্য রুগির অনুমতি প্রয়োজন কি না? ১০৪
রোগ সংক্রমণ সংক্রান্ত মাসআলা ১০৫

ইসলাম ও ছোঁয়াচে রোগ ১০৫
রোগের পূর্বে প্রতিষেধক ব্যবহারের হুকুম ১১৩
مرض الموت বা মরণব্যাধি ১১৫
এইচ.আই.ভি/এইড্স (HIV/AIDS) কি? ১১৭
এইড্স এর উৎপত্তি ১১৭
এইড্স এর উপসর্গ বা লক্ষণ ১১৮
এইড্স এর ভয়াবহতা ১১৮
এইড্স জীবাণু কোথায় থাকে? ১১৯
এইড্স কিভাবে ছড়ায়? ১১৯
এইড্স এ ঝুকিপূর্ণ ১২০
এইড্স প্রতিরোধ (Aids Prevention) ১২০
মরুসাগর সম্পর্কে কিছু শিক্ষনীয় কথা ১২২
মরুসাগরের কতিপয় বৈশিষ্ট ১২৩
এইচ.আই.ভি/এইড্স (HIV/AIDS) সংক্রান্ত শরয়ী বিধান ১২৫
এইড্স ও তৎসংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানসমূহ ১২৬
উপরোক্ত বিধি-বিধানসমূহের বিস্তারিত বিবরণ ১২৬
এক. এইড্স আক্রান্ত ব্যক্তিকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার বিধান ১২৬
দুই. অন্যের শরীরে ইচ্ছাকৃত এইড্স সংক্রমণ করানোর বিধান ... ১২৭
তিন. এইড্স আক্রান্ত গর্ভবতী মহিলার গর্ভপাত করার বিধান ১২৮
চার. এইড্স আক্রান্ত মায়ের এইড্স মুক্ত সুস্থ সন্তানকে
লালন-পালন ও দুগ্ধ পান করানোর বিধান ১২৯
পাঁচ. স্বামী-স্ত্রী মধ্য হতে এইড্স মুক্ত স্বামী বা স্ত্রীর কোন একজনের
এইড্স আক্রান্ত স্ত্রী বা স্বামীর থেকে বিচ্ছেদের অধিকার ১২৯
ছয়. এইড্স আক্রান্ত ব্যক্তির স্বামী-স্ত্রী সূলভ আচরণ ও
যৌন মিলনের অধিকার ১২৯
সাত. এইড্স কি مرض الموت (মরণব্যাধি) হিসেবে বিবেচিত হবে? ১৩০
হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসার বিধান ১৩০
একটি প্রশ্ন ও তার নিরসন ১৩১
অ্যালকোহল মিশ্রিত ওষুধ ও আতর ইত্যাদির হুকুম ১৩৪

২য় অধ্যায়

আপারেশন (OPERATION) বা অস্ত্রোপচার

মানুষের দেহে অস্ত্রোপচার ১৩৭
জীবিত মানুষের দেহে তার নিজের উপকারার্থে অস্ত্রোপচার ১৩৭
অপারেশন নাজায়েয হওয়ার দলীল ১৩৮
অপারেশন জায়েয হওয়ার দলীল ১৩৯
ফিকাহ শাস্ত্রের সর্বস্বীকৃত একটি মূলনীতি (Principle) ১৪২
ফিকাহ শাস্ত্রের আরেকটি মূলনীতি ১৪২
প্রথম পক্ষের দলীলের জওয়াব ১৪৬
কাটা ঠোঁট অপারেশনের মাধ্যমে জোড়া লাগানো ১৪৮
সৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে অপারেশন ১৪৯
অতিরিক্ত অঙ্গ কেটে ফেলে দেয়া ১৫১
সিজারের হুকুম (Cesarean Section) ১৫২
মাকে বাঁচানোর লক্ষ্যে গর্ভস্থ বাচ্চা মেরে ফেলা ১৫৪
অঙ্গ স্থানান্তর ১৫৯
নিজ দেহের কোন অঙ্গ অন্য স্থানে স্থানান্তর ১৫৯
গুপ্তাঙ্গ সংযোজন ১৬০
জীবিত মানুষের দেহে অন্যের উপকারার্থে অস্ত্রোপচার ১৬০
একজনের অঙ্গ অন্যজনের দেহে সংযোজন ১৬০
সামাজিক প্রথা ও প্রচলন পরিবর্তনশীল ১৬৪
আলোচনার সার সংক্ষেপ ১৬৯
মুসলমানের দেহে অমুসলমানের অঙ্গ সংযোজন ১৭০
মানবদেহে অন্য কোন প্রাণীর অঙ্গ সংযোজন করা ১৭০
মানবদেহে কৃত্রিম অঙ্গ সংযোজন করা ১৭১
মানুষ ব্যতীত অন্য কোন প্রাণীর দেহে অস্ত্রোপচার ১৭২
পৃথককৃত অঙ্গ পুনস্থাপনের পর পাক থাকবে? ১৭৩
একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ১৭৫
মৃতদেহে অস্ত্রোপচার ১৭৮

ময়না তদন্ত/পোস্ট মোর্টেম (Postmortem) ১৭৮
ডি.এন.ও (DNO) বা কঙ্কাল টেস্ট ১৮১
ডি.এন.এ (DNA) বা যৌনাঙ্গের রস, মুখের লালা ইত্যাদি টেস্ট.. ১৮২
জীবিত মানুষের দৈহিক উপকারার্থে অস্ত্রোপচার ১৮৩
ডাক্তারি বিদ্যা অর্জনের লক্ষ্যে মৃতদেহ অস্ত্রোপচার ১৮৩
একটি প্রশ্ন ও তার নিরসন ১৮৯
যান্ন (ظن) ১৯৩
গালিবে যান্ন (الظن الغالب) ১৯৩
ওহাম (وهم) ১৯৩
ইয়াক্বীন (يقين) ১৯৪
শাক্ক (شك) ১৯৪
একটি প্রশ্ন ও তার নিরসন ২০০
মহিলাদেরকে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষাদান ২১০
জীবিত মানুষের আর্থিক উপকারার্থে অস্ত্রোপচার ২১২
মাসআলাটি ছক আকারে উপস্থাপন ২১৫
রক্তদান ২১৬
রক্ত ক্রয়-বিক্রয় ২১৮
রক্ত নেয়া ২১৯
মুসলিমদের জন্য অমুসলিমদের রক্ত গ্রহণ ২১৯
স্বামী-স্ত্রী একে অপরের রক্ত গ্রহণ ২১৯
ব্লাড ব্যাংক ২২০
স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচী ২২১
কিডনী দান ২২১
মরনোত্তর চক্ষুদান ২২২
দুধ ব্যাংক ২২২
জন্ম নিয়ন্ত্রণ (Birth Control) ২২৪
স্থায়ী জন্ম নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা ও তার হুকুম ২২৪
জন্ম নিয়ন্ত্রণের অস্থায়ী ব্যবস্থা ২২৬
যে সব অবস্থায় অস্থায়ী পদ্ধতি বৈধ ২৩০

যে সব কারণে জন্ম নিয়ন্ত্রণ বৈধ নয় ২৩১

একটি ভুল ধারণা ও তার নিরসন ২৩২

জন্ম নিয়ন্ত্রণ বৈধ মনে করার দলীল ও তার উত্তর ২৩৩

জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আলোচনার সার সংক্ষেপ ২৩৮

গর্ভপাত (Abortion) ২৩৯

আলোচনার সার সংক্ষেপ ২৪৪

টেস্ট টিউব বেবি (Test Tube Baby) ২৪৫

(১) স্বামী-স্ত্রীর বীর্য সংমিশ্রণ ২৪৫

নাজায়েযের প্রবক্তাগণের দলীল সমূহের জবাব ২৪৭

(২) পর পুরুষ ও পর স্ত্রীর বীর্য সংমিশ্রণ ২৫৪

নাজায়েয টেস্ট টিউব বেবি ও হুরমাতে মুছাহারাত ২৫৬

একটি প্রশ্ন ও তার নিরসন ২৫৭

নাজায়েয পন্থায় টেস্ট টিউব বেবির মাধ্যমে হুরমাতে মুছাহারাত সাব্যস্ত হওয়ার একটি দৃষ্টান্ত ২৫৯

জায়েয টেস্ট টিউব বেবির মীরাছনীতি ২৫৯

নাজায়েয টেস্ট টিউব বেবির মীরাছনীতি ২৫৯

ক্লোনিং - Cloning (الإستنساخ) ২৬৪

ক্লোনিং বলতে কি বুঝায় ২৬৪

ক্লোনিংকারীকে সৃষ্টিকর্তা বলা যাবে কি? ২৬৬

ক্লোনিং পদ্ধতি কি ইসলামী সৃষ্টি ধারণার পরিপন্থী? ২৬৮

ক্লোনিং পদ্ধতি কি জায়েয? ২৬৮

সর্তকতা ২৬৯

ক্লোনিংকৃত বাচ্চার বংশ, মীরাছনীতি ও হুরমাতে মুছাহারাত ২৭১

ডাক্তার ও হুরমাতে মুছাহারাত ২৭৭

কন্যা ও পুত্র সন্তান জন্মের রহস্য.................................... ২৭৯

সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণে ক্রোমোসোম ২৮০

৩য় অধ্যায়

আধুনিক চিকিৎসা ও রোযা ভঙ্গের বিধান

রোযা ভাঙ্গা ও না ভাঙ্গার কিছু মূলনীতি (ضابطة) ২৮৩
সাওম এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা ২৮৪
পেট ও শরীরের অভ্যন্তরের খালি স্থানের অর্থ ২৮৫
রোযা ভাঙ্গা ও না ভাঙ্গার ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য প্রবেশকারী বস্তুর বর্ণনা ২৮৬
রোযা ভাঙ্গা ও না ভাঙ্গার ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য খালিস্থানের বর্ণনা .. ২৮৭
রোযা ভাঙ্গা ও না ভাঙ্গার ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য রাস্তা সমূহ ২৯০
ফকীহগণের আলোচিত ছিদ্র বা রাস্তা (منفذ) এগারটি ২৯১
রাস্তা বা ছিদ্র (منافذ) এর ব্যাপারে ফকীহগণের মতানৈক্যের কারণ ২৯২
উল্লিখিত আলোচনার সার সংক্ষেপ ২৯৫
গ্রহণযোগ্য রাস্তাগুলোর ব্যাপারে বিজ্ঞ ডাক্তারদের মতামত ২৯৬
লোমকূপ গ্রহণযোগ্য রাস্তা নয় ২৯৯
নেত্রনালী গ্রহণযোগ্য রাস্তা নয় ৩০০
রোযা ভাঙ্গা ও না ভাঙ্গার ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য প্রবেশের বর্ণনা ৩০৩
উল্লিখিত আলোচনার সার সংক্ষেপ ৩০৪
মতানৈক্যের ফলাফল ৩০৪
ইবনে হযম উন্দুলুসী (রহ.) এর অভিমত ৩০৬
ইবনে তাইমিয়া (রহ.) এর অভিমত ৩০৭
ইবনে হযম ও ইবনে তাইমিয়া এর অভিমতদ্বয়ের পর্যালোচনা ৩০৭
রোযা ভাঙ্গার গ্রহণযোগ্য প্রতিবন্ধক সমূহ ৩১১
১. বিস্মৃতি (النسيان) এর সংজ্ঞা ও তার হুকুম ৩১২
২. আধিক্য (الغلبة) এর সংজ্ঞা ও তার হুকুম ৩১৩
৩. বাধ্যকরণ (الإكراه) এর সংজ্ঞা ও তার হুকুম ৩১৫
৪. অনিচ্ছা (الخطاء) এর সংজ্ঞা ও তার হুকুম ৩১৫
অনিচ্ছা (خطاء) এবং বিস্মৃতি (نسيان) এর পার্থক্য ৩১৬
৫. নিদ্রা (النوم) এর সংজ্ঞা ও তার হুকুম ৩১৭
৬. অজ্ঞান হওয়া (الإغماء) এর সংজ্ঞা ও তার হুকুম ৩১৮
৭. পাগলামি (الجنون) এর সংজ্ঞা ও তার হুকুম ৩১৯
৮. হারাম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা (الجهل بالتحريم) ও তার হুকুম .. ৩২০

৪র্থ অধ্যায়
রোযা সংক্রান্ত আধুনিক মাসাইল

মস্তিস্ক অপারেশন ৩২২
কানে ওষুধ বা ড্রপ ব্যবহার ৩২২
চোখে ওষুধ বা ড্রপ ব্যবহার ৩২২
নাকে ওষুধ বা ড্রপ ব্যবহার ৩২৩
অক্সিজেন (Oxigen) ব্যবহার ৩২৩
মুখে ওষুধ ব্যবহার ৩২৩
সালবুটামল (Sulbutamol), ইনহেলার (Inhaler) ব্যবহার ৩২৩
রোযা অবস্থায় ইনহেলার ব্যবহারের নিয়ম ৩২৪
এন্ডোসকপি (Endoscopy) ৩২৪
নাইট্রোগ্লিসারিন (Nitroglycerine) ৩২৫
ওষুধ সেবন করে হায়েয বন্ধ করে রোযা রাখা ৩২৫
রক্ত দেয়া ও নেয়া ৩২৬
এনজিওগ্রাম (Angiogram) ৩২৬
ইনজেকশন (Injection) ৩২৭
স্যালাইন (Saline) ৩২৭
ইনসুলিন (Insuline) ৩২৭
পেশাবের রাস্তায় ওষুধ ব্যবহার (Urinary Tract) ৩২৭
যোনিদ্বারে ওষুধ ব্যবহার (Vagina) ৩২৭
সিষ্টোসকপি (Cystoscopy) ৩২৮
গর্ভপাত (Abortion) ৩২৮
(ক) এম, আর (M. R) ৩২৮
(খ) ডি এন্ড সি (D & C) ৩২৯
কপার-টি (Coper-T) ৩২৯
ঢুস (Douche) ৩২৯
প্রক্টোসকপি (Proctoscopy) ৩৩০
ল্যাপারসকপি-বায়োপসি (Laparoscopy-Biopsy) ৩৩০
সিরোদকার অপারেশন (Shirodkar Operation) ৩৩০
তথ্যপুঞ্জি (ثبت المصادر والمراجع) ৩৩২

১ম অধ্যায়

الطب وطريقته

চিকিৎসা ও চিকিৎসা পদ্ধতি

Medical Treatment & It's System

তিব্ব (طب) এর আভিধানিক অর্থ (معنى الطب لغة / The Lingual Mening of Tibb)ঃ

চিকিৎসা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানকে আরবীতে তিব্ব (طب) বলে। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিব্ব (طب) শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, দয়া, যত্ন, চিকিৎসা ও যাদু ইত্যাদি। এ জন্যই যাদুগ্রস্থ ব্যক্তিকে মতবূব (مطبوب) বলা হয়। তবে সাধারণত তিব্ব (طب) শব্দটি চিকিৎসা অর্থে অধিক ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[৬]

তিব্ব (طب) এর পারিভাষিক অর্থ (معنى الطب اصطلاحاً / The Terminology Meaning of Tibb) :

চিকিৎসা বিজ্ঞান (علم الطب) ঐ বিদ্যাকে বলা হয়, যা শিখলে কোন প্রাণীর অসুস্থতার কারণ ও তা থেকে বাঁচার উপায়-উপকরণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়।[৭]

---

৬ أمّا الطب فيُطلق على علاج الجسم والنفس . لسان العرب ، ١/٥٥٤ ، القاموس المحيط ، ص: ١٣٩، المعجم الوسيط ، ٢/٥٤٩ . (طب) .

লিসানুল আরব, খ. ১, পৃ. ২৫৩-২৫৪, তাজুল আরূস, খ. ২, পৃ. ১৭৬

৭ إن الطب علم يتعرف منه أحوال بدن الإنسان من جهة ما يصح ويزول عن الصحة ليحفظ الصحة حاصلة ويستردها زائلة . القانون في الطب لابن سينا ، ١/٣ ، ١٣ .

আল-কানূন ফিত তিব্ব, ইবনে সীনা, খ. ১, পৃ. ৩, ১৩

চিকিৎসা বিজ্ঞান এর উদ্দেশ্য (موضوع علم الطب / The Subject of Elmut Tibb) :

চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হল, স্বাস্থ্য সংরক্ষণ এবং ভগ্ন ও রুগ্ন স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার করা।[৮]

ضرورة المعرفة الابتدائيَّة بالعمليَّة الطبِّيَّة للعلماء
আলেমদের জন্য চিকিৎসা পদ্ধতি বিষয়ক মৌলিক ধারণার প্রয়োজনীয়তা
The Necessity of Primary Knowledge on Medical Treatment for Ulema

আলেম সম্প্রদায় হলেন সমাজের পথপ্রদর্শক। তাই সমাজে বসবাসকারী মানুষের চাল-চলন ও রীতি-নীতি এবং এর যে কোন ধরণের সমস্যার সমাধান সম্পর্কে তাদের সম্যক জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। প্রবাদ আছে,

من جهل بأهل زمانه فهو جاهل .[৯]

অর্থাৎ "যুগের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ও চাল-চলন সম্পর্কে যে জ্ঞাত নয়, সে মূর্খ"।[১০]

তাই বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি একজন বিজ্ঞ আলেম ও মুফ্তীর জন্য চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান রাখা অতিব জরুরী। কারণ, চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে মৌলিক ধারণা না থাকলে চিকিৎসা ব্যবস্থার কোন্ পদ্ধতি শরী'আত সম্মত আর কোন্ পদ্ধতি শরীআতের সাথে সাংঘর্ষিক; তা বুঝতে সক্ষম হবেন না।

এ ছাড়া এমন অনেক চিকিৎসা রয়েছে যা ইবাদতের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। এ ক্ষেত্রে চিকিৎসা গ্রহণের পর ঐ ইবাদতটি সঠিক হচ্ছে কিনা

---

৮ তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, চিকিৎসা অধ্যায়, খ. 4, পৃ. ২৯২

9 شرح عقود رسم المفتي ، للعلامة ابن عابدين الشامي ، ص: ١٨١ .

১০ শরহু উকূদি রসমিল মুফতী, পৃ. ১৮১

অন্তত সে সম্পর্কে অবগতি লাভের নিমিত্তে চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা লাভ করা অতিব প্রয়োজন।

مكانة التداوي فى الإسلام
ইসলামের দৃষ্টিতে চিকিৎসা গ্রহণের অবস্থান
The Status of Medical Treatment in Islam

চিকিৎসা গ্রহণ সম্পর্কে অনেক আয়াত ও হাদীস বিদ্যমান রয়েছে, যার দ্বারা এ কথা বুঝা যায় যে, ইসলাম শুধু চিকিৎসার অনুমতিই দেয়নি বরং চিকিৎসার জন্য উদ্বুদ্ধও করেছে।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিজেও চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন, সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) কেও চিকিৎসা গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন। হাদীসে আছে ঃ

سئل أنس بن مالك –رضي الله تعالى عنه– عن كسب الحجام ، فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام ، وكلَّم أهله، فوضعوا عنه من خراجه ، وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة ، أو هو من أمثل دوائكم .[১১]

অর্থ ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) কে শিঙ্গা প্রদান কারীর শিঙ্গার বিনিময় উপার্জন হালাল কিনা? জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম শিঙ্গা গ্রহণ করেছেন। আবূ তয়বাহ তাঁকে শিঙ্গা লাগিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাকে দুই সা' (নির্দিষ্ট একটি ওজনের নাম) খাদ্যদ্রব্য প্রদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তার মালিক পক্ষের সাথে তার ট্যাক্স কমানোর জন্য কথা বলেছেন। ফলে তারা তার দৈনন্দিন প্রদেয় ট্যাক্সের পরিমাণ

---

১১ أخرجه مسلم في صحيحه ، باب حل أجرة الحجامة ، ٢: ٢٢ ، رقم الحديث : ٤٠٠٧ .

কমিয়ে দিয়েছিল। আর বলেছেন, যা কিছু দ্বারা তোমরা চিকিৎসা কর তার মধ্যে উত্তম হলো শিঙ্গা লাগানো।[১২]

عن سعد بن أبي وقاص –رضي الله تعالى عنه– قال: مرضت مرضا ، أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني ، فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها في فؤادي ، فقال: إنك رجل مفؤود ، إئت الحارث بن كلدة –أخا ثقيف– ، فإنه رجل يتطبَّب ، إلخ . [١٣]

অর্থ ঃ হযরত সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাযি.) বলেন, আমি একবার ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাকে দেখতে এসে তাঁর হাত মুবারক আমার বুকের উপর রাখেন। আমি অন্তরে এর শীতলতা অনুভব করি। অতঃপর তিনি বলেন ঃ তুমি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছ। তুমি ছাকীফ গোত্রের হারেস বিন কালদার কাছে যাও। সে চিকিৎসা করে।[১৪]

হাদীসদ্বয় দ্বারা এ কথা বুঝে আসে যে, ইসলামের দৃষ্টিতে চিকিৎসা শুধু বৈধই নয় বরং তা গ্রহণ করাও কাম্য। তবে তা কোন্ পর্যায়ের বিষয়টি পরিস্কার ভাবে বুঝার জন্য আগে বুঝে নিতে হবে যে, চিকিৎসা কেবল রোগ মুক্তির একটি মাধ্যম ও উপকরণ। আর সব ধরণের উপকরণ এক পর্যায়ের নয়। উপকরণের ভিন্নতার কারণে তার হুকুমও ভিন্ন হয়। তাই প্রথমে উপকরণের প্রকারভেদ ও এগুলোর হুকুম জেনে

---

১২ মুসলিম, খ. ২, পৃ. ২২, হাদীস নং ৪০০৭

১৩ أخرجه أبو داود في سننه في الطب ، باب في تمر العجوة ، ٢: ٥٤١ ، رقم الحديث: ٣٨٦٩، و أورده الهيثمي في مجمع الزوائد في الطب ، باب دواء الفؤاد لألبان الإبل وغير ذلك ، ٥: ١٤٤، ١٤٥، رقم الحديث: ٨٣٠٠ ، عن الطبراني ، وقال: وفيه يونس بن حجاج الثقفي، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات .

১৪ আবূ দাউদ, খ. ২, পৃ. ৫৪১, হাদীস নং ৩৮৬৯, মাজমাউয যাওয়াইদ, খ. ৫, পৃ. ১৪৪, ১৪৫, হাদীস নং ৮৩০০।

নিতে হবে। এর পর চিকিৎসা কোন ধরণের উপরকণ এবং তার হুকুম ও অবস্থান কী? তা জানা সহজ হবে।

أقسام الأسباب وأحكامها
উপকরণের প্রকারভেদ ও তার হুকুম
The Classification of Instrument & It's Judgment/Priciples

ইসলামের দৃষ্টিতে উপকরণ (أسباب) চার প্রকার। যথা-

১. **উন্মুক্ত উপকরণ** (السبب المطلق /General Instrument) :

অর্থাৎ এমন উপকরণ, যার উপকার ও ক্ষতি কোনটিরই প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত নয়। যেমন, বিভিন্ন পানীয় বস্তু পান করলে উপকার ও ক্ষতি কোনটিই নিশ্চিত নয়।

এগুলো পান করা মুবাহ্ বা বৈধ।

২. **সন্দেহযুক্ত উপকরণ** (السبب الموهومي /Doudtful Instrument) :

অর্থাৎ এমন উপকরণ, যার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া কম বরং কখনো কখনো বিপরীত প্রতিক্রিয়ারও আশংকা রয়েছে। যেমন, দাগ বা সেঁক দেয়া। এগুলো ব্যবহার করলে উপকার হতেও পারে, নাও হতে পারে। তবে উপকারের তুলনায় অপকারের সম্ভাবনা বেশী।

এগুলো শরীআতের দৃষ্টিতে পরিত্যাজ্য।

৩. **অনুমান ভিত্তিক উপকরণ** (السبب الظني /Suppositive Instrument):

অর্থাৎ এমন উপকরণ যা ব্যবহার করলে ক্ষতির তুলনায় উপকারের সম্ভাবনা বেশী। যেমন- অধিকাংশ ডাক্তারী ও কবিরাজী চিকিৎসা।

এগুলো গ্রহণ করা শরীআতের দৃষ্টিতে শুধু উত্তমই নয় বরং মুস্তাহাব ও সুন্নাতও বটে।

عن جابر –رضي الله تعالى عنه– عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : لكل داء دواء ، فإذا أصيب دواء الداء ، برأ بإذن الله تعالى . [١٥]

অর্থঃ হযরত জাবির (রাযি.) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ প্রত্যেক রোগের চিকিৎসা রয়েছে। রোগ অনুযায়ী চিকিৎসা হলেই আল্লাহ পাকের হুকুমে আরোগ্য লাভ হয়।[১৬]

وقال الإمام النووي : في هذا الحديث إشارة إلى استحباب الدواء ، وهو مذهب أصحابنا وجمهور السلف وعامة الخلف ، .... وفيها رد على من أنكر التداوي من غلاة الصوفية، وقال : كل شيء بقضاء وقدر ، فلا حاجة إلى التداوي .

وحجة العلماء هذا الحديث ، ويعتقدون أن الله تعالى هو الفاعل، وأن التداوي هو أيضًا من قدر الله ، وهذا كالأمر بالدعاء ، وكالأمر بقتال الكفار ، وبالتحصين ومجانبة الإلقاء باليد إلى التهلكة ، مع أن الأجل لا يتغير ، والمقادير لا تتأخر ولا تتقدم عن أوقاتها ، ولا بد من وقوع المقدَّرات . [١٧]

অর্থ ঃ ইমাম নববী (রহ.) বলেন ঃ উল্লেখিত হাদীসে চিকিৎসা গ্রহণ মুস্তাহাব হওয়ার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। আর এটাই আমাদের ইমামগণ ও (জমহুর) পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের মত। এ হাদীসে কট্টরপন্থী সূফীগণ, যারা চিকিৎসাকে অস্বীকার করেন তাদের কথাকে খন্ডন করা হয়েছে। তারা এ কথা বলেন যে, সবকিছু তাক্বদীর

---

১৫ أخرجه مسلم في صحيحه في باب لكل داء دواء واستحباب التداوي ، ٢: ٢٢٥ ، رقم الحديث : ٥٦٩٧ ، ومثله : في مسند أبي حنيفة ، ص: ١٥٦ .

১৬ মুসলিম, খ. ২, পৃ. ২২৫, হাদীস নং ৫৬৯৭, মুসনাদে আবী হানীফা, পৃ. ১৫৬

১৭ شرح النووي على صحيح مسلم ، ٢: ٢٢٥ .

অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলার হুকুমে হয়। অতএব, চিকিৎসার কোন প্রয়োজন নেই।

আলেমগণের দলীল এ সমস্ত (চিকিৎসা সম্পর্কিত) হাদীস। তারা এই আকীদা রাখেন যে, আল্লাহ তায়ালাই প্রকৃত কর্তা ও প্রভাব বিস্তারকারী। চিকিৎসা গ্রহণও তাকদীরের আওতাভুক্ত। এটা দু'আ করার, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করার ও আত্মরক্ষার ব্যবস্থা এবং নিজেকে স্বহস্তে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া থেকে বেঁচে থাকার হুকুমের ন্যায়। (এখানে উল্লেখিত কাজগুলোর হুকুম দেয়া হয়েছে) অথচ মৃত্যুর সময় অপরিবর্তিত। নির্ধারিত সীমা রেখার আগ পাছ হয় না। যা তাকদীরে আছে তা ঘটবেই।[১৮]

৪. সুনিশ্চিত উপকরণ (السبب اليقيني/Certain Instrument) :

অর্থাৎ এমন উপকরণ, যার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সুনিশ্চিত। যেমন- খাবার ভক্ষণ করলে ক্ষুধা দূর হয়, পানি পান করলে পিপাসা নিবারিত হয় ইত্যাদি।

মৃত্যু মুখে পতিত হওয়ার আশংকা হলে এ ধরণের উপকরণ গ্রহণ করা ফরয আর বর্জন করা হারাম হয়ে যায়।[১৯]

জামিউল ফুসূলাইনে আছে ঃ

واعلم أن مزيل الضرر ينقسم إلى مقطوع به، كماء وخبز، لإزالة عطش و جوع .

وإلى مظنون ، كفصد وشرب مسهل ......

وإلى موهوم ، ككئ ورقية .

أمَّا المقطوع به ، فليس تركه من التوكل ؛ بل تركه حرام عند خوف الموت...

---

১৮ শরহুন নববী আলা সহীহি মুসলিম, খ. ২, পৃ. ২২৫

১৯ আদ্দুররুল মুখতার, [রদ্দুল মুহতার সংযুক্ত] খ. ৯, পৃ. ৪৮৮

فكما أن الخبز والماء دواء الجوع والعطش ، فكذا السكنجبين والسقمونيا دواء الصفراء والإسهال ، غير أن علاج الجوع والعطش بماء وخبز جليّ يدركه كل أحد ، ومعالجة الصفراء بالسقمونيا ونحوه خفيّ يدركه بعض الخواص.

فمن أدركه بالتجربة التحق في حقه بالأول .[٢٠]

قلت : وإلى مباح ، كما سيجئ .

অর্থাৎ ক্ষতি দূর করার উপকরণ তিন প্রকার-

(১) সুনিশ্চিত উপকরণ, যেমন- পিপাসা নিবারণের জন্য পানি ও ক্ষুদা নিবারণের জন্য রুটি।

(২) অনুমান ভিত্তিক উপকরণ, যেমন- শিঙ্গা লাগানো ও জোলাফ পান করা।

(৩) সন্দেহযুক্ত উপকরণ, যেমন- দাগ লাগানো ও মন্ত্র ব্যবহার।

সুনিশ্চিত উপকরণ ত্যাগ করা তাওয়াক্কুল নয়, বরং মৃত্যুর আশংকা থাকা সত্ত্বেও এগুলো ত্যাগ করা হারাম......

(এবার বুঝুন,) রুটি আর পানি যেভাবে ক্ষুধা ও পিপাসার ওষুধ, এভাবে সিরকা বা লেবু সংমিশ্রিত টক-মিষ্টি শরবতও ক্রিমি নাশক এবং জন্ডিস ও পেট নরম করার ওষুধ। তবে এ দু'টির মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, রুটি ও পানি যে ক্ষুধা ও পিপাসার ওষুধ একথা স্পষ্ট ও সকলের জানা। আর উল্লিখিত শরবত ইত্যাদি দ্বারা জন্ডিসের চিকিৎসা অস্পষ্ট, যা সকলে জানে না। এ বিষয়ে যারা বিজ্ঞ শুধু তারা জানে।

অতএব, যে অভিজ্ঞ ব্যক্তি এ কথা জানতে পারে যে, অমুক ওষুধ দ্বারা অমুক রোগের চিকিৎসা হয়ই, আর রোগীও মৃত্যু মুখে পতিত কিংবা তার কোন অঙ্গ নষ্ট হয়ে যাওয়ার উপক্রম অথবা সে খুব কষ্ট পাচ্ছে তখন

---

২০ جامع الفصولين : الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ، كتاب الوصية ، قبيل الفصل الخامس والثلاثون ، ٢: ١٩٠–١٩١، وتبعه في الفتاوى الهندية ، كتاب الكراهة ، باب الثامن عشر في التداوي والمعالجات ، ٥: ٣٥٥ .

তার জন্য তা গ্রহণ করা ওয়াজিব কিংবা ফরয, আর বর্জন করা মাকরূহ কিংবা হারাম হয়ে যাবে।[২১]

এ কারণেই কোন কোন ক্ষেত্রে চিকিৎসার জন্য পর্দা লংঘন করা, সতর দেখা ও হারাম বস্তু ভক্ষণ করা বৈধ হয়ে যায়।[২২] অন্যথায় মুবাহ কিংবা মুস্তাহাবের জন্য তো হারাম বৈধ হওয়ার কথা নয়।[২৩]
হাদীস শরীফে আছে ঃ

عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا ضرر ولا ضرار . [٢٤]

---

২১ জামিউল ফুসূলাইন, খ. ২, পৃ. ১৯০, ১৯১, ফাতাওয়া হিন্দিয়া, খ. ৫, পৃ. ৩৫৫

২২ হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা "হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসার বিধান" (التداوي بالمحَرَّم) অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২৩ যদিও এখানে এ কথা বলারও অবকাশ রয়েছে যে, চিকিৎসার জন্য পর্দা লংঘন ও হারাম ভক্ষণ অল্প সময়ের জন্য হয়। আর চিকিৎসাকে মুস্তাহাব মেনে নিলেও তা যেহেতু স্থায়ী কিংবা দীর্ঘ সময়ে জন্য হয় তাই পর্দা লংঘন ও হারাম বস্তু ভক্ষণ বৈধ হয়ে যায়।

২৪ رواه الإمام مالك مرسلا في الأقضية ، باب القضاء بالمرفق ، ص: ٣١١ ، رقم الحديث : ١٤٢٤، وابن ماجه في أبواب الأحكام ، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره ، ٢: ١٦٩ ، عن عبادة بن الصامت –رضي الله تعالى عنه– ، رقم الحديث : ٢٣٤٠ ، ٢٣٤١ ، قلت : وفيه انقطاع ، ورواه أحمد في مسنده برجال ثقات ، ١: ٣٣٣ ، رقم الحديث : ٢٨٦٧ ، والبيهقي فى السنن الكبرى في باب لا ضرر ولا ضرار ، ٦: ٦٩ عن أبي سعيد الخدري – رضي الله تعالى عنه– ، رقم الحديث : ١١٧١٧ ، وقال النووي فى الأربعين (١: ٣٢) : حديث حسن .... وله طرق أخرى يقوِّي بعضها بعضًا ، وقال أبو عمرو بن الصلاح : هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه ، ومجموعها يقوِّي الحديث ويحسِّنه ، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به .

অর্থ ঃ হযরত উবাদাহ ইবনুছ ছামিত (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, ইসলামে না অন্যকে ক্ষতি করার অনুমতি আছে, না নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার।[২৫]

তাইতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম চিকিৎসা গ্রহণ করার জন্য আদেশ করেছেন।

হাদীস শরীফে আছে ঃ

عن أبي الدرداء –رضي الله تعالى عنه– قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا إلخ .[٢٦]

অর্থ ঃ হযরত হযরত আবূ দারদা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ আল্লাহ তা'আলাই রোগ ও ওষুধ অবতীর্ণ করেছেন এবং প্রত্যেক রোগের চিকিৎসাও তিনি সৃষ্টি করেছেন। অতএব তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ কর।[২৭]

ভাবার বিষয়, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম চিকিৎসা গ্রহণের আদেশ করছেন সেখানে চিকিৎসা বর্জন করার প্রশ্ন আসে না। বরং তাঁর আদেশের কারণে তা গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।

ইসলামিক ফিক্হ একাডেমী জেদ্দা এর সিদ্ধান্তবলী যাকে উপরোক্ত আলোচনার সার সংক্ষেপ বললেই চলে এখানে হুবহু তুলে ধরছি ঃ

الأصل في حكم التداوي أنه مشروع، لما ورد في شانه في القرآن الكريم والسنة القولية والعملية ، لما فيه من حفظ النفس الذي هو أحد المقاصد الكلية من التشريع .

---

২৫ আল-মুয়াত্তা লিল ইমাম মালিক, পৃ. ৪৬৪, ইবনু মাজাহ, খ. ২, পৃ. ১৬৯, হাদীস নং ২৩৪০, ২৩৪১, মুসনাদু আহমাদ, খ. ১, পৃ. ৩১৩, হাদীস নং ২৮৬৭, আস সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, খ. ৬, পৃ. ৬৯

২৬ أخرجه أبو داود في سننه فى الطبّ ، باب فى الأدوية المكروهة ، ٢: ٥٤١ ، رقم الحديث : ٣٨٦٤ .

২৭ আবূ দাউদ, খ. ২, পৃ. ৫৪১, হাদীস নং ৩৮৬৪

وتختلف أحكام التداوي باختلاف الأحوال والأشخاص: فيكون واجبا على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه ، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره ، كالأمراض المعدية .

ويكون مندوبا إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن ، ولا يترتب عليه ما سبق في الحالة الأولى .

ويكون مباحا إذا لم ينحرج فى الحالتين السابقتين .

ويكون مكروها إذا كان بفعل يخاف منه حدوث مضعفات أشد من العلة المراد إزالتها .[٢٨]

অর্থ ঃ চিকিৎসা গ্রহণ বৈধ, কেননা কুরআন কারীম, কাউলী হাদীস ও আমলী হাদীস তার প্রমাণ বহন করে। তাছাড়া এতে জীবন সংরক্ষণ হয়, যা ইসলামী শরীআতের ব্যাপক উদ্দেশ্যাবলীর একটি।

ব্যক্তি এবং অবস্থাভেদে চিকিৎসার হুকুম ভিন্ন হয়। যথা-

ওয়াজিব, যখন চিকিৎসা গ্রহণ না করলে জীবন চলে যাওয়া, অঙ্গহানী হওয়া অথবা কার্য ক্ষমতা হারিয়ে ফেলার আশংকা থাকে। তেমনি ভাবে যদি রোগ ছোঁয়াচে হয় যে, তার ক্ষতি অন্যকেও গ্রাস করার আশংকা থাকে তাহলে এর চিকিৎসা ওয়াজিব হয়ে যায়।

মুস্তাহাব, চিকিৎসা না করলে যদি দুর্বল হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে আর উপরোল্লেখিত কোন অবস্থার আশংকা না থাকে তাহলে তা মুস্তাহাব।

মুবাহ, উপরোল্লেখিত দুই অবস্থা না হলে মুবাহ।

মাকরূহ, যদি চিকিৎসা এমন হয় যে, এতে সমস্যা আরো বেড়ে যাওয়ার ভয় থাকে তাহলে মাকরূহ।[২৯]

---

২৮ قرارات مجلة مجمع الفقه الإسلامي ص **٣٥**، رقم القرار: **٦٩/٥/٧** .

২৯ কারারাতু মাজাল্লাতি মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী, পৃ. ৩৫, কারার নং ৬৯/৫/৭

উল্লেখ্য যে, চিকিৎসা ও উপকরণ গ্রহণের ক্ষেত্রে এ আকীদা ও বিশ্বাস রাখতে হবে যে, ওষুধ ও উপকরণের নিজস্ব কোন শক্তি ও প্রতিক্রিয়া নেই, বরং আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি বলে ও তাঁর আদশক্রমে এগুলোর প্রভাব ও ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

مما تقتضيه عقيدة المسلم أن المرض والشفاء بيد الله عزوجل، وأن التداوي والعلاج أخذ بالأسباب التي أودعها الله تعالى في الكون، وأنه لا يجوز اليأس من روح الله أو القنوط من رحمته؛ بل ينبغي بقاء الأمل في الشفاء بإذن الله .[٣٠]

চিকিৎসা কি তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী?

এ ব্যাপারে তিনটি মতামত পরিলক্ষিত হয়। যথা-

১. চিকিৎসা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী। কেননা হাদীস শরীফে আছেঃ

عن ابن عباس –رضي الله تعالى عنه–، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون، و على ربهم يتوكلون .[٣١]

অর্থ- আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর তারা হল, যারা ঝাড়-ফুঁক ও কুলক্ষণ নির্ধারণ করে না বরং তারা তাদের পালনকর্তার উপর ভরসা করে।[৩২]

এ হাদীসের উপর ভিত্তি করে কেহ কেহ এ মত পোষণ করেছেন যে, অসুস্থ হলে চিকিৎসা গ্রহণ করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী। তাই অসুস্থ হলে তার চিকিৎসা না করে আল্লাহ তা'আলার উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা করা উচিত।

---

৩০ قرارات مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، ص: ٣٥ ، رقم القرار ٦٩/٥/٧

৩১ أخرجه البخاري فى الرقاق ، باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ، ٢: ٩٥٨ ، رقم الحديث : ٦٤٧٢ .

৩২ বুখারী, খ. ২, পৃ. ৯৫৮, হাদীস নং ৬৪৭২

২. চিকিৎসা তাওয়াক্কুলের খেলাফ বা পরিপন্থী নয়। তবে চিকিৎসা না করে ধৈর্য ধারণ করা তাওয়াক্কুলের সর্বোচ্চ স্তর। হযরত আবূ বকর (রাযি.), হযরত আবূ দারদা (রাযি.) সহ অনেক তাবেয়ীন, তাবে' তাবেয়ীন ও বুযুর্গদের থেকে চিকিৎসা গ্রহণ না করার ব্যাপারে যে কথা বর্ণিত আছে, তা তারা তাওয়াক্কুলের উচ্চস্তর লাভের আশায় অবলম্বন করেছেন।[৩৩]

৩. চিকিৎসা গ্রহণ তাওয়াক্কুল ও খোদা ভরসার উচ্চস্তরের পরিপন্থী নয় বরং মুস্তাহাব। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে ফরযও হয়ে যায়। যার বিস্ত ারিত আলোচনা পূর্বে "ইসলামের দৃষ্টিতে চিকাৎসা গ্রহণের অবস্থান" শিরোনামে করা হয়েছে।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, তাহলে প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষ যেসব হাদীস পেশ করেছে সেগুলোর জওয়াব কী?

প্রথম পক্ষের দলীলের জওয়াব

গভীরভাবে চিন্তা করলে এ কথা বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না যে, প্রথম পক্ষ তাদের স্বপক্ষে যে হাদীসটি উল্লেখ করেছে তা দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কোনো প্রকার চিকিৎসা গ্রহণ না করে শুধু তাওয়াক্কুল ও ধৈর্য ধারণের কথা বলেননি। বরং এ হাদীস দ্বারা বর্বরতা ও অন্ধকার যুগের প্রচলিত রীতি-নীতি, হারাম ও কুফরী মন্ত্রের চিকিৎসা বা অর্থ বুঝে আসে না এমন মন্ত্র দ্বারা চিকিৎসা এবং ভ্রান্ত বিশ্বাস পরিহার করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।[৩৪]

---

৩৩ إتحاف السادة المتقين ،كتاب التوكُّل ، بيان أن ترك التداوى قد يحمد في بعض الأحوال ، ٩: ٥٢١– ٥٣٥ ، أوجز المسالك ، كتاب الجامع ، بيان تعالج المريض ، ٦: ٣١٠– ٣١١.
ইতহাফুস্‌সাদাতিল মুত্তাকীন, খ. ৯, পৃ. ৫২১-৫৩৫, আওজাযুল মাসালিক, খ. ৬, পৃ. ৩১০-৩১১

৩৪ তানযীমুল আশতাত, খ. ৩, পৃ. ১৩৯

قال الحافظ ابن حجر العسقلانى : فالرقية فى ذاتها ليست ممنوعة، وإنما منع منها ما كان شركاً أو احتمله، ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم: "اعرضوا على رقاكم، ولابأس بالرقى ما لم يكن شرك"، ففيه إشارة إلى علة النهى، كما تقدم تقرير ذلك واضحاً فى كتاب الطب، وقد نقل القرطبى عن غيره أن استعمال الرقى والكى قادح فى التوكل بخلاف سائر أنواع الطب، وفرق بين القسمين بأن البرء فيهما أمر موهوم وما عداهما محقق عادة كالأكل والشرب فلا يقدح .

قال القرطبي: وهذا فاسد من وجهين: أحدهما: أن أكثر أبواب الطب موهوم ، والثانى: أن الرقى بأسماء الله تعالى تقتضى التوكل عليه، والالتجاء إليه، والرغبة فيما عنده، والتبرك بأسمائه، فلو كان ذلك قادحاً فى التوكل لقدح الدعاء، إذ لا فرق بين الذكر والدعاء، وقد رقى النبى صلى الله عليه وسلم، ورقى وفعله السلف والخلف، فلو كان مانعا من اللحاق بالسبعين أو قادحاً فى التوكل لم يقع من هؤلاء، وفيهم من هو أعلم وأفضل ممن عداهم، إلخ .[٣٥]

অর্থ- "হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) তাঁর বিখ্যাত (বুখারীর) ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল বারীতে (১১: ৪৯৭-৪৯৮) ইবনে তাইমিয়ার উক্তি ও তার জবাব উল্লেখ করার পর বলেনঃ ঝাড়ফুঁক মূলত নিষিদ্ধ নয়। তবে শিরকী বা শির্‌ক সম্ভাব্য ঝাড়ফুঁক নিষেধ করা হয়েছে। সেই জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "তোমাদের ঝাড়ফুঁক (পদ্ধতি) আমার নিকট পেশ কর। শির্‌ক না হলে ঝাড়ফুঁক করতে অসুবিধা নেই।" (লেখক ইবনে হাজার বলেনঃ) এই হাদীসে (ঝাড়ফুঁক) নিষেধাজ্ঞার কারণের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা كتاب الطب তথা চিকিৎসা সংক্রান্ত অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

---

৩৫ فتح الباري ،كتاب الرقاق ، باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب ، بعد سرد قول ابن تيمية ، والجواب عنه ، ١١: ٤٩٧–٤٩٨ .

আল্লামা কুরতুবী (রহ.) অন্য এক ব্যক্তির ভ্রান্ত একটি মত উল্লেখ করে তা খন্ডন করেন। মতটি হল- "ঝাড়ফুঁক ও সেঁক দেওয়া তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী। তবে অন্যান্য ডাক্তারি চিকিৎসা (তেমন পরিপন্থী) নয়। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হল- ঝাড়ফুঁক আর সেঁক দেওয়ার মধ্যে আরোগ্য লাভ সম্ভাব্য পর্যায়ের। এ দু'টি ছাড়া অন্যান্য গুলোর মাঝে আরোগ্য লাভ (প্রায়) নিশ্চিত। যেমন- পানাহার। সুতরাং ডাক্তারি চিকিৎসা তাওয়াক্কুলের ক্ষেত্রে সমস্যা হবে না।"

আল্লামা কুরতুবী (রহ.) এ মতটিকে খন্ডন করতে যেয়ে বলেনঃ এ মত ও ব্যাখ্যাটি দু'ভাবে ভ্রান্ত ও অসার। প্রথমতঃ ডাক্তারি চিকিৎসার অধিকাংশ হল সম্ভাব্য পর্যায়ের। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ তা'আলার নামের ঝাড়ফুঁক (মূলত) আল্লাহ তা'আলার উপর তাওয়াক্কুলেরই বহিঃপ্রকাশ এবং তাঁর প্রতি আবেগ, শরণাপন্ন হওয়া এবং তাঁর নামের বরকত গ্রহণের দাবি রাখে। তাই (আল্লাহ তা'আলার নামের) ঝাড়ফুঁক যদি তাওয়াক্কুলের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয় তাহলে তো দু'আও প্রতিবন্ধক ও পরিপন্থী বিষয় হিসেবে গণ্য হবে। কেননা দু'আ ও যিকিরের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর পরবর্তী ও পূর্ববর্তী সকল অনুসারীগণ এই ঝাড়ফুঁক করেছেন। যদি ঝাড়ফুঁক করা (হাদীসে উল্লিখিত) সত্তর হাজার এর সাথে অন্তর্ভূক্তির প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় কিংবা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী হয়, তাহলে তাঁরা এমন করতেন না। আর তাঁরা তো অন্যদের চেয়ে অধিকতর জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ।" হযরত গাংগুহী (রহ.) এর একটি ঘটনা এর সমর্থন করে।

হযরত গাংগুহী রহ. এর একটি ঘটনা

হযরত রশীদ আহমাদ গাংগুহী রহ. একবার ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। কোন চিকিৎসাই কাজে আসছিল না। তখন তাঁর ভক্ত ও মুরীদগণ বললেন, হযরত! একজন হিন্দু কবিরাজ আছে, সে 'তাওয়াজ্জুহ' দিলে আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন। তিনি এতে রাজী হলেন না, অসম্মতি প্রকাশ করলেন। কিন্তু তাঁর অসুখ ধীরে ধীরে প্রকট হতে লাগল। এক

সময় তিনি বেঁহুশ হয়ে পড়লেন। এমতাবস্থায় তাঁর ভক্তবৃন্দ উপায়ান্তর না দেখে এ ভেবে ঐ হিন্দু কবিরাজকে নিয়ে আসলেন যে, তিনি তো এখন অচেতন, এখনতো আর নিষেধ করতে পারবেন না। হিন্দু কবিরাজ এসে তাকে 'তাওয়াজ্জুহ' দিতে শুরু করল, এদিকে তিনিও ক্রমান্বয়ে সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন। এক পর্যায়ে তিনি সম্পুর্ণ সুস্থ হয়ে গেলেন। এ অবস্থা দর্শনে হযরত গাংগুহী (রহ.) হিন্দু কবিরাজকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিভাবে এ পর্যায়ে পৌঁছেছ? তখন সে জবাবে বললঃ হুযূর! আমি আমার চাহিদার বিপরীত কাজ করি, অর্থাৎ মন যা চায় সর্বদা তার উল্টো করি। এর বদৌলতেই ভগবান আমাকে এ পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। তখন গাংগুহী (রহ.) বললেনঃ আচ্ছা, বলোতো ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা কি তোমার মনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না কি পরিপন্থী? হিন্দু কবিরাজ জবাবে বললো, হ্যাঁ, এটা আমার মনের পরিপন্থী। তখন হযরত গাংগুহী (রহ.) বললেনঃ তাহলে তোমার পূর্বের বক্তব্য অনুযায়ী তুমি এখন ইসলাম গ্রহণ করে ফেল। তখন হিন্দু কবিরাজ হযরত গাংগুহীর হাতে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল। সুবহানাল্লাহ!

উক্ত ঘটনা থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) কুফরী মন্ত্র থেকে বাঁচার লক্ষ্যে হিন্দু কবিরাজের চিকিৎসা নিতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেছেন।

দ্বিতীয় পক্ষের দলীলের জওয়াব

কিছু কিছু রোগ এমনও আছে ইসলামের দৃষ্টিতে যার অনেক ফযীলত। তাই ফযীলত লাভের উদ্দেশ্যে চিকিৎসা গ্রহণ না করে যারা ধৈর্য ধারণ করে, দ্বিতীয় পক্ষের উল্লিখিত হাদীসে তাদের ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে মাত্র। সর্ব প্রকার রোগের চিকিৎসা গ্রহণ না করার কথা বলা হয়নি।

হযরত আবূ বকর (রাযি.) সহ উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ উক্ত হাদীসের ফযীলত অর্জনের লক্ষ্যে চিকিৎসা গ্রহণ করেননি এবং তাঁদের এ পদক্ষেপ তাওয়াক্কুলের উচ্চস্তরের পরিপন্থী হওয়ার কারণে ছিল না। বরং হাদীসের

ফযীলত লাভের উদ্দেশ্যে ছিল। তাঁরা এর আগেই তাওয়াক্কুলের উচ্চস্তরে উপনীত ছিলেন।

যেমন, ফকীহুন্নফ্স ইমামে রব্বানী হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাংগুহী (রহ.) নিজের চোখের চিকিৎসা না করে সম্পূর্ণ দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলেন। তা ছিল নিম্নে বর্ণিত হাদীসের ফযীলত লাভের উদ্দেশ্যে। হাদীসটি হলঃ

عن أنس بن مالك –رضي الله تعالى عنه–، قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قال: إذا ابتليت عبدى بحبيبتيه فصبر، عوضته منهما الجنة. [৩৬]

অর্থ- হযরত আনাস (রাযি.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন- আমি আমার যে বান্দাকে তার দু'টি প্রিয়তম বস্তু (চক্ষুদ্বয়) নিয়ে পরীক্ষা করি। অতঃপর সে ধৈর্য ধারণ করে। আমি তাকে ঐ দু'টির বিনিময়ে জান্নাত দান করব।[৩৭]

অপর আরেকটি হাদীস

عن أبى هريرة –رضي الله تعالى عنه–، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عزوجل: من أذهبت حبيبتيه، فصبر واحتسب، لم أرض له ثوابا دون الجنة . [٣٨]

অর্থ- হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আমি যার

---

৩৬ رواه البخارى، كتاب المرضى، باب فضل من ذهب بصره، ٢: ٨٤٤، رقم الحديث: ٥٦٥٣، فتح البارى، ١١: ٢٥٥

৩৭ বুখারী, খ. ২, পৃ. ৮৪৪, হাদীস নং ৫৬৫৩, ফাতহুল বারী, খ. ১১, পৃ. ২৫৫

৩৮ رواه الترمذى فى الزهد ، باب ما جاء فى ذهاب البصر ، ٢: ٦٥– ٦٦، رقم الحديث: ٢٤٠١، وقال: هذا حديث حسن صحيح .

দু'টি প্রিয়তম বস্তু (চক্ষুদ্বয়) নিয়ে যাই আর সে ধৈর্য ধারণ করে এবং ছাওয়াবের আশা রাখে। তাকে বিনিময় হিসেবে জান্নাত ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিদান দিতে আমি পছন্দ করি না। অর্থাৎ আমি তাকে অবশ্যই জান্নাত দান করব।[৩৯]

উল্লিখিত হাদীসগুলো থেকে এ কথা একেবারে পরিস্কার হয়ে যায় যে, হযরত আবূ বকর (রাযি.) সহ কতিপয় বুযুর্গের চিকিৎসা গ্রহণ না করা তাওয়াক্কুল কিংবা তাওয়াক্কুলের উচ্চস্তরের পরিপন্থী হওয়ার কারণে ছিল না। বরং বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত ফযীলত লাভের উদ্দেশ্যে ছিল।

আলোচনার সারসংক্ষেপ

চিকিৎসা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। বরং তা কখনও মুবাহ, কখনও সুন্নাত, আবার কখনও ওয়াজিব হয়ে যায়।

চিকিৎসার জন্য পর্দা লঙ্ঘন ও গুপ্তাঙ্গ দেখা

চিকিৎসার জন্য মহিলা ডাক্তার না পাওয়া গেলে পুরুষ ডাক্তারের মাধ্যমে চিকিৎসা করানো বৈধ। এমন কি যদি মহিলার শরীরও দেখার প্রয়োজন পড়ে তাহলে পর্দা লঙ্ঘন হলেও চিকিৎসা করানো বৈধ। তবে সতর্ক থাকতে হবে যে, যতটুকু না দেখলে না হয় তার অতিরিক্ত দেখা জায়েয হবে না, হারাম হবে।

قال في الأشباه : و الطبيب إنما ينظر من العورة بقدر الحاجة ، و فى الجوهرة [٤٠] و تبعه فى رد المحتار[٤١] : أما إذا كان المرض في سائر بدنها غير الفرج ، فإنه يجوز له النظر إليه عند الدواء ؛ لأنه موضع ضرورة ، وإن كان في موضع

---

৩৯ তিরমিযী, খ. ২, পৃ. ৬৫-৬৬, হাদীস নং ২৪০১

৪০ الجوهرة النيرة ، كتاب الحضر و الإباحة ، ٢: ٣٨٥ .

৪১ رد المحتار ، ٦: ٣٧١ .

الفرج ، فينبغي[٤٢] أن يعلِّم امرأة تداويها ، فإن لم توجد امرأة تداويها ، وخافوا عليها أن تهلك أو يصيبها بلاء أو وجع لا تحتمله ، ستروا منها كل شيء موضع العلة ، ثم يداويها الرجل ، و يغض بصره ما استطاع إلا من موضع الجرح .[٤٣]

অর্থ ঃ আল- আশবাহ ওয়ান নাযায়ির কিতাবে আছে, ডাক্তার প্রয়োজন অনুপাতে সতর দেখতে পারবে। আল জাওহারা[৪৪] ও ফাতাওয়ায়ে শামীতে[৪৫] আছে, যদি মহিলার লজ্জাস্থান ব্যতীত পুরা শরীরে রোগ থাকে তাহলে চিকিৎসার প্রয়োজনে পুরুষ ডাক্তার তার দিকে তাকাতে পারবে। আর যদি লজ্জাস্থানেই সমস্যা থাকে তাহলে কোন মহিলাকে চিকিৎসা শিখিয়ে[৪৬] তার দ্বারা চিকিৎসা করাবে। হ্যাঁ, যদি এমন মহিলা পাওয়া না যায় যে চিকিৎসা করতে পারে আর এদিকে রুগী মারা যাওয়ার আশংকা থাকে অথবা তার ব্যথা ও কষ্ট সহ্যের বাইরে চলে যাওয়ার আশংকা হয় তাহলে তার পুরা শরীর ঢেকে দিয়ে শুধু রোগাক্রান্ত জায়গাটি খোলা রেখে পুরুষ ডাক্তার চিকিৎসা করতে পারবে। তবে এ অবস্থায়ও ঐ রোগাক্রান্ত জায়গা ব্যতীত বাকি সকল জায়গা থেকে চক্ষু সরিয়ে রাখবে।[৪৭]

---

৪২ و في رد المحتار ، ٦: ٣٧١ : و الظاهر أن ''ينبغي'' هنا للوجوب .

৪৩ و مثله فى بدائع الصنائع ، كتاب الاستحسان ، ٥ : ١٢٤ ، و أبي السعود ، ١: ٤٢٧ .

৪৪ আল জাওহারাহ, খ. ২, পৃ. ৩৮৫

৪৫ ফাতাওয়ায়ে শামী, খ. ৬, পৃ. ৩৭১

৪৬ উল্লেখ্য, ফাতাওয়ায়ে শামী (খ. ৬, পৃ. ৩৭১) এ উল্লেখ আছে যে, এখানে ''ينبغي'' শব্দটি ওয়াজিবের অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ এ অবস্থায় মহিলাদেরকে ডাক্তারী শিখানো ওয়াজিব।

৪৭ ফাতাওয়ায়ে শামী, খ. ৬, পৃ. ৩৭১, বাদায়ে, খ. ৫, পৃ. ১২৪, আবুস সাউদ, খ. ১, পৃ. ৪২৭

مكانة الطبّ النبويّ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক চিকিৎসার অবস্থান

The Status of The Prophet's (PUBH) Treatment

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকে যে চিকিৎসাবলীর কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে তা দু'প্রকার। যথা-

(১) ঐ সব চিকিৎসা, যা অহী হওয়া নিশ্চিত।

যে সব চিকিৎসা অহী দ্বারা প্রমাণিত ঐ সকল চিকিৎসার ব্যাপারে এই আকীদা ও বিশ্বাস রাখা জরুরী যে, এতে নিঃসন্দেহে রোগের আরোগ্য ও নিরাময় রয়েছে। যেমন- মধু দ্বারা রোগ নিরাময় হওয়া।

হাদীসে আছেঃ

عن أبي سعيد الخدرى –رضي الله تعالى عنه–، قال: جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أخى استطلق بطنه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا ، فسقاه ، ثم جاءه ، فقال: إنى سقيته ، فلم يزده الإ استطلاقاً ، فقال له: ثلاث مرات ، ثم جاء الرابعة ، فقال: اسقه عسلاً ، فقال: لقد سقيته ، فلم يزده إلا استطلاقاً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، صدق الله وكذب بطن أخيك ، فسقاه ، فبرأ . [৪৮]

অর্থ- হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে বললঃ আমার ভাইয়ের ডায়রিয়া হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাকে মধু পান করাতে বললেন। অতঃপর সে তাকে মধু পান করালো। এরপর লোকটি ফিরে এসে বলল যে, তাকে মধু পান করানো

---

৪৮ رواه البخاري فى الطب ، باب الدواء بالعسل ، ٢:٨٤٨ ، رقـــم الحـــديث: ٥٦٨٤ ، ومسلم فى الطب ، باب التداوي بسقي العسل ، ٢: ٢٢٧ ، رقم الحديث ٥٧٢٤ ، و اللفظ له .

হয়েছে কিন্তু এতে তার ডায়রিয়া আরো বেড়ে গেছে। এভাবে তিনবার সে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে এসেছে আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক বারই তাকে মধু পান করানোর পরামর্শ দিয়েছেন। অবশেষে লোকটি চতুর্থবার এসে বলল, আমি তাকে মধু পান করিয়েছি কিন্তু এতে তার ডায়রিয়া আরো বেড়ে গেছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ আল্লাহ পাক সত্য বলেছেন, তবে তোমার ভাইয়ের পেট সঠিক নয়। তারপর পুনরায় তাকে মধু পান করালে সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।[৪৯]

উক্ত হাদীসটির ভিত্তি অহীর উপর। কেননা হাদীসের শব্দ “আল্লাহ পাক সত্য বলেছেন, তোমার ভাইয়ের পেট অসত্য” প্রমাণ করে যে, মধুর আরোগ্য সাধন করাটা অহী দ্বারা প্রমাণিত।

নিম্নবর্ণিত আয়াতটি এর স্পষ্ট দলীল। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেনঃ

وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كلى من كل الثمرات فاسلكى سبل ربك ذللا. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون.[৫০]

অর্থ- তোমার পালনকর্তা মৌমাছিকে নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা পাহাড়-পর্বতে, বৃক্ষে ও মানুষের নির্মিত গৃহে মৌচাক তৈরি কর। অতঃপর বিভিন্ন ফল-ফুল থেকে আহার কর এবং তোমার প্রতিপালকের সহজ পথ অনুসরণ কর। এর উদর হতে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয়; যাতে মানুষের জন্য রয়েছে আরোগ্য। অবশ্যই এতে রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন।[৫১]

---

৪৯ বুখারী, খ. ২, পৃ. ৮৪৮, হাদীস নং ৫৬৮৪, মুসলিম, খ. ২, পৃ. ২২৭, হাদীস নং ৫৭২৪

৫০ سورة النحل ، آية: ٦٨-٦٩ .

৫১ সূরা নাহ্‌ল, আয়াত: ৬৮-৬৯

মধু সম্পর্কে কিছু আশ্চর্য কথা

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, মধু আল্লাহ পাকের বিশেষ একটি নেয়ামত ও রোগের প্রতিকার। মধু তৈরী ও সংরক্ষণের ব্যবস্থাও আল্লাহ পাকের কুদরতের এক আশ্চর্য নিদর্শন। মৌমাছি বিশেষজ্ঞগণ বলেনঃ বিভিন্ন ফল-ফুল থেকে মধুপোকা যে রস আহরণ করে, তা তার লালার সাথে মিশে মধুতে রূপান্তরিত হয়। বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে মাত্র ১ কেজি মধু তৈরী হতে কমপক্ষে ৭০ হাজার পোকার ২৬ হাজার ফুলে ৫ হাজার বার যাতায়াত করতে হয়। এমনিভাবে মধু সংরক্ষণের বিষয়টিও অতি আশ্চর্যের। মধুপোকার জীবন প্রণালী ও শাসন ব্যবস্থা অনেকটা মানুষের ন্যায়। মানুষের যেমন একজন শাসক ও প্রধান থাকে, মৌমাছিরও একজন রাণী (শাসক/প্রধান) থাকে। সে তার প্রজাদের মধ্যে কর্ম বন্টন করে বিভিন্ন পোকাকে বিভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্ত করে। কাউকে পাহারাদারির, কাউকে বাচ্চা পালনের, কাউকে বাসা বানানোর, কাউকে মোম সংরক্ষণের এবং কাউকে মধু সংগ্রহের দায়িত্ব প্রদান করে।

আল্লাহ পাক যেহেতু মধুকে মানুষের খাদ্য ও রোগের প্রতিকার হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, সেহেতু তিনি মধু সংরক্ষণের ব্যবস্থাও অতি আশ্চর্যের সাথে করেছেন। কোন মৌমাছি যদি ময়লা-আবর্জনায় বসে অতঃপর মৌচাকে প্রবেশ করতে চায় তখন মৌচাকের বাইরে নিযুক্ত পাহারাদার পোকাগুলো তাকে ভিতরে প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখে। এমনকি রাণীর আদেশে তাকে হত্যা করে ফেলে। এভাবে আল্লাহ তা'আলা মধুর সাথে যেন অপবিত্র কোন বস্তু মিশ্রিত হতে না পারে তার সুনিপুণ ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তেমনিভাবে মধু যাতে নষ্ট না হয় সে জন্য তাদের লালার মধ্যে এমন এক অপূর্ব মেডিসিন (যা নেক্টার নামে পরিচিত) সৃষ্টি করে রেখেছেন যে, কালের পর কাল বয়ে গেলেও মধু নষ্ট হয় না।[৫২]

---

৫২ বিজ্ঞানের আলোকে কুরআনের অলৌকিকতা, অধ্যায়ঃ প্রাণীতত্ত্ব, লেখকঃ ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আবদুল হাই।

فتبارك الله أحسن الخالقين [৫৩]

অর্থ- সুনিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা‘আলা কত কল্যাণময়।[৫৪]

যা হোক, মধু যে রোগ নিরাময়কারী তা অহীর দ্বারা প্রমাণিত, এতে কোন সন্দেহ নেই। তাইতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মধু পান করানোর পর বর্ণিত ডায়রিয়া আক্রান্ত লোককে রোগ বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও অটল অবিচলভাবে বারবার মধু পান করানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

অতএব, অহী দ্বারা প্রমাণিত চিকিৎসার ব্যাপারে এই আকীদা ও বিশ্বাস রাখতে হবে যে, এতে নিঃসন্দেহে রোগের শিফা ও নিরাময় রয়েছে।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

প্রশ্নঃ এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, বর্তমান ডাক্তারদের মতে, ‘মধু ডায়রিয়া রোগীর জন্য ক্ষতিকর’ অথচ উপরের আলোচনা দ্বারা একথা প্রমানিত হয়েছে যে, ‘মধু সকল রোগের জন্য উপকারী’ এ বিরোধের সঠিক সমাধান কি?

উত্তরঃ যে সকল ডায়রিয়া বদহজমি বা পাকস্থলীর ক্রিয়ার গোলমালের কারণে হয়, সে সকল ক্ষেত্রে ‘মধু অবশ্যই উপকারী’। কিন্তু স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ও ব্যবহার পদ্ধতির পরিবর্তনের কারণে তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে পরিবর্তন ঘটা অস্বাভাবিক নয়।

যেমন- গরম ও ঠান্ডা দুধের প্রভাব বিপরীতমুখী। দুধ ও দই (যা দুধ দ্বারাই তৈরী করা হয়) এর প্রভাব বিপরীতমুখী। যার পেটের সমস্যা আছে আর যার পেটে কোন সমস্যা নেই এদের ক্ষেত্রেও দুধের প্রভাব বিপরীতমুখী। তাই বলে এ কথা বলা মোটেই ঠিক হবে না যে, দুধ স্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর। তদ্রূপ মধুর বেলায় স্থান, কাল, পাত্র ও সেবন

---

৫৩ سورة المؤمنون، آية: ١٤ .

৫৪ সূরা মুমিনূন, আয়াত: ১৪

প্রণালীর পরিবর্তনের কারণে প্রতিক্রিয়ার মধ্যে পরিবর্তন ঘটাই স্বাভাবিক।

দ্বিতীয়তঃ মানুষের কোনো গবেষণাই চুড়ান্ত নয়। মানুষের গবেষণায় আজকের যে থিওরি চরম সত্য, কাল দেখা যায় সেটা সম্পূর্ণ অসত্য। অতএব, পরিবর্তনশীল কোন কিছুর উপর ভিত্তি করে ইলমে অহীর মত অকাট্য বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করা কোন জ্ঞানী লোকের কাজ নয়।

সুতরাং অহী দ্বারা প্রমাণিত আরোগ্যদানকারী সকল বস্তুর ব্যাপারে এই বিশ্বাস রাখা আবশ্যক যে, এর মধ্যে নিঃসন্দেহে আরোগ্য রয়েছে।[৫৫]

উল্লেখ্য, অহী ভিত্তিক আরোগ্য দানকারী চিকিৎসাবলী অহী দ্বারা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও এগুলোর উপর আমল করা কোন ইবাদত ও সাওয়াবের কাজ নয়। তেমনিভাবে এগুলোর উপর আমল করা জরুরীও নয়। কারণ, কুরআন ও হাদীসে কোথাও এ গুলোর উপর আমল করাকে ইবাদত ও সাওয়াবের কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়নি।

(২) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত ঐ সমস্ত চিকিৎসা, যা অহী হওয়া নিশ্চিত নয়।

এগুলোর ব্যাপারে এ আকীদা ও বিশ্বাস রাখা যাবে না যে, এগুলোর উপর আমল করলে রোগ নিরাময় হবেই। কারণ, এগুলোর সিংহভাগ ছিল শ্রুত ও প্রচলিত প্রথা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে[৫৬]। অতএব, এগুলোর উপর আমল করার পর রোগ নিরাময় না হলে হাদীসের উপর ভুল ধারণা রাখা ঠিক হবে না। কেননা এগুলোর ভিত্তি অহী নয়।

---

৫৫ تكملة فتح الملهم ، كتاب الطب ، باب التداوي بسقي العسل ، ٤: ٣٥٦-٣٥٧ ، مع زيادة يسيرة . **তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, খ. 4, পৃ. ৩৫৬-৩৫৭**

৫৬ যার বিস্তারিত আলোচনা "সুন্নাতের প্রকারভেদ" শিরোনামে ৩৯ পৃষ্ঠায় সামনে আসছে।

তেমনিভাবে এগুলোর উপর আমল করা ইবাদতও নয়। কেননা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এগুলোর উপর ইবাদত হিসেবে আমল করেননি এবং করতেও বলেননি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সকল কাজ ও কথা কি অহীর ভিত্তিতে ছিল না?

এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত কোন কথা বা কাজ অহীর ভিত্তিতে হওয়া অনিশ্চিত হয় কিভাবে? অথচ আল্লাহ পাক বলেনঃ

وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى [৫৭]

অর্থ- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিজ থেকে কিছু বলেন না, যা বলেন অহীর ভিত্তিতে বলেন।[৫৮]

এ আয়াতের ভাষ্য অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত চিকিৎসা অহী হওয়ার ব্যাপারে কোন অনিশ্চয়তা থাকার কথা নয়!

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যেমনিভাবে একজন নবী ও রাসূল ছিলেন তেমনি ভাবে তিনি একজন রাষ্ট্র প্রধান, বিচারক, শিক্ষক, দা'য়ী (দ্বীনের দিকে আহ্বানকারী), মুবাল্লিগ (দ্বীন প্রচারক), মুফ্‌তী এবং মানুষও ছিলেন।

তিনি যে সব কথা ও কাজ নবী ও রাসূল হিসেবে বলেছেন ও করেছেন বা করতে বলেছেন ঐ সমস্ত কথা ও কাজের ভিত্তি অহী কিংবা অহী ভিত্তিক ইস্তিম্বাত (গবেষণালব্ধ) ছিল।

আর যে সমস্ত কথা ও কাজ দ্বীন হিসেবে করেননি বা করতে বলেননি সেসব গুলোর ভিত্তি অহীর উপর ছিল না। প্রশ্নে উল্লিখিত

---

৫৭ سورة النجم، آية: ٣-٤ .

৫৮ সূরা নাজ্‌ম, আয়াত: ৩-৪

আয়াতে দ্বীন সম্পর্কীয় কথা ও কাজ বুঝানো হয়েছে।[৫৯] অন্য সকল কথা ও কাজ বুঝানো হয়নি।

সুতরাং তাঁর চিকিৎসা সম্পর্কীয় হাদীসগুলো যেহেতু দ্বীন হিসেবে ছিলনা, তাই এ গুলোর ভিত্তিও অহী হওয়া আবশ্যক নয়। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম দ্বীন বিষয়ক যা কিছু বলেছেন বা করেছেন তা সবই অহীর ভিত্তিতে করেছেন। চাই সরাসরি অহীর ভিত্তিতে হোক অথবা অহী থেকে ইস্তিম্বাত (গবেষণা) করে হোক। পক্ষান্তরে, দুনিয়ার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে সবগুলোর ভিত্তি অহী ছিল না। এক কথায়, তিনি সব কাজ দ্বীন হিসেবে করেননি।

أقسام السنن
সুন্নাতের প্রকারভেদ
The Classification of Sunnah

এখানে একটি অতি প্রয়োজনীয় কথা জেনে রাখা চাই। আর তা হলো, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যা কিছু করেছেন বা করতে বলেছেন সব কি দ্বীন ও ইবাদত হিসেবে করেছেন বা করতে বলেছেন? বিষয়টি পরিষ্কারভাবে জানতে হলে প্রথমে নিম্নবর্ণিত কথাগুলো বুঝে নিতে হবে। আর তাহল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যা কিছু করেছেন বা করতে বলেছেন এ সবগুলোকে সুন্নাত বলা হয়। আর তাঁর সুন্নাতগুলো দুই ভাগে বিভক্ত। যথা-

১. সুন্নাতে হুদা (سنن الهدى)
২. সুন্নাতে গাইরে হুদা (سنن غير الهدى)

হাদীস শরীফে আছে,

---

৫৯ তাফসীরে উসমানী, পৃ. ৬৯৮

عن عبد الله –رضي الله تعالى عنه– قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى ، وإن من سنن الهدى الصلاة فى المسجد الذي يُؤَذَّن فيه.[٦٠]

وعنه –رضي الله تعالى عنه– قال: من سرَّه أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم –صلى الله عليه وسلم– سنن الهدى ، وإنهن من سنن الهدى إلخ .[٦١]

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সুন্নাতে হুদা সমূহ শিখিয়েছেন। মসজিদে আযান দিলে সেখানে গিয়ে নামায পড়া সুন্নাতে হুদার অন্তর্ভুক্ত।[৬২]

তিনি আরো বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি চায় যে, সে আগামীদিন (কিয়ামত দিবসে) আল্লাহ পাকের সাথে মুসলমান হিসেবে সাক্ষাৎ করবে সে যেন আযান দিলেই নামাযগুলো সঠিক ভাবে (জামাতের সাথে) আদায় করে। কেননা আল্লাহ পাক তোমাদের নবীর জন্য সুন্নাতে হুদার বিধান রেখেছেন, আর নামায সুন্নাতে হুদারই শ্রেণীভুক্ত।[৬৩]

---

৬০ أخرجه مسلم في صحيحه فى المساجد ، باب فضل صلاة الجماعة ، ١: ٢٣٢ ، رقم الحديث : ٦٥٣ .

৬১ أخرجه مسلم في صحيحه فى المساجد ، باب فضل صلاة الجماعة ، ١: ٢٣٢ ، رقم الحديث : ٦٥٤ ، و أبو داؤود فى الصلاة ، باب فى التشديد فى ترك الجماعة ، ١: ٨١ ، رقم الحديث : ٥٥٠ ، و النسائي فى الإمامة ، باب المحافظة على الصلوات ، ١: ٩٧ ،رقم الحديث : ٨٤٨ .

৬২ সহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ২৩২, হাদীস নং ৬৫৩

৬৩ সহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ২৩২, হাদীস নং ৬৪, আবূ দাঊদ, খ. ১, পৃ. ৮১, হাদীস নং ৫৫০, নাসাঈ, খ. ১, পৃ. ৯৭, হাদীস নং ৮৪৮

হাদীসদ্বয় থেকে সুন্নাতে হুদা ও গায়রে হুদার ভাগটি স্পষ্ট হয়ে যায়।

সুন্নাতে হুদা দ্বীন, পক্ষান্তরে সুন্নাতে গাইরে হুদা দ্বীন বা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত নয়। তথাপিও এগুলোর মূল্য অনেক।

সুন্নাতে হুদা কাকে বলে

সুন্নাতে হুদা ঐ সুন্নাত বা তরীকাকে বলা হয় যার উপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইবাদত হিসেবে ছাওয়াবের নিয়্যাতে আমল করেছেন বা করতে বলেছেন কিংবা আল্লাহ্ পাকের অসন্তুষ্টির ভয়ে বর্জন করেছেন বা বর্জন করতে বলেছেন। যেমন- নামাজ-রোজা ও গুনাহ বর্জন ইত্যাদি।

সুন্নাতে হুদার প্রকারভেদ

সুন্নাতে হুদা সাত প্রকার। এর মধ্যে চার প্রকার করণীয় ও তিন প্রকার বর্জনীয়। করণীয় চার প্রকার হল- ফরয, ওয়াজিব, আমলে মুয়াক্কাদা ও আমলে গাইরে মুয়াক্কাদা। বর্জনীয় তিন প্রকার হল- হারাম, মাকরূহে তাহ্রীমী ও মাকরূহে তান্যীহী।

এখানে ফরয, ওয়াজিব, হারাম ও মাকরূহকেও সুন্নাত বলা হয়েছে। কারণ, সুন্নাত অর্থ 'তরীকা' বা 'রাস্তা'। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যা কিছু করেছেন বা করতে বলেছেন এগুলো করা, তেমনিভাবে যা কিছু বর্জন করেছেন বা বর্জন করতে বলেছেন এগুলো বর্জন করা 'সবই' তাঁর তরীকা বা রাস্তা। চাই তা ফরয হোক কিংবা ওয়াজিব, হারাম হোক কিংবা মাকরূহ বা অন্য কিছু। বর্তমান পরিভাষায় যে আমলগুলোকে সুন্নাত বলা হয় এগুলো যেমন হুযুরের তরীকা, ফরয-ওয়াজিবও হুযুরের তরীকা।

এগুলোই বাস্তবে দ্বীন, এগুলোর জন্যই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে পাঠানো হয়েছে। এগুলোর মধ্যেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ করা উম্মতের জন্য কর্তব্য।

উল্লেখ্য, কিছু কাজ শরীআতের দৃষ্টিতে এমনও আছে যা করণীয়ও নয়, বর্জনীয়ও নয়। এগুলোকে শরী'আতের পরিভাষায় "মুবাহ" বলে।

সুন্নাতে গায়রে হুদা কাকে বলে

সুন্নাতে গায়রে হুদা ঐ সুন্নাত বা তরীকাকে বলা হয় যার উপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইবাদত হিসেবে ছাওয়াবের নিয়্যাতে আমল করেননি বরং নিম্নবর্ণিত কারণে আমল করেছেন বা করতে বলেছেন।[৬৪]

পর্যায়ক্রমে কারণগুলো হলঃ

(১) অভিজ্ঞতা
(২) ধারণা
(৩) রসম-রেওয়াজ
(৪) প্রয়োজন
(৫) উপকার
(৬) অভ্যাস
(৭) অন্যকে খুশী করার লক্ষ্যে
(৮) সতর্কতা
(৯) বাধ্য-বাধকতা
(১০) কাহিনী
(১১) শ্রুতি তথা পূর্বপুরুষ ও দেশ-বিদেশ থেকে আগত ব্যক্তিদের

---

৬৪ ইমাম আবদুল হাই লৌক্ষ্ণভী (রহ.) সুন্নাতে গাইরে হুদার সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেনঃ

والذى يظهر بالنظر الدقيق ؛ هو أن الفرق بين العبادة والعادة يعرف بالعرف ، فما يكون فى الملبس والمسكن والمشرب والمشى والقيام والقعود وأمثالها ، فما يتكرر فى الإنسان بالطبع وإن لم يرد الشرع يعد من العادات ، وإن نوى الإنسان فيها جهة من جهات القربة . وكل ما ليس كذلك بل يعرف حسنه بالشرع يعد من العبادات . السعاية ، بحث مستحبات الوضوء ، ١: ١٧٣ .

কথার উপর ভিত্তি করা

(১২) সাময়িক কারণ

(১৩) রসিকতা

(১৪) আপতিত বিষয়

(১৫) ভদ্রতা

(১৬) কূটনীতি

(১৭) ও চিকিৎসা ইত্যাদি।

এগুলোকে বাস্তবায়ন করার জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে পাঠানো হয়নি। কেননা এগুলো ইবাদত নয়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

সুন্নাতে গায়রে হুদার প্রকারভেদ

উপরোক্ত কারণগুলোর আলোকে সুন্নাতে গায়রে হুদাকে নিম্নবর্ণিত প্রকারে বিভক্ত করা যায়। যথা-

১. অভিজ্ঞতা নির্ভর সুন্নাত - السنة الخبرية

২. ধারনা ভিত্তিক সুন্নাত - السنة الظنية

৩. রসম-রেওয়াজ তথা প্রথাগত সুন্নাত - السنة الرسمية

৪. প্রয়োজনীয় সুন্নাত - السنة الضرورية

৫. উপকারী সুন্নাত - السنة الإفادية

৬. অভ্যাসগত সুন্নাত - السنة العادية

৭. অন্যকে খুশি করার তথা আনন্দদায়ক সুন্নাত - السنة التفريحية

৮. সতর্কতামূলক সুন্নাত - السنة الاحترازية

৯. বাধ্য-বাধকতামূলক সুন্নাত - السنة الإجبارية

১০. কাহিনীমূলক সুন্নাত - السنة القصصية

১১. শ্রুতিগত সুন্নাত তথা পূর্বপুরুষ ও দেশ-বিদেশ থেকে আগত ব্যক্তিদের কথার উপর ভিত্তি করে যা বলেছেন - السنة السماعية

১২. সাময়িক সুন্নাত - السنة الوقتية

১৩. রসিকতামূলক সুন্নাত - السنة المزاحية

১৪. আপতিত সুন্নাত - السنة الاتِّفاقيَّة

১৫. ভদ্রতাসূলভ সুন্নাত - السنة المجامليَّة

১৬. কূটনৈতিক সুন্নাত - السنة الدِبْلوماسِيَّة

১৭. চিকিৎসামূলক সুন্নাত - السنة الطبيَّة

নিম্নে প্রত্যেকটির উদাহরণ দেয়া হলঃ

১. অভিজ্ঞতা নির্ভর সুন্নাত (السنة الخبرية) এর উদাহরণ

عن ابن عباس –رضي الله تعالى عنهما– قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: و... من سقاه الله لبنا فليقل: ''اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه'' فإنى لا أعلم ما يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن.[٦٥]

অর্থ- হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ "যে ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক দুধ পান করান সে যেন ''اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه'' অবশ্যই বলে। কেননা দুধ ব্যতীত এমন কোন খাবার সম্পর্কে আমার জানা নেই যা একই সাথে খাদ্য ও পানীয় উভয়টির প্রয়োজন পূরণ করে।"[৬৬]

উক্ত হাদীসে দুধের মধ্যে খাদ্য ও পানীয় উভয় উপাদান বা বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান আছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এ বিশ্বাস কোন ইবাদত বা সুন্নাতে হুদার অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা এ কথাটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে বলেছেন। ইবাদত হিসেবে বলেননি।

২. ধারণা ভিত্তিক সুন্নাত (السنة الظنية) এর উদাহরণ

عن رافع بن خديج–رضي الله تعالى عنه–، قال: قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة، و هم يأبرون النخل –يقول يلقحون النخل – فقال ما تصنعون؟

---

৬৫ رواه ابن ماجه فى الأطعمة، باب اللبن، ص: ٢٣٨

৬৬ ইবনে মাজা, পৃ. ২৩৮

قالوا كنا نصنعه، قال: لعلكم لولم تفعلوا كان خيرا، قال: فتركوه فنفضت، أوقال فنقصت، قال: فذكروا ذلك له، فقال: إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشئ من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشئ من رايي فإنما أنا بشر.[٦٧]

وفى رواية له: فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإنى إنما ظننت ظنا، فلا تؤاخذونى بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوابه، فإنى لن أكذب على الله عزوجل.[٦٨]

অর্থ- হযরত রাফি' ইবনে খাদীজ (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মদীনায় আগমন করে মদীনাবাসীদেরকে খেজুর গাছে পরাগযোগ করতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমরা এটা কী কর? উত্তরে বলা হলো যে, আমরা এমন করে থাকি। তিনি বললেন, এমন না করলে হয়তো ভাল হবে। অতঃপর তারা এ কাজ ছেড়ে দিল, এতে খেজুরের ফলন ভাল হলো না। তারা এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে পৌঁছালে তিনি বললেন, আমি তো একজন মানুষ। যখন তোমাদেরকে দ্বীন সম্পর্কীয় কোন বিষয়ে আদেশ করি, তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করবে, আর যখন আমার ব্যক্তিগত অভিমত হিসেবে কোন কিছু বলি, (তাহলে তা মান্য করা আবশ্যক নয়) কেননা আমি তো একজন মানুষ।[৬৯]

অপর হাদীসে আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যদি এমন করলে উপকার হয় তাহলে কর। আমি তো ধারণা করেছিলাম মাত্র (যে এতে উপকার হবে না)। আমার ধারণা যেহেতু ঠিক হয়নি সুতরাং আমার ধারণার উপর তোমাদের আমল করা আবশ্যক নয়। তবে

---

৬৭ رواه مسلم فى الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من معايش الدنيا على سبيل الرأى، ٢: ٢٦٤، رقم الحديث: ٦٠٨٣

68 نفس المصدر، رقم الحديث: ٦٠٨٢

৬৯ মুসলিম, খ. ২, পৃ. ২৬৪, হাদীস নং ৬০৮৩

আমি আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যা কিছু বলে থাকি তা ভালভাবে আঁকড়িয়ে ধরবে। কেননা আমি আল্লাহ পাকের উপর মিথ্যা বলি না।[৭০]

এ হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম স্পষ্টভাবে এ কথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, 'তাঁর সব কাজ ও কথা অহীর ভিত্তিতে হয় না এবং তার সমস্ত কাজ ও কথা মানাও আবশ্যক নয়।' এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত পোষণ করার কোন অবকাশ নেই। কারণ, এতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাথেই দ্বিমত পোষণ করা হবে। (نعوذ بالله من ذلك)

৩. রসম-রেওয়াজ তথা প্রথাগত সুন্নাত (السنة الرسمية) এর উদাহরণ

عن أبي حازم، قال: سئل سهل بن سعد–وأنا أسمع–، بأى شئ دووى جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما بقى أحد أعلم به منى، كان علىّ يأتى بالماء فى ترسه، وفاطمة تغسل عنه الدم، وأحرق له حصير؛ فحشى به جرحه.[৭১]

অর্থ- হযরত আবূ হাযিম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, হযরত সাহল বিন সা'আদ কে জিজ্ঞাসা করা হল -যা আমি শুনছিলাম- যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ক্ষতস্থানের চিকিৎসা কী দিয়ে করা হয়েছিল? উত্তরে তিনি বললেন, এ ব্যাপারে আমার চেয়ে বেশি জ্ঞাত কেউ নেই। হযরত আলী (রাযি.) ঢালে করে পানি নিয়ে আসেন এবং হযরত ফাতেমা (রাযি.) ঐ পানি দিয়ে রক্ত ধুয়ে ফেলেন। আর ক্ষতস্থান চাটাই পুড়িয়ে ছাই দিয়ে ভরে দেন।[৭২]

এ চিকিৎসার ভিত্তি অহী ছিলনা বরং ঐ যুগের প্রথা ও প্রচলনের উপর ছিল।

---

৭০ প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৬০৮২

71 رواه الترمذى فى الطب، باب التداوى بالرماد، ٢: ٢٨–٢٩، رقم الحديث: ٢٠٨٥، وقال: هذا حديث حسن صحيح .

৭২ তিরমিযী, খ. ২, পৃ. ২৮-২৯, হাদীস নং ২০৮৫

৪. প্রয়োজনীয় সুন্নাত (السنة الضرورية) এর উদাহরণ

عن أبي هريرة –رضي الله تعالى عنه–، قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه، فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لايدرى ما خلفه عليه إلخ .[৭৩]

অর্থ- হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ যখন তোমাদের কেউ ঘুমাতে যায় তখন সে যেন লুঙ্গির ভিতরের খোলা অংশ (ইত্যাদি) দিয়ে বিছানাপত্র ঝেড়ে নেয়। কেননা সে জানেনা তার অবর্তমানে বিছানায় কী লুকিয়ে রয়েছে।[৭৪]

অর্থাৎ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম প্রয়োজনের তাগিদে বিছানা ঝাড়ার কথা বলেছেন। কেননা অন্ধকারে বিছানায় সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদি কষ্টদায়ক প্রাণী থাকতে পারে; অন্তত ধূলিকণা তো থাকবেই। কারণ, তাদের আবাসস্থল ছিল আরবের পাথুরে এলাকা, আর পাথরের ফাঁকে ও চিপায় অনেক সাপ-বিচ্ছু থাকে এবং ঐ এলাকা ছিল মরু ও ধুলা-বালির এলাকা, সেখানে বাতাসও প্রবাহিত হয় প্রবল বেগে। তাই ধুলা-বালি তো থাকবেই, সাপ-বিচ্ছু থাকারও আশংকা অনেক বেশি। সুতরাং যদি কোথাও কোন সংরক্ষিত ঘরে সাপ-বিচ্ছু ধুলা-বালি ইত্যাদি কষ্টদায়ক কোন কিছু বিছানায় না থাকায় ঝাড়ার প্রয়োজন না হয় সেখানে বিছানা ঝাড়ার হুকুম বাকী থাকবে না, রহিত হয়ে যাবে। এ হাদীসের "**فإنه لايدرى ماخلفه عليه**" দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বিছানা ঝাড়া কোন ইবাদত নয়; প্রয়োজনের তাগিদেই ঝাড়ার কথা বলা হয়েছে।

عن أنس –رضي الله تعالى عنه–، يقول: أقام النبى صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينه ثلاثة ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، وما

---

73 رواه البخارى فى الدعوات، فى باب بغير ترجمة، ٢: ٩٣٥، رقم الحديث: ٦٣٢٠ .

৭৪ বুখারী, খ. ২, পৃ. ৯৩৫, হাদীস নং ৬৩২০

كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالأنطاع، فبسطت فألقى عليها التمر والأقط والسمن، فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين.[٧٥]

وزاد فيه: ولاأكل على خوان قط، قيل لقتادة: فعلى ماكانوا يأكلون؟ قال: على السفر.[٧٦]

অর্থ- হযরত আনাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম খায়বার এবং মদীনার মাঝে তিন রাত অবস্থান করেছিলেন। যখন হযরত সাফিয়্যা (রাযি.) এর সাথে বাসর হয়েছিল ঐ সময় আমি মুসলমানদেরকে ওলীমার দাওয়াত করি। উক্ত ওলীমায় গোস্ত-রুটির কোন ব্যবস্থা ছিল না। হযরত বেলাল (রাযি.)কে চামড়ার বিছানা (দস্তরখান) বিছানোর নির্দেশ দেয়া হলে তিনি বিছানা (দস্তরখান) বিছালেন। অতঃপর এর উপর খেজুর, পনির ও ঘি পরিবেশন করা হয়। (এর দ্বারাই ওলীমার মেহমানদারী সম্পাদন করা হয়)। তখন মুসলমানরা বলাবলি করছিল যে, একজন উম্মুল মুমিনের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর বিবাহের ওলীমা হচ্ছে।[৭৭]

একটু বিস্তারিতভাবে পরবর্তী অধ্যায়ে আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কখনো পায়া বিশিষ্ট উঁচু কোন বস্তুর উপর খাবার রেখে খেতেন না। হযরত কাতাদাহকে জিজ্ঞেস করা হয়; তাহলে তাঁরা কিসের উপর খাবার রেখে খেতেন? উত্তরে তিনি বললেনঃ দস্তরখানের উপর।[৭৮]

হাদীসদ্বয়ে দস্তরখানের উপর খাবার রেখে খাওয়া প্রয়োজনে ছিল। অতএব যে, সকল খাবারের জন্য দস্তরখানের প্রয়োজন পড়ে না যেমন, ছোট-খাট কোনো খাবার; বিস্কুট, পান ও ছোট ফল ইত্যাদি, সেখানে দস্ত

---

75 رواه البخاري فى المغازي ، باب غزوة خيبر، ٢: ٦٠٦، رقم الحديث: ٤٢١٣

76 رواه البخارى فى الأطعمة، باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والـــسفرة، ٢: ٨١١، رقم الحديث: ٥٣٨٦ .

৭৭ বুখারী, খ. ২, পৃ. ৬০৬, হাদীস নং ৪২১৩

৭৮ বুখারী, খ. ২, পৃ. ৮১১, হাদীস নং ৫৩৮৬

রখান বিছানোর কোন অর্থ হয় না। কারণ, হাদীসে দস্তরখান ব্যবহারের কথা ইবাদত ও ছাওয়াবের কাজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। বরং প্রয়োজনের তাগিদে করা হয়েছে।

দস্তরখান সংক্রান্ত কয়েকটি মাসআলা

১. খানা যে বস্তুর উপর রেখে খাওয়া হয় তাকেই দস্তরখান বলে। সুতরাং আমরা যে পাত্রে খানা খাই, এ পাত্রই দস্তরখান। আমাদের দেশে এ পাত্রের নিচে যে কাপড়, চামড়া বা প্লাষ্টিক বিছানো হয় তা বাস্তবে দস্তরখান নয়। কারণ, এগুলোর উপরতো খানা রাখা হয় না। বরং খাবারের পাত্র রাখা হয়। হ্যাঁ সরাসরি এগুলোর উপর খানা রেখে খেলে তখন এগুলোকেও দস্তরখান বলা হবে।

হাদীসে আছেঃ

عن أنس –رضي الله تعالى عنه–، قال: ما علمت النبى صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط، ولا خبز له مرقق قط، ولا أكل على خوان قط، قيل لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على السفر.[৭৯]

অর্থ- হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, আমার জানা নেই যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কখনও পায়া বিশিষ্ট কোন উঁচু পাত্রে আহার করেছেন কি না ও তাঁর জন্য কখনো চাপাতি রুটি তৈরী করা হয়েছে এবং এমন পাত্রে আহার করেছেন কি না যে পাত্রে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ঘর বানানো রয়েছে যার মধ্যে হজমশক্তি বা রুচি বৃদ্ধিকারক কোনো বস্তু রাখা যায়। হযরত কাতাদাহ্ (রাযি.) কে জিজ্ঞেস করা হল, তবে তাঁরা

---

79 رواه البخارى فى الأطعمة، باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة، ٢: ٨١١، رقم الحديث: ٥٣٨٦، وفى الرقاق، باب فضل الفقر، ٢: ٩٥٥، رقم الحديث: ٦٤٥٠، واللفظ له، والترمذى فى الأطعمة، باب ما جاء على ما كان يأكل النبى صلى الله عليه وسلم، ٢: ٣٧٧، رقم الحديث: ١٧٨٩

কিসের উপর খাবার রেখে খেতেন? তিনি বললেন, ‘সুফরা’র (দস্তরখানের) উপর।[৮০]

সহীহ বুখারীর বিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থদ্বয় ‘ফাতহুল বারী ও উমদাতুল ক্বারী’তে উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় উল্লেখ রয়েছেঃ

’السفر‘جمع ’سفرة‘ ... أن أصلها الطعام الذى يتخذه المسافر، وأكثر ما يصنع فى جلد، فنقل اسم الطعام إلى ما يوضع فيه.[٨١]

অর্থ- মুসাফির সাথে নেয়ার জন্য যে খাবার তৈরী করে তাকে ‘সুফরা’ বলা হয়। অধিকাংশ সময় এ খাবার কোন চামড়ায় রাখা হতো। পরবর্তীতে ঐ খাবারের নামে (যে বস্তুর মধ্যে খাবার রাখা হতো) ঐ বস্তুর নামকরণ করা হয়, অর্থাৎ ঐ বস্তুকেই ‘সুফরা’ তথা দস্তরখান বলার প্রচলন শুরু হয়।[৮২]

মিশকাত শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘মিরকাত’এ আছেঃ

فى النهاية: السفرة: الطعام يتخذه المسافر، وأكثر ما يحمل فى جلد مستدير، فنقل اسم الطعام إلى الجلد، وسمى به ... ثم اشتهرت لما يوضع عليه الطعام جلدا كان أو غيره.[٨٣]

অর্থ- নিহায়া নামক কিতাবে আছেঃ ‘সুফরা’ (দস্তরখান) ঐ খাবার কে বলা হয়, যা মুসাফির তৈরী করে। অধিকাংশ সময় এ খাবার গোলাকৃতির

---

৮০ বুখারী, খ. ২, পৃ. ৮১১, হাদীস নং ৫৩৮৬, ও খ. ২, পৃ. ৮১৫, হাদীস নং ৫৪১৫, ও খ. ২, পৃ. ৯৫৫, হাদীস নং ৬৪৫০, তিরমিযী, খ. ২, পৃ. ৩৭৭, হাদীস নং ১৭৮৯

81 فتح البارى، ١٠: ٦٦٨، لدار الفكر، بيروت، ومثله فى عمدة القارى، كتاب المناقب، باب بنيان الكعبة، ١٧: ٤٥

৮২ ফাতহুল বারী, খ. ১০, পৃ. ৬৬৮, উমদাতুল ক্বারী, খ. ১৭, পৃ. ৪৫

83 مرقاة المفاتيح ، كتاب الأطعمة ، ٨: ١٢ .

চামড়ায় রাখা হত, পরবর্তীতে খাবারের নামে ঐ চামড়ার নামকরণ করা হয়, যে চামড়ায় খাবার রাখা হয়... অতঃপর যে বস্তুর উপর খাবার রাখা হয় ঐ বস্তুই দস্তরখান নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। চাই ঐ বস্তু চামড়ার হোক বা অন্য কিছুর।[৮৪]

তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'আরিযাতুল আহ্ওয়াযী'তে আছেঃ

الأكل على الأرض من التواضع، ورفعه فى الموائد من التبيغر والترفه، والأكل على الأرض إفساد الطعام، فتوسط الحال بأن يكون على السفر، وهو كل مفروش يكشف عليه الطعام ليأكل إذا لم يكن مائعا أو متودكا متغمرا، فإن كان كذلك كانت له أسماء.[৮৫]

অর্থ- মাটিতে রেখে আহার করা নম্রতা। আর পায়া বিশিষ্ট কোন উঁচু পাত্রে রেখে আহার করা বিলাসিতা। কিন্তু মাটিতে খাবার রেখে খেতে গেলে তো খাবার নষ্ট হবে। অতএব, বাধ্য হয়ে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে হয়, আর তা এভাবেই সম্ভব যে, দস্তরখানের উপর খাবে। আর দস্তরখান ঐ সকল বিছানো বস্তুকে বলা হয়, যার উপর এমন খাবার রেখে আহার করা হয় যা প্রবাহিত নয়, তৈল জাতীয় পানীয়ও নয়। কেননা এমন হলে ঐ প্রবাহমান খাবারের উপযোগী যে ধরণের পাত্রে রাখা হবে পাত্রের ধরণ হিসেবে ঐ পাত্রের নামও ভিন্ন হবে।[৮৬]

বিখ্যাত প্রাচীন আরবী অভিধান 'লিসানুল আরব'এ দস্তরখানের সংজ্ঞা এভাবে বর্ণরা করা হয়েছেঃ

السفرة التى يؤكل عليها،سميت سفرة ، لأنها تبسط إذا أكل عليها . [৮৭]

---

৮৪ মিরকাত, খ. ৮, পৃ. ১২

85 عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي لابن العربي ، صدر كتاب الأطعمة ، ٧: ٢٠٧ .

৮৬ আরিযাতুল আহ্ওয়াযী শরহু সুনানিত তিরমিযী, খ. ৭, পৃ. ২০৭

87 لسان العرب ، ٤: ٣٦٩ .

অর্থ- 'সুফরা' (দস্তরখান) ঐ বস্তুকে বলা হয়, যার উপর আহার করা হয়। 'সুফরা' (দস্তরখান) এজন্যই বলা হয় যে, তার উপর খাওয়ার জন্য তাকে বিছানো হয়।[৮৮]

বিভিন্ন কিতাবের উপরোল্লেখিত বিস্তারিত আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যে পাত্রের উপর খাবার রেখে আহার করা হয় তাকেই 'দস্তরখান' বলে। অতএব, আমরা যে পাত্রে খাবার খাই এটাই 'দস্ত রখান'। খাবারের পাত্র যার উপর রাখা হয় তা 'দস্তরখান' নয়। আমাদের দেশে পাত্রের নিচে বিছানো চামড়া, প্লাষ্টিক ও কাপড়কে যে দস্তরখান বলা হয় তা আসলে দস্তরখান নয়। কেননা খাবার এগুলোর উপর রেখে খাওয়া হয় না বরং পাত্রের উপর রেখে খাওয়া হয় বিধায় ঐ পাত্রই দস্ত রখান। হ্যাঁ, সরাসরি এগুলোর উপর খাবার রেখে বা ঢেলে দিয়ে খেলে তখন এগুলোকেও দস্তরখান বলা যাবে।

২. দস্তরখান কাপড়ের হওয়া আবশ্যক নয়। খানা খাওয়ার উপযোগী যে কোন বস্তুর উপর খানা রেখে খেলেই এ প্রয়োজনীয় সুন্নাতটি আদায় হয়ে যাবে। চাই তা কাচের পাত্র হোক কিংবা মাটির বাসন, মেলামাইনের প্লেট হোক কিংবা কাসার বাটি বা অন্য কিছু।

৩. 'দস্তরখান লাল হওয়া সুন্নাত' এ কথাটি সঠিক নয়। এ ব্যাপারে যে হাদীসটি পেশ করা হয় তা মাউযূ, বানোয়াট ও জাল।

৪. দস্তরখানের উপর খানা খাওয়া সুন্নাতে হুদা তথা ইবাদতের বা ছাওয়াবের সুন্নাত নয়। বরং ইহা سنة ضرورية তথা প্রয়োজনীয় সুন্নাত। অতএব, যেখানে প্রয়োজন হবে না সেখানে 'দস্তরখান' বিছানো লাগবে না। যেমন- খেজুর, চকলেট, পান ও ছোট-খাট কোন বস্তু ইত্যাদি খাওয়ার সময়।

হাদীসে আছে,

عن أم المنذر–رضي الله تعالى عنها–، قالت : دخل عليَّ النبي صلى الله عليـــه و سلم ومعه عليٌّ ولنا دوال معلقة ، قالت : فجعل رسول الله صلى الله عليـــه و

---

৮৮ লিসানুল আরব, খ. ৪, পৃ. ৩৬৯

سلم يأكل و عليٌّ معه يأكل ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لعليٍّ مه! مه! يا عليُّ! فإنك ناقه إلخ . [৮৯]

অর্থ: হযরত উম্মুল মুনযির রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমার নিকট প্রবেশ করলেন। তাঁর সাথে হযরত আলী রাযি.ও ছিলেন। আমাদের ঘরে খেজুরের থোকা ঝুলানো ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তা থেকে খেতে লাগলেন, সাথে আলী রাযি.ও। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী রাযি. কে বললেন, হে আলী! খাওয়া বন্ধ কর। কেননা তুমি অসুস্থ।[৯০]

এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও হযরত আলী রাযি. খেজুরের ঝুলন্ত থোকা থেকে ছিড়ে ছিড়ে খেজুর খেয়েছেন। কিন্তু নিচে কোন কাপড় বিছাননি। কেন বিছাননি? প্রয়োজন ছিল না তাই বিছাননি।

হাদীসে আছে,

عن أنس–رضي الله تعالى عنه– : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث ، وقال : إذا ما وقعت لقمة أحدكم ، فليمط عنها الأذى ، وليأكلها ، ولا يدعها للشيطان ، وأمرنا أن نسلت الصحفة ، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة . [٩١]

---

89 رواه الترمذي في سننه في باب ما جاء فى الحمية ، ٢: ٢٣ ، رقم الحديث : ٢١٠٥ ، و قال: هذا حديث حسن غريب .

৯০ তিরিমযী, খ. ২, পৃ. ২২, হাদীস নং ২১০৫

91 أخرجه مسلم في صحيحه فى الأشربة ، باب استحباب لعق الأصابع ... و أكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى إلخ ، ٢: ١٧٦ ، رقم الحديث : ٢٠٣٤ ، و أبو داؤود فى الأطعمة ، باب فى اللقمة تسقط ، ٢: ٥٣٧ ، رقم الحديث : ٣٨٤٥ ،والترمذي

অর্থ: হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন কোন কিছু খেতেন তখন (যে তিন আঙ্গুল দিয়ে খাবার খেতেন সে) তিন আঙ্গুল লেহন করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, যখন তোমাদের কারোর লোকমা পড়ে যায় তখন এর থেকে ময়লা পরিস্কার করে খেয়ে নিবে। শয়তানের জন্য ছেড়ে দিবে না। তিনি আমাদেরকে আরো আদেশ করেছেন, আমরা যেন খারের পাত্র মুছে খাই এবং বলেছেন, নিশ্চয় তোমরা জাননা যে, তোমাদের খাবারের কোন অংশে বরকত রয়েছে।[৯২]

উক্ত হাদীসে লোকমা পড়ে গেলে তা পরিস্কার করে খেতে বলা হয়েছে, যদি কোন কিছু বিছানো থাকত তাহলে পরিস্কার করার কথা আসত না। বরং এ কথা বলা হত যে, লোকমা দস্তনখানে পড়ে গেলে তা সেখান থেকে তুলে খেয়ে নিবে। যখন পরিস্কার করার কথা বলেছেন তখন বুঝা গেল নিচে কিছু বিছানোর কথা নেই।

তথাপিও সর্বাবস্থায়ই প্লাস্টিক, চামড়া ও কাপড় ইত্যাদি বিছিয়ে তার উপর খাওয়া নিষেধ নয় এবং এতে দোষের কিছু নেই। বরং এতে খানার শান বজায় থাকবে। তাই বিছিয়ে নেয়া ভাল কিন্তু একে সুন্নাতে হুদা মনে করা ও এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করা উচিৎ নয়।

৫. উপকারী সুন্নাত (السنة الإفاديَّة) এর উদাহরণ

عن ابن عمر –رضي الله تعالى عنهما–، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر.[٩٣]

في الأطعمة ، باب ما جاء في اللقمة تسقط ، ٢: ٢ ، رقم الحديث : ١٨٠٣ ، وقال : هـــذا حديث حسن غريب صحيح .

৯২ সহীহ মুসলিম, খ. ২, পৃ. ১৭৬, হাদীস নং ২০৩৪, জামে তিরমিযী, খ. ২, পৃ. ২, হাদীস নং ১৮০৩, সুনানে আবূ দাউদ, খ. ২, পৃ. ৫৩৭, হাদীস নং ৩৮৪৫

93 رواه الترمذي في الشمائل، باب ماجاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ٢: ٥، وبهذا المضمون أخرج الحاكم في المستدرك، ٤: ٢٠٧، و ابن أبي شيبة في مصنفه، ٧: ٣٧٩،

অর্থ- হযরত ইবনে উমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ তোমরা ইছমুদ সুরমা[৯৪] ব্যবহার কর, কেননা এটা চোখের জ্যোতি বাড়ায় এবং ভ্রু বৃদ্ধি করে।[৯৫]

উক্ত হাদীসে সুরমা লাগানোর আদেশ উপকারের কারণে দেয়া হয়েছে; ছাওয়াবের কারণে নয়। হাদীসের অংশ ''فإنه يجلو البصر وينبت الشعر'' একথা প্রমাণ করে। এ হুকুম এ জন্য দেননি যে সুরমা ব্যবহার করা ইবাদত ও ছাওয়াবের কাজ।

একটি সংশয় ও তার নিরসন

বর্তমান ডাক্তারদের অভিমত হল, সুরমা চোখের জন্য ক্ষতিকর অথচ উক্ত হাদীস দ্বারা সুরমার উপকারিতা বুঝে আসে, এ ভাষ্যদ্বয়ের মাঝে পরিলক্ষিত সংঘাতের সমাধান কি?

উত্তরঃ উক্ত হাদীসটি অহীর ভিত্তিতে ছিল না, যা সর্ব যুগে সকলের জন্য প্রযোজ্য হবে, বরং তা ছিল উপকার পাওয়ার ভিত্তিতে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর যুগে তাঁর এলাকায় কিংবা তাঁর সমকালীন মানুষের কোন জিনিস ব্যবহারে উপকার পাওয়ার দ্বারা বর্তমান যুগে অন্য এলাকায় ও পরবর্তী মানুষের ঐ জিনিস ব্যবহারে উপকার পাওয়া আবশ্যক নয়। সুতরাং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর যুগে তাঁর এলাকার মানুষের ইছমুদ সুরমার মধ্যে উপকার

والبيهقي في سننه، ٤: ٢٦١ ، و أورده الهيثمي في المجمع ، ٥: ٩٦، والزبيدي في الإتحـــاف، ٦: ٤١١.

৯৪ ইছমুদ সুরমার বৈশিষ্ট হল, এ সুরমা লাল রঙের হয়, কিন্তু চোখে দেয়ার সাথে সাথে সম্পূর্ণ কালো হয়ে যায়।

৯৫ তিরমিযী, খ. ২, পৃ. ৫, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, খ. ৭, পৃ. ৩৭১, বায়হাকী, খ. ৪, পৃ. ২৬১, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, খ. ৫, পৃ. ৯৬

পাওয়ার দ্বারা বর্তমান যুগের মানুষের জন্য তার মধ্যে উপকার পাওয়া জরুরী নয়।

দ্বিতীয়তঃ ডাক্তারদের কথাটিও তো আর অহীর উপর ভিত্তি করে নয়, তারাও তো তাদের অভিজ্ঞতার আলোকেই বলছেন। তাই তাদের কথাটিও যে বাস্তব ভিত্তিক হবে তাও জরুরী নয়। হতে পারে তাদের কথাটিই অবাস্তব। আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কথাটিই বাস্তব। আর এমন হওয়াটাই অধিক যুক্তি সংগত।

৬. অভ্যাসগত সুন্নাত (السنة العادية) এর উদাহরণ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নানা ধরণের পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করেছেন। এগুলো তাঁর অভ্যাসগত ছিল, এমন নয় যে, তিনি যে ধরণের পোশাক পরিধান করেছেন সে ধরণের পোশাক পরিধান করা ইবাদত ও ছাওয়াবের কাজ ছিল। যেমন- লম্বা-ঢিলেঢালা জুব্বা, পাগড়ী ও লুঙ্গি পরিধান, বসা, শোয়া, দাঁড়ানোর ধরণ, পানাহারের পদ্ধতি ইত্যাদি ইবাদত হিসেবে ছিল না। বরং এগুলো মানবিক তাগিদে ও তাঁর অভ্যাস হিসেবে ছিল।

আত তাশরীউল জিনায়ী আল ইসলামীতে (খ. ১, পৃ. ১৭৭-১৭৮) উল্লেখ রয়েছে:

أفعال الرسول وأقواله على أنواع: فمنها ما صدر منه باعتباره بشراً؛ كالقيام والقعود والأكل والشرب، ومثل هذه الأفعال لا تعتبر تشريعاً؛ لأنها صدرت عن الرسول بمقتضى بشريته وليست جزءاً من رسالته . إلخ .[৯৬]

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর কাজ-কর্ম ও কথা-বার্তা কয়েক ভাগে বিভক্ত: তন্মধ্য হতে কিছু কাজ-কর্ম এমন যে গুলো

---

96 التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي ، لعبد القادرعوده (المتوفى : ١٣٧٣هـ) ، القسم الثالث في التعزير على المخالفات ، عنوان: رقم: ١٢٨ ، هل تعتبر كل أفعال الرسول وأقواله تشريعاً؟ ، ١: ١٧٧–١٧٨ .

তিনি মানুষ হিসেবে করেছেন। যেমন, উঠা-বসা, পানাহার ইত্যাদি। এসব কাজ-কর্ম শরীআত হিসেবে গণ্য হবে না। কারণ, তিনি এগুলো মানবিক তাগিদে করেছেন, রিসালাতের অংশ হিসেবে নয়।

এ জন্যই তো তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ সব সময় এক ধরণের ছিল না। যখন যেমন পেয়েছেন তখন তেমন পরিধান করেছেন এবং বিশেষ কোন ধরণের পোশাক পরার জন্য উম্মতকে নির্দেশও দেননি। বরং যার যে ধরণের পোশাক পরিধান করতে সুবিধা হয় এবং যে পোশাকে আরাম পায় সে পোশাক ব্যবহারে কখনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেননি। চাই তা লুঙ্গি হোক বা পায়জামা কিংবা চাদর, গোলজামা হোক বা ফাড়া জামা, কল্লিদার হোক বা এক ছাটা, লম্বা হোক বা খাটো। বিপরীত লিঙ্গ তথা পুরুষ মহিলার সাদৃশ্য ও মহিলা পুরুষের সাদৃশ্য বেশ-ভূষা গ্রহণ না করলে, বিজাতির বেশ-ভূষা তাদের সাদৃশ্যের উদ্দেশ্যে না হলে এবং অহংকার-অপব্যয় না হলে এতে কোন অসুবিধা নেই।

ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ এর মাকরূহাতে সালাত অধ্যায় (খ. ৪, পৃ. ১০২) এ হযরত মুফতী আযীযুর রহমান (রহ.) উল্লেখ করেনঃ

لباس اور ٹوپی میں کوئی خاص طریق اور وضع مأمور بہ نہیں ہے بلکہ جب جس ملک کی عادت
اور رواج ہو اس کے موافق لباس اور ٹوپی وغیرہ پہننا درست ہے۔ حدیث شریف میں ہے:
كلوا ما شئتم و البسوا ما شئتم (الحديث) یعنی جو چاہو کھاؤ اور جو چاہو پہنو، مگر حرام سے
بچو اور تکبر و اسراف نہ کرو۔ فقط

অর্থ- "পোশাক ও টুপীর ক্ষেত্রে ইসলামী শরীআতে কোন বিশেষ নিয়ম ও পদ্ধতির বাধ্য-বাধকতা নেই। বরং যে দেশে যেমন রীতি-নীতি ও প্রচলন সে দেশে সে অনুপাতেই পোশাক ও টুপী ইত্যাদি পরিধান করা জায়েয আছে। হাদীস শরীফে আছেঃ যা চাও খাও, যা চাও পরিধান কর, কিন্তু হারাম থেকে বেঁচে থাক এবং অহংকার ও অপব্যয় পরিহার কর।"

এর কারণ এটাই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম জামা, টুপী, পাগড়ী, লুঙ্গী ইত্যাদি অভ্যাসগত কারণে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের ব্যবহার করেছেন। সব সময় এক রকম ব্যবহার করেননি।

‘নূরুল আনওয়ার’ ও ‘রদ্দুল মুহতার’ ইত্যাদি কিতাবে আছেঃ

والثاني: الزائد، وتاركها لايستوجب إساءة، كسير النبي صلى الله عليه وسلم في لباسه وقعوده وقيامه، فإن هولاء كلها لاتصدر منه على وجه العبادة و قصد القربة، بل على سبيل العادة .[৯৭]

অর্থ- দ্বিতীয় প্রকার সুন্নাতে যায়িদা[৯৮]: এ সুন্নাত ছেড়ে দেয়া দোষণীয় নয়। যেমন- নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পোশাক, উঠা-বসা ইত্যাদি অভ্যাসগত কাজ। কেননা এগুলো তিনি ইবাদত হিসেবে ছাওয়াবের নিয়্যাতে করেননি বরং অভ্যাস হিসেবে করেছেন।[৯৯]

তবে পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে এতটুকু লক্ষণীয় যে, যাতে মুসলমানের পোশাক কোন বিপরীত লিঙ্গ, বিজাতীয় ও ফাসেক-ফুজ্জারদের পোশাকের সাথে সাদৃশ্য না হয়। কেননা তাদের সাদৃশ্যপূর্ণ পোশাক পরিধান করা জায়েয নেই। আর পোশাকের ক্ষেত্রে সতর ঢাকার সাথে সাথে ইজ্জত-আবরু ও গাম্ভীর্য বজায় থাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখা

---

৯৭ نورالأنوار، مبحث الأحكام المشروعة، فصل المشروعات، ص: ١٦٧ .

98 এ সুন্নাতকে শরহে বিকায়া [আস-সিআয়া সংলগ্ন], খ. ১, পৃ. ১৭২-১৭৩ ও রদ্দুল মুহতার, খ. ১, পৃ. ২১৮-২১৯ এ উযূর সুন্নাতের আলোচনায় ও কিতাবুস সাওম এর শুরুতে খ. ৩, পৃ. ৩৩৫ এর মধ্যেও সুন্নাতে যায়িদা বলা হয়েছে। কিন্তু এখানে তার পদস্খলন ঘটেছে। কারণ, সুন্নাতে যায়িদা বাস্তবে সুন্নাতে হুদার প্রকার (قسم), সুন্নাতে গায়রে হুদার নয়। হ্যাঁ, কেহ যদি সুন্নাতে যায়িদা বলে সুন্নাতে গায়রে হুদা বুঝাতে চায় তাহলে এতে দোষের কিছু নেই, কারণ لا مشاحة فى الاصطلاح অর্থাৎ পরিভাষার মাঝে কোন সংঘাত নেই। যাইহোক, এখানে সুন্নাতে যায়িদা দ্বারা সুন্নাতে গায়রে হুদাই উদ্দেশ্য।

৯৯ নূরুল আনওয়ার, পৃ. ১৬৭

চাই। টুপী অমুক ধরণের হতে হবে, জামা গোল হতে হবে কিংবা নিছ্‌ফে সাক্‌ (نصف ساق) তথা অর্ধ নলা-লম্বিত হতে হবে, কানি কাটা হতে পারবে না এ ধরণের বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি করা আদৌ উচিত নয়।

একটি ভ্রান্তির নিরসন

হযরত মিয়া আসগার হোসাইন রহ. এর লিখিত "গোলযারে সুন্নাত" এ লেখা আছে, "কানি ফাড়া জামা যতই লম্বা হোক এতে সুন্নাত আদায় হবে না।"

স্মর্তব্য যে, এ কথাটা কিতাবের মূল লেখক মিয়া আসগার হোসাইন রহ. এর নয়। কিতাবটিতে বাংলাদেশের হযরত মাও. মুফতী ইযহার সাহেব কিছু সংযোজন করেছেন। উক্ত কথাটি তার সংযোজিত। মিয়া আসগার হোসাইন রহ. নিজেও কানি ফাড়া জামা গায়ে দিতেন। এমন কি আমাদের দেওবন্দী আকাবিরের মধ্যে হযরত মাও. ইবরাহীম বলইয়াভী রহ. ও সাঈদ আহমাদ পালনপূরী দা. বা. ব্যতীত হযরত মাও. রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. থেকে নিয়ে হযরত মাও. ক্বারী তায়্যিব সাহেব রহ. পর্যন্ত হযরত থানভী রহ. ও মাদানী রহ. সহ সকলেই কানি ফাড়া জামা পরিধান করতেন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সহীহ বুঝ দান করুন। আমীন!

সুন্নাতে আদিয়ায় কি ছাওয়াব হয়?

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর অভ্যাসগত সুন্নাতগুলো যদিও শরিআত ও ইবাদত হিসেবে নয় এবং এগুলো প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাঁকে পাঠানোও হয়নি। তথাপি তাঁর অভ্যাস থেকে উত্তম অভ্যাস আর কোথায় পাওয়া যাবে? তাইতো আল্লাহ রাব্বুল আলামীন "وإنك لعلى خلق عظيم" "অবশ্যই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী"[১০০] বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ হিসেবে তার

১০০ সূরা কলম, আয়াত: ৪

অভ্যাসগত সুন্নাতগুলোর উপরও আমল করা তাঁর সাথে মহব্বত, ভালবাসা এবং তাঁর প্রকৃত উম্মত হওয়ার দাবি রাখে।

সুতরাং মুসলমানগণ ঐ সব পোশাক-পরিচ্ছদ ও চরিত্রাবলী অবলম্বন করবে যা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর সাথে ভালবাসা প্রকাশের ও সাদৃশ্যের নিয়্যাতে এর উপর আমল করলে ছাওয়াব পাওয়া যাবে। ইন্‌শাআল্লাহ। তথাপি, একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, সুন্নাতে হুদা ও সুন্নাতে আদিয়া তথা অভ্যাসগত সুন্নাত কখনও সমমানের নয়। দু'টির মধ্যে বহু তফাত রয়েছে। সুন্নাতে হুদা (بذاته) স্বয়ং ইবাদত আর সুন্নাতে গাইরে হুদা (بذاته) স্বয়ং ইবাদত নয়, আর অভ্যাসগত সুন্নাত তারই একটি প্রকার। অতএব, এ সুন্নাত নিয়ে বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন করা মোটেও উচিত হবে না।

মাথায় বাবড়ী চুল রাখা

অনুরূপভাবে মাথায় লিম্মা, জুম্মা, অফরা তথা কানের লতি থেকে লম্বা, কানের লতি পর্যন্ত লম্বা ও কানের মধ্যখান পর্যন্ত লম্বা চুল রাখা সুন্নাতে আদিয়ার অন্তর্ভুক্ত। যেমন, মুনতাখাবাতে নিযামুল ফাতাওয়া (খ. ১, পৃ. ৩৫৪) এ আছেঃ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول بال رکھنے کا تھا، وہ حکم شرعی کی وجہ سے اور سنن ہدی کے طور پر نہیں تھا۔

অর্থ- হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যে নিয়মে চুল রাখতেন তা শরীআতের হুকুম এবং সুন্নাতে হুদা হিসেবে ছিল না।[১০১]

৭. আনন্দদায়ক তথা অন্যকে খুশি করার সুন্নাত (السنة التفريحية) এর উদাহরণ

عن عروة بن الزبير، أن عائشة –رضي الله تعالى عنها– قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً على باب حجرتي، والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه، أنظر إلى لعبهم.[١٠٢]

---

১০১ মুনতাখাবাতে নিযামুল ফাতাওয়া, খ. ১, পৃ. ৩৫৪

অর্থ- হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণিত, হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন- "একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে দেখি তিনি আমার কামরার দরজায়, তখন কিছু সুদানী সৈনিক মসজিদের ভিতর ট্রেনিং করছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর চাদর দ্বারা আমাকে পর্দার ব্যবস্থা করছিলেন আর আমি তাদের ট্রেনিং দেখছিলাম।"[১০৩]

উক্ত হাদীসে হযরত আয়েশাকে (রাযি.) সমর-কসরত, যুদ্ধের ট্রেনিং দেখার ব্যবস্থা করে দেয়া ইবাদত হিসেবে ছিল না যে, মহিলাদের জন্য যুদ্ধের ট্রেনিং দেখা ইবাদত, বরং তাকে খুশী করার লক্ষ্যে ছিল।

অন্যকে খুশি করার আরেকটি উদাহরণঃ

عن المقدام بن معديكرب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحبّ أحدكم أخاه، فليعلمه إيّاه.[١٠٤]

অর্থ- হযরত মিকদাম বিন মা'দীকারাব বলেনঃ হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ তোমাদের কেউ যখন অপর কোন ভাইকে ভালবাসে তখন এ ভালবাসা সম্পর্কে তাকে জানিয়ে দেয়া চাই। (কেননা এতে উভয় পক্ষের অন্তর খুশী হয়।)[১০৫]

---

১০২ رواه البخاري في الصلاة ، باب أصحاب الحراب في المسجد ، ١: ٦٥ ، رقم الحديث: ٤٥٤ و ٤٥٥ ، و في مواضع شتى .

১০৩ বুখারী, খ. ১, পৃ. ৬৫, হাদীস নং ৪৫৪ ও ৪৫৫

১০৪ رواه أبوداؤد في الأدب، باب إخبار الرجل الرجل بمحبته إليه، ٢: ٦٩٨، رقم الحديث: ٥١٢٤، والترمذى في الزهد، باب ما جاء في إعلام الحب، ٢: ٦٥، رقم الحديث: ٢٣٩٣، و قال: حديث المقدام حديث حسن صحيح غريب، واللفظ له، ورواه الحاكم في المستدرك، ٤: ١٧١، وأورده الذهبي في التلخيص، وسكت عنه .

১০৫ সুনানে আবূ দাউদ, খ.২, পৃ. ৬৯৮, হাদীস নং ৫১২৪, সুনানে তিরমিযী, খ. ২, পৃ. ৬৫, হাদীস নং ২৩৯৩

৮. সতর্কতামূলক সুন্নাত (السنة الاحترازية) এর উদাহরণ

عن أبي أمامة –رضي الله تعالى عنه–، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخفيه يلبسهما، فلبس أحدهما، ثم جاء غراب واحتمل الأخرى، فرمى بها، فخرجت منها حية، وقال النبى صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلايلبس خفيه حتى ينفضهما.[١٠٦]

অর্থ- হযরত আবূ উমামা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একদিন পরিধান করার জন্য তার মোজা দু'টি আনতে বললেন। অতঃপর একটি মোজা পরিধান করার পর দেখেন দ্বিতীয় মোজাটি একটি কাক নিয়ে উপর থেকে ফেলে দেয় ও তার ভিতর হতে একটি সাপ বেরিয়ে আসে। এ দেখে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন মোজা ঝাড়া ব্যতীত পরিধান না করে।[১০৭]

---

106 أورده الهيثمى فى المجمع، فى اللباس، باب النهى عن لبس الخف قبل أن ينفضها، ٥: ٢٤٧، رقم الحديث:٨٦٣٥، عن الطبرانى، وقال: وفيه هاشم بن عمرو، ولم أعرفه إلا أن ابن حبان ذكر فى الثقات هاشم بن عمرو فى طبقته، والظاهر أنه هو، إلا أنه لم يذكر روايته عن إسماعيل بن عياش، وشيخ إسماعيل فى هذا الحديث شامى، فرواته ثقات، وهو صحيح –إن شاء الله–، انتهى ما قاله الهيثمى. ورواه الطبرانى فى الكبير، ٨: ١٦٢، رقم الحديث: ٧٦٢٠، وليس فى إسناده هاشم بن عمرو، إنما هو فى الإسناد قبله، والراوى عن إسماعيل بن عياش فى هذا الإسناد: سعيد بن روح، ولم أجدله ترجمة، قاله عبدالله محمد الدرويش فى تخريجه على مجمع الزوائد، ٥: ٢٤٧، وأورده المتقى فى كنز العمال، ١٥: ٤١٠، رقم الحديث: ٤١٦١٢، والشامى فى سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد، الباب الرابع عشر فى خفيه ونعليه، ٧: ٣١٧، والزبيدى فى إتحاف السادة المتقين، ٦: ٤٢٣ .

১০৭ আল-মু'জামুল কাবীর লিত্ তবরানী, খ. ৮, পৃ. ১৬২, হাদীস নং ৭৬২০, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, খ. ৫, পৃ. ২৪৭, হাদীস নং ৮৬৩৫, কানযুল উম্মাল, খ. ১৫,

উক্ত হাদীসে মোজা ঝাড়ার আদেশ এ জন্য দেয়া হয়নি যে, মোজা ঝাড়া একটি ইবাদত, বরং সাপ প্রবেশের ঘটনার প্রেক্ষিতে সতর্কতামুলক এ আদেশ দেয়া হয়েছে।

৯. বাধ্য-বাধকতামূলক সুন্নাত (السنة الإجبارية) এর উদাহরণ

عن عائشة –رضي الله تعالى عنها–، قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم، وحشوه من ليف.[١٠٨]

অর্থ- হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর বিছানা ছিল চামড়ার এবং মধ্যখানে ছিল খেজুরের ডালের দু'পাশের আঁশ।[১০৯]

সে যুগে ঐ সব এলাকায় নরম বিছানা ও গদি বানানোর জন্য খেজুরের আঁশ ব্যতীত তুলা পাওয়া দুষ্কর ছিল বলে খেজুরের ডালের দু'পাশের আঁশ দ্বারা বিছানা নরম করার ব্যবস্থা করা হত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর বিছানাকে নরম করার লক্ষ্যে মধ্যখানে উক্ত আঁশ এ জন্য ব্যবহার করা হয়নি যে, গদি ও বিছানায় এ আঁশ ব্যবহার করা ইবাদত ও ছাওয়াবের কাজ, তুলা ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে না বরং তুলা জাতীয় অন্য কিছু না পেয়ে বাধ্য হয়ে এ আঁশ ব্যবহার করা হয়েছে।

১০. কাহিনীমূলক সুন্নাত (السنة القصصية) এর উদাহরণ

হাদীসে উম্মে যার্‌য়া' (حديث أم زرع) ও হাদীসে খুরাফা (حديث خرافة) বা কল্পকাহিনী মূলক একাধিক হাদীস শামাইলে তিরমিযী ও হাদীসের

পৃ. ৪১০, হাদীস নং ৪১৬১২, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, খ. ৭. পৃ. ৩১৭, ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন, খ. ৬, পৃ. ৪২৩

১০৮ رواه البخارى فى الرقاق، باب كيف كان عيش النبى صلى الله عليه وسلم؟ إلخ . ٢: ٩٥٦، رقم الحديث: ٦٤٥٦، فتح الباري، ١٣: ٦٨ .

১০৯ বুখারী, খ. ২, পৃ. ৯৫৬, হাদীস নং ৬৪৫৬, ফাতহুল বারী, খ. ১৩, পৃ. ৬৮

অন্যান্য কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। আলোচনা অধিক দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার আশংকায় এখানে ঐগুলোর মূল বর্ণনা ও অনুবাদ উল্লেখ করা হলো না। এ গল্পগুলো এ জন্য বলা হয়নি যে, এগুলো বলা ইবাদত, বরং কেচ্ছা ও গল্প হিসেবেই বলা হয়েছিল।

১১. শ্রুতিগত সুন্নাত তথা পূর্বপুরুষ ও দেশ-বিদেশ থেকে আগত ব্যক্তিদের কথার উপর ভিত্তি করে যা বলেছেন (السنة السماعية) এর উদাহরণ

عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: الكمأة من المن ومائها شفاء للعين.[١١٠]

অর্থ- হযরত সাঈদ (রাযি.) বলেন, আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, মাশরুম (মান্না-সালওয়ার ন্যায় আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে) একটি দান এবং এর পানি চোখের জন্য উপকারী ওষুধ।[১১১]

মাশরুম এর পানি দ্বারা চোখের চিকিৎসার বিষয়টি শোনার উপরেই ভিত্তি ছিল।

---

১১০ أخرجه البخارى فى تفسير سورة البقرة، باب قول الله تعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، ٢: ٦٤٣، رقم الحديث: ٤٤٧٨، وفى تفسير سورة الأعراف، باب المن والسلوى، رقم الحديث: ٤٦٣٩، وفى الطب، باب المن شفاء للعين، رقم الحديث: ٥٧٠٨، ومسلم فى الأطعمة، باب فضل الكمأة ومداواة العين بها، ٢: ١٨١، رقم الحديث: ٥٣٠١-٥٣٠٧، والترمذى فى الطب، باب الكمأة والعجوة، ٢: ٢٧، رقم الحديث: ٢٠٦٧، وإبن ماجة فى الطب، باب الكمأة والعجوة، ص: ٢٤٦، رقم الحديث: ٣٤٩٨، واللفظ لمسلم.

১১১ বুখারী, খ. ২, পৃ. ৬৪৩, হাদীস নং ৪৪৭৮ ও ৪৬৩৯, খ. ২, পৃ. ১৮১, হাদীস নং ৫৩০১-৫৩০৭, তিরমিযী, খ. ২, পৃ. ২৭, হাদীস নং ২০৬৭, ইবনে মাজা, পৃ. ২৪৬, হাদীস নং ৩৪৯৮

حدثنا حشام بن عروة، قال: كان عروة يقول لعائشة –رضي الله تعالى عنها–: يا أماه! لا أعجب من فقهك، وأقول زوجة نبي الله وابنة أبي بكر، ولاأعجب من علمك بالشعر وأيام الناس، أقول ابنة أبي بكر، وكان أعلم الناس، ولكن أعجب من علمك بالطب، فكيف هو ومن أين هو؟ أو ماهو؟ قال: فضربت على منكبه، وقالت: أى عرية! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسقم عند آخر عمره، أوفي آخر عمره، وكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه، فتنعت له الأنعات، وكنت أعالجها له فمن ثم .[112]

অর্থ- হিশাম ইবনে উর্ওয়া বর্ণনা করেন, একদা হযরত উর্ওয়া হযরত আয়েশাকে (রাযি.) বললেনঃ মা! দ্বীন সম্পর্কীয় আপনার অসাধারণ জ্ঞান কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়, কেননা আপনি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী ও হযরত আবূ বকর (রাযি.) এর মেয়ে, তেমনি ভাবে কাব্য ও ইতিহাস সম্পর্কে আপনার অসাধারণ জ্ঞানও আশ্চর্যের বিষয় নয়, কেননা আপনি হযরত আবূ বকর (রাযি.) এর মেয়ে, যিনি আরবের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। তবে চিকিৎসা সম্পর্কে আপনার জ্ঞান আমাকে আশ্চর্যান্বিত করে ফেলে। আপনি এ জ্ঞান কোত্থেকে এবং কিভাবে অর্জন করেছেন? হযরত হিশাম বলেনঃ অতঃপর হযরত আয়েশা হযরত উরওয়ার কাঁধে হাত মেরে বললেনঃ হে স্নেহাস্পদ উর্ওয়া! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন শেষ জীবনে অসুস্থ হয়ে পড়তেন তখন আরব বিশ্বের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রতিনিধি দল আসত ও তাঁকে বিভিন্ন ধরণের চিকিৎসার পরামর্শ দিত। আর আমি

---

112 رواه أحمد في مسنده، رقم الحديث: ٢٤٤٣٤، وأورده الهيثمي في المجمع في المناقب، باب جامع فيما بقي من فضلها –رضى الله تعالى عنها–، ٩: ٣٨٨، رقم الحديث: ١٠٣١٥ عنه، وعن البزار، وعن الطبراني في الكبير، ٢٣: ١٨٢ .

সে অনুযায়ী তাঁর চিকিৎসা করতাম। চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে আমার জ্ঞান এভাবে অর্জিত হয়।[১১৩]

এখান থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হাদীসে বর্ণিত অনেক কথা ও কাজের ভিত্তি শুনার উপর ছিল।

১২. সাময়িক সুন্নাত (السنة الوقتية) এর উদাহরণ

যখন মুসলমানদের দুশমনরা ব্যাপক আকারে মদীনার মুসলমানদের উপর আক্রমণের উদ্যোগ নেয়, তখন হযরত সালমান (রাযি.) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলেছিলেন যে, পারস্যে থাকাকালীন আমরা যখন অবরুদ্ধ হতাম তখন আমরা খন্দক তথা পরিখা খনন করতাম। এরপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মদীনার এক পাশে খন্দক[১১৪] খনন করার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন এবং তিনি নিজেও এ কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[১১৫]

উক্ত যুদ্ধে খন্দক এ জন্য খনন করা হয়নি যে, যুদ্ধে খন্দক খনন করা সুন্নাত কিংবা ইবাদত। বরং এজন্যই খনন করা হয়েছিল যে, তা ঐ সময়ের দাবী ছিল মাত্র। তাই এ খন্দক খননকে সাময়িক সুন্নাত বলা যাবে, দায়েমী সুন্নাত নয়।

অতএব, সকল যুদ্ধে প্রয়োজন ব্যতিরেকে খন্দক খনন করা সুন্নাত হবে না।

---

১১৩ মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৪৪৪৩৪, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, খ. ৯, পৃ. ৩৮৮, হাদীস নং ১০৩১৫ । তারিখে ইসলাম, আকবার শাহ খান নাজীব আবাদী, খ. ১, পৃ. ১৮০

১১৪ উক্ত খন্দক বা পরিখার দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ছয় কিলোমিটার, প্রস্থ ছিল পাঁচ গজ আর গভীরতা ছিল পাঁচ গজ।

১১৫ ফাতহুল বারী, খ. ৮, পৃ. ১৪৮

১৩. রসিকতামূলক সুন্নাত (السنة المزاحية) এর উদাহরণ

عن أنس بن مالك –رضي الله تعالى عنه–، أن رجلا من أهل البادية، كان اسمه زاهرا ... وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما، فأتاه النبى صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، واحتضنه من خلفه ولايبصره ، فقال من هذا؟ أرسلنى، فالتفت، فعرف النبى صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يالو ما ألصق ظهره بصدر النبى صلى الله عليه وسلم حين عرفه، فجعل النبى صلى الله عليه وسلم يقول: من يشترى هذا العبد؟ فقال الرجل: يارسول الله! إذا والله تجدنى كاسداً . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، أو: أنت عند الله غال .[١١٦]

অর্থ- হযরত আনাস বিন মালিক (রাযি.) থেকে বর্ণিত, যাহির নামক এক গ্রাম্য ব্যক্তি ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাকে মুহাব্বাত করতেন, সে দেখতে ছিল কুৎসিত। একদিন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তার কাছে আসলেন, তখন সে তার পণ্য সামগ্রী বিক্রি করছিল। ইত্যবসরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তার পিছন থেকে এসে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে তার চক্ষুদ্বয় চেপে ধরলেন। যাতে সে তাঁকে দেখতে পেয়ে চিনতে না পারে। সে বলে উঠলঃ কে রে? আমাকে ছেড়ে দাও। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তার চক্ষুদ্বয় ছেড়ে দিলে সে হুযূরকে দেখে চিনতে পারল তখন (স্বাদ গ্রহণ ও বরকতের জন্য) হুযুরের সিনা মোবারকের সাথে আপন পৃষ্ঠকে আরো ভালভাবে মিলিত রাখতে লাগল। অতঃপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলতে লাগলেনঃ কে এই গোলামকে ক্রয় করবে? একথা শুনে ঐ লোকটি বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি

---

১১৬ رواه الترمذى فى الشمائل، باب ما جاء فى صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ص: ١٦، رقم الحديث: ٢٣٠ .

আমাকে সস্তা পাবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ না, তুমি আল্লাহ পাকের নিকট সস্তা নও। অথবা একথা বললেন যে, তুমি আল্লাহ পাকের নিকট দামী।[১১৭]

عن الحسن، قال: أتت عجوز النبى صلى الله عليه وسلم، فقالت: يارسول الله! أدع الله أن يدخلنى الجنة، فقال: يأم فلان! إن الجنة لاتدخلها عجوز، قال: فولت تبكى، فقال: أخبروها أنها لاتدخلها وهى عجوز، إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكاراً [سورة الواقعة ، ٥٦: ٣٥-٣٦].[١١٨]

অর্থ- হযরত হাসান বসরী হতে বর্ণিত, হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের খিদমতে জনৈকা বৃদ্ধা মহিলা এসে বললঃ ও! আল্লাহর রাসূল! আপনি আল্লাহ পাকের কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। বৃদ্ধা মহিলার একথা শুনে হুযূর বললেনঃ হে অমুকের মাতা! কোন বৃদ্ধা মহিলা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। একথা শুনে মহিলাটি ক্রন্দন করতে করতে ফিরে যেতে লাগল। এদেখে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন: মহিলাকে বলে দাও, সে বৃদ্ধাবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে না (বরং চিরকুমারী হয়ে প্রবেশ করবে)। আল্লাহ পাক বলেন: 'আমি জান্নাতী রমণীগণকে বিশেষ রূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাদেরকে করেছি চিরকুমারী।' [সূরা ওয়াকিয়াহ, আয়াত: ৩৫-৩৬][১১৯]

---

১১৭ শামাইলে তিরমিযী, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর রসিকতা প্রসঙ্গ অধ্যায়, পৃ. ১৬, হাদীস নং ২৩০

১১৮ رواه الترمذي فى الشمائل، باب ما جاء فى صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ، ص: ١٦، رقم الحديث: ٢٣١ . قلت : و الحديث قد سكت عنه الترمذي ، و إســناده ضعيف ، لأن فيه مبارك بن فضالة ، و هو صدوق يدلس و يسوي ، ورواه أبو نعيم في أخبار أصبهان ، برقم ١٧٩٥ ،و إسناده متصل ، ورجاله ثقات .

১১৯ শামাইলে তিরমিযী, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম -এর রসিকতা প্রসঙ্গ অধ্যায়, পৃ. ১৬, হাদীস নং ২৩১

প্রথম হাদীসটিতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পিছন থেকে এসে এ উদ্দেশ্যে চোখ ধরেননি যে, এভাবে পিছন থেকে এসে কারোর চোখ ধরা ইবাদত ও ছাওয়াবের কাজ। বরং রসিকতামূলক এমন করেছেন। তেমনিভাবে দ্বিতীয় হাদীসটিতেও বৃদ্ধা মহিলাকে ‘কোন বৃদ্ধা মহিলা জান্নাতে যাবে না’ এ উদ্দেশ্যে বলেননি যে, বৃদ্ধা মহিলাদেরকে এ ধরণের কথা বলা ইবাদত বা ছাওয়াবের কাজ। বরং রসিকতা করেই এমন করেছেন।

১৪. আপতিত সুন্নাত (السنة الاتِّفاقِيَّة) এর উদাহরণ

عن حذيفة –رضي الله تعالى عنه– ، قال : أتى النبي صلى الله عليه و سلم سباطة قوم ، فبال قائما ، ثم دعا بماء ، فتوضأ .[১২০]

অর্থ: হযরত হুযায়ফা রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এক সম্প্রদায়ের আবর্জনা ফেলার স্থানে আসলেন এবং দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন। অতঃপর পানি চাইলেন। এরপর উযূ করলেন।[১২১]

এখানে দাঁড়িয়ে পেশাব করার কথা উল্লেখ রয়েছে, তা সুন্নাতে হুদা নয়। অর্থাৎ দাঁড়িয়ে পেশাব করা কোন ইবাদত বা সাওয়াবের কাজ নয়। কেননা তিনি ইবাদত কিংবা সাওয়াবের আশায় দাঁড়িয়ে পেশাব করেননি বরং নিচে ময়লা থাকার কারণে ঘটনাক্রমে এমন করেছেন।

---

120 أخرجه البخاري في صحيحه ، فى الوضوء ، باب البول قائما و قاعدا ، ١: ٣٥ . رقم الحديث : ٢٢٤ ، ٢٢٥ ، ٢٢٦ ، ٢٤٧١ .

১২১ সহীহ বুখারী, খ. ১, পৃ. ৩৫, হাদীস নং ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২৪৭১

১৫. ভদ্রতাসূলভ সুন্নাত (السنة المجامليَّة) এর উদাহরণ

عن عمر بن أبى سلمة –رضي الله تعالى عنه– ، أنه قال : أكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجعلت آخذ من لحم حول الصحفة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل مما يليك .[١٢٢]

অর্থ: হযরত উমর ইবনে আবূ সালামাহ রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি কলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সাথে খানা খাচ্ছিলাম। আমি পাত্রের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গোস্ত নিতে শুরু করলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার পার্শ্ব থেকে খাও।[১২৩]

উক্ত হাদীসে নিজের পার্শ্ব থেকে খাওয়া সুন্নাতে হুদা তথা সাওয়াবের সুন্নাত নয়। বরং এভাবে খাওয়া ভদ্রতা। তাই এভাবে খেতে বলেছেন।

১৬. কূটনৈতিক সুন্নাত (السنة الدِبْلوماسِيَّة) এর উদাহরণ

وذكر بن إسحاق أن النبي صلى الله عليه و سلم وادع اليهود لما قدم المدينة وامتنعوا من اتباعه ، فكتب بينهم كتابا ، وكانوا ثلاث قبائل ، قينقاع ،

---

122 أخرجه البخاري في صحيحه ، فى الأطعمة ، باب الأكل مما يليه ، ٢: ٨١٠ ، رقم الحديث : ٥٣٧٧ ، و مسلم في صحيحه ، فى الأشربة ، باب آداب الطعام و الشراب و أحكامهما ، ٢: ١٧٢ ، رقم الحديث : ٢٠٢٢ ، و أبو داؤود في سننه ، فى الأطعمة ، باب الأكل باليمين ، ٢: ٥٣٠ ، رقم الحديث : ٢٧٧٧ ، و الترمذي في سننه ، فى الأطعمة ، باب ما جاء فى التسمية على الطعام ، ٢: ٧ ، رقم الحديث : ١٨٥٨ ، و اللفظ لمسلم .

১২৩ সহীহ বুখারী, খ. ২, পৃ. ৮১০, হাদীস নং ৫৩৭৭, সহীহ মুসলিম, খ. ২, পৃ.১৭২, হাদীস নং ৫২১৮, সুনানে আবূ দাউদ, খ.২, পৃ.৫৩০, হাদীস নং২৭৭৭, সুনানে তিরমিযী, খ. ২, পৃ. ৭, হাদীস নং ১৮৫৮

والنضير ، وقريظة ، فنقض الثلاثة العهد طائفة بعد طائفة ، فمن على بني قينقاع ، وأجلى بني النضير ، واستأصل بني قريظة .[১২৪]

অর্থ: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় আসলেন এবং ইহুদীরা রাসূলের অনুসরণ করতে অস্বিকৃতি জানাল তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হলেন এবং একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করলেন (যার ধারা বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখ রয়েছে)। আর তারা ছিল তিনটি গোত্র, কায়নুকা', নাযীর ও কুরায়যা। একের পর এক গোত্রত্রয়ই চুক্তি ভঙ্গ করল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কায়নুকা' গোত্রের উপর দয়া করলেন, নাযীর গোত্রকে নির্বাসিত করলেন আর কুরায়যা গোত্রকে মূলৎপাটন করলেন।[১২৫]

এমন করা সুন্নাতে হুদা হিসেবে ছিল না, কূটনৈতিক কারণে ছিল।

১৭. চিকিৎসামূলক সুন্নাত (السنة الطبيَّة) এর উদাহরণ

عن أبي هريرة –رضي الله تعالى عنه– ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : العجوة من الجنة ، وفيها شفاء من السم ، والكمأة من المن ، ومائها شفاء للعين .[١٢٦]

অর্থ: হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 'আজওয়া' খেজুর জান্নাতী ফল। এটা বিষের প্রতিশোধক। আর মাশরুম আসমান হতে অবতীর্ণ 'মান্ন' এর অংশ। এর রস চক্ষু রোগের প্রতিশোধক।[১২৭]

---

124 فتح الباري ، لابن حجر العسقلاني ، كتاب مناقب الأنصار ، باب إتيان النبي صلى الله عليه و سلم حين قدم المدينة ، ٧ : ٣٤٤ .

১২৫ ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার আসকলানী, খ. ৭, পৃ. ৩৪৪

126 أخرجه الترمذي فى الطب ، باب ما جاء فى الكمأة و العجوة ، ٢: ٢٧ ، رقم الحديث : ٢٠٦٨ ، ٢٠٧٠ ، و قال : هذا حديث حسن غريب .

১২৭ সুনানে তিরমিযী, খ. ২, পৃ. ২৭, হাদীস নং ২০৬৮, ২০৬৯, ২০৭০

عن رافع بن خديج –رضي الله تعالى عنه–عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فور جهنم ، و في رواية : من فيح جهنم ، فأبردوها بالماء .[١٢٨]

অর্থ: হযরত রাফি' বিন খাদীজ রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জ্বর জাহান্নামের উত্তলতার অংশ, তাই তা পানি দ্বারা ঠাণ্ডা কর।[১২৯]

প্রথম হাদীসে যে আরোগ্যের কথা বলা হয়েছে তা সুন্নাতে হুদা হিসেবে নয়। তেমনিভাবে দ্বিতীয় হাদীসে যে জ্বরকে পানি দ্বারা ঠাণ্ডা করতে বলা হয়েছে তাও সাওয়াবের জন্য নয়। বরং আরোগ্যের জন্য।

সুন্নাতে গায়রে হুদা কি ইবাদত?

উপরোল্লেখিত সতেরটি দৃষ্টান্ত থেকে এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর প্রত্যেকটি কথা ও কাজ ইবাদত নয় এবং এর অনেক কিছুই অহীর ভিত্তিতে ছিল না। বরং তিনি দ্বীন বা ইবাদত বিষয়ক যা কিছু বলেছেন সেগুলো অহীর ভিত্তিতে বলেছেন বা এমন ইজতিহাদ ও গবেষণার ভিত্তিতে বলেছেন যা ভুল হলে পরবর্তীতে অহী দ্বারা শোধরিয়ে দেয়া হয়েছে। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এমন নির্দেশ গুলোকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরতে বলেছেন। পক্ষান্তরে, উল্লিখিত বিষয়াদি সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত আছে সেগুলো আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দেননি। বরং এ ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন যে, আমি তো একজন মানুষ

---

128 أخرجه البخاري في صحيحه ، فى الطب ، باب الحمى من فيح جهنم ، ٢: ٨٥٢ ، رقم الحديث : ٥٧٢٣ ، ٣٢٦٤ ، و مسلم في صحيحه ، فى السلام ، باب لكل داء دواء إلخ ، ٢: ٢٢٦ ، رقم الحديث : ٢٢١١ ، و الترمذي فى الطب ، باب ما جاء فى الكمأة و العجوة ، ٢: ٢٧ ، رقم الحديث : ٢٠٧٥ .

১২৯ সহীহ বুখারী, খ. ২, পৃ. ৮৫২, হাদীস নং ৫৭২৩, ৩২৬৪, সহীহ মুসলিম, খ. ২, পৃ.২২৬, হাদীস নং ২২১১, সুনানে তিরমিযী, খ. ২, পৃ. ২৭, হাদীস নং ২০৭৫

মাত্র। অন্যান্য মানুষের যেমন পদস্খলণ ঘটে আমিও তাদের মত। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে দুনিয়ার বিষয়াদি সম্পর্কে অন্যান্য লোককে তার থেকে বেশী জ্ঞানী বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন- تأبير النخل অর্থাৎ খেজুর গাছে পরাগযোগ (Pollination) এর হাদীস তার জ্বলন্ত প্রমাণ। কুরআনে কারীমের আয়াতঃ

ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا .

অর্থ- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে যে নির্দেশনা দেন তা আঁকড়ে ধর। আর যে কাজ থেকে বারণ করেন তা থেকে বিরত থাক।[১৩১]

এ দ্বারাও উপরোল্লেখিত বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। কেননা উক্ত আয়াতে 'ما اتاكم الرسول' বলা হয়েছে, 'ما اتاكم محمد' বলা হয়নি। অর্থাৎ রাসূল হিসেবে তিনি যে নির্দেশ দিবেন তা অবশ্যই অবনত মস্তকে মেনে নিবে। ব্যক্তি মুহাম্মাদ বা মানুষ হিসেবে তার কাজ ও কথাকে অনুসরণ করা হবে কি হবে না এ সম্পর্কে উক্ত আয়াতে কিছু বলা না হলেও উল্লিখিত সতেরটি উদাহরণ থেকে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, এগুলো সর্বক্ষেত্রে মানা আবশ্যক নয়।

মোদ্দাকথা, রাসূল হিসেবে তাঁর সকল আদেশ-নিষেধ অহী বিধায় তা অবশ্যই করণীয় ও পালনীয়। পক্ষান্তরে, ব্যক্তি মুহাম্মাদ বা মানুষ হিসেবে তাঁর সব কিছু অহী নয় বিধায় তা পালন করা বা মান্য করা অপরিহার্য নয়।

ইমামুল হিন্দ শাহ্ অলীউল্লাহ মুহদ্দিসে দেহ্লভী (রহ.) বলেনঃ

اعلم أن ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم ودوّن فى كتب الحديث على قسمين: أحدهما: ماسبيله سبيل تبليغ الرسالة، وفيه قوله تعالى ((وماآتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)) منه علوم المعاد وعجائب

---

130 سورة الحشر ، ٥٩ : ٧ .

১৩১ সূরা হাশর, আয়াত: ৭

الملكوت، وهذا كله مستند إلى الوحى، (أى: ليس للاجتهاد فيه دخل)، ومنه شرائع وضبط للعبادات والارتفاقات بوجوه الضبط المذكورة فى ماسبق، وهذه بعضها مستند إلى الوحى، وبعضها مستند إلى الاجتهاد، واجتهاده صلى الله عليه وسلم بمنـــزلة الوحى، لأن الله تعالى عصمه من أن يتقرر رأيه على الخطأ ... ومنه (أى: مما سبيله سبيل تبليغ الرسالة) حكم مرسلة، ومصالح مطلقة، لم يؤقتها، ولم يبين حدودها،كبيان الأخلاق الصالحة، وأضدادها، ومسندها غالبا الاجتهاد... ومنه فضائل الأعمال ومناقب العمال، وأرى أن بعضها مستند إلى الوحى وبعضها إلى الاجتهاد...

وثانيهما: ماليس من باب تبليغ الرسالة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشئ من دينكم فخذوابه، وإذا أمرتكم بشئ من رأيي، فإنما أنا بشر". وقوله صلى الله عليه وسلم فى قصة تأبير النخل: "فإنى إنما ظننت ظنا" إلخ ... فمنه الطب، ... ومنه مافعله صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة دون العبادة، وبحسب الاتفاق دون القصد، ومنه ما ذكره كما كان يذكر قومه، كحديث أم زرع، وحديث خرافة ... ومنه ما قصد به مصلحة جزئية يومئذ، وليس من الأمور اللازمة لجميع الأمة، وذلك مثل ما يأمر به الخليفة من تعبية الجيوش وتعيين الشعار ... ومنه حكم وقضاء خاص، وإنما كان يتبع فيه البينات والأيمان .[١٣٢]

অর্থ- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে ও হাদীসের কিতাব সমুহে সংকলিত আছে এগুলো দু'প্রকারঃ
(১) ঐ সকল হাদীস যেগুলো রাসূল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

---

132 حجة الله البالغة، المبحث السابع: مبحث استنباط الشرائع من حديث النبى صلى الله عليه وسلم، باب بيان أقسام علوم النبى صلى الله عليه وسلم، ١: ١٢٨-١٢٩ .

(২) ঐ সকল হাদীস যেগুলো রাসূল হিসেবে বর্ণনা করেননি। বরং ব্যক্তিগত মতামত ও অভিজ্ঞতা ইত্যাদির আলোকে বর্ণনা করেছেন।

প্রথম প্রকার হাদীসগুলো কয়েক ভাগে বিভক্তঃ

(ক) আখেরাত ও ঊর্ধ্বজগত সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ। এগুলো সম্পূর্ণ অহীর উপর নির্ভরশীল (অর্থাৎ যার মধ্যে ইজতিহাদের কোন প্রকার দখল কিংবা সম্ভাবনা নেই);

(খ) শরী'আত ও ইবাদত সম্পর্কীয় হাদীস সমূহ;

(গ) উত্তম চরিত্র ও অসৎ চরিত্র সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ;

(ঘ) এবং আমলের ফযীলত ও আমলকারীর মর্যাদা সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ। এগুলোর অধিকাংশ অহীর উপর এবং কিছু ইজতিহাদ তথা গবেষণার উপর নির্ভরশীল।

দ্বিতীয় প্রকার হাদীসসমূহ যেহেতু রাসূল হিসেবে বর্ণনা করেননি বরং ব্যক্তিগত মতামত ইত্যাদির কারণে বর্ণনা করেছেন, শরয়ী বিধি-বিধান হিসেবে নয়; সেহেতু এগুলোর উপর আমল করাও উম্মতের জন্য আবশ্যক নয়।[১৩৩]

হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহ্লভী (রহ.) এর উক্ত আলোচনা দ্বারা এ কথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, চিকিৎসা সম্পর্কীয় সবগুলো হাদীসের ভিত্তি অহীর উপর ছিল না। বরং কিছু কিছু হাদীস এমনও রয়েছে যা গবেষণা, অভিজ্ঞতা ও শ্রুতি নির্ভর ছিল। সুতরাং এগুলোর উপর আমল করা ও আমল করলে বর্ণিত উপকার পাওয়া আবশ্যক নয়।

আল্লামা ইবনে খালদূন বিষয়টিকে আরো স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেনঃ

والطب المنقول فى الشرعيات من هذا القبيل، وليس من الوحى فى شيئ، و إنما هو أمركان عاديا للعرب، ووقع فى ذكر أحوال النبى صلى الله عليه وسلم من نوع ذكر أحواله التى هى عادة وجبلة، لا من جهة أن ذلك مشروع على

১৩৩ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, খ. ১, পৃ. ১২৮-১২৯ [সংক্ষেপিত]

ذلك النحو من العمل، فإنه صلى الله عليه وسلم إنما بُعث ليعلمنا الشرائع، ولم يبعث لتعريف الطب، ولا غيره من العاديات، وقد وقع له فى شأن تلقيح النخل ما وقع، فقال: ''أنتم أعلم بأمور دنياكم''. فلا ينبغى أن يحمل شيئ من الطب الذى وقع فى الأحاديث الصحيحة المنقولة على أنه مشروع، فليس هناك ما يدل عليه، اللهم إلا إذا استعمل على جهة التبرك وصدق العقد الإيمانى، فيكون له أثر عظيم فى النفع، وليس ذلك فى الطب المزاجى، وإنما هو من آثار الكلمة الإيمانية، إلخ.[١٣٤]

অর্থ- চিকিৎসা অধ্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ অহীর অন্তর্ভুক্ত নয় বরং এগুলো আরবের প্রথাগত চিকিৎসা মাত্র। এগুলোর অবস্থান রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর অভ্যাস ও স্বভাবগত আমল সমূহের ন্যায়, শরী'আত হিসেবে নয়। (সুতরাং এগুলোর উপর আমল করাও আবশ্যক নয়।) কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম প্রেরিত হয়েছেন আমাদেরকে শরী'আত শিক্ষা দেয়ার জন্য। চিকিৎসা ও অন্য কোন অভ্যাস ও প্রথাগত বিষয় শিক্ষা দানের জন্য নয়। খেজুর গাছে পরাগযোগের ঘটনা এ কথা প্রমাণ করে। তাইতো ''أنتم أعلم بأمور دنياكم'' ("তোমরা তোমাদের দুনিয়ার কাজ-কারবারের ব্যাপারে আমার থেকে অধিক জ্ঞাত") একথা বলে দুনিয়ার ব্যাপারে তার সবকথা মানা যে আবশ্যক নয় তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। অতএব, সহীহ হাদীস সমূহে বর্ণিত চিকিৎসার ব্যাপারেও এ কথা বলা যাবে না যে, শরীআতে এগুলোর উপর আমল করতে বলা হয়েছে। তবে হ্যাঁ, কেউ যদি বরকত লাভের উদ্দেশ্যে এবং পরিপূর্ণ ঈমানের সাথে এ গুলোর উপর আমল করে তাহলে তার উপকার হওয়ার ব্যাপারে এর বিরাট প্রভাব থাকতে পারে। এ উপকার

---

134 مقدمة ابن خلدون، الباب السادس، الفصل الخامس والعشرون فى علم الطـــب، ١: ٦٥١.

চিকিৎসা হিসেবে নয়। বরং ঈমান ও ভক্তির প্রভাবের ফল হিসেবে হবে।[১৩৫]

ইবনে খালদূন (রহ.) যদিও চিকিৎসা সম্পর্কীয় সকল হাদীস গুলোকে অহী নয় বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এর মধ্যে কিছু হাদীস অহীর ভিত্তিতে বর্ণিত হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই।

যেমন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক চিকিৎসার অবস্থানের প্রথম প্রকারে[১৩৬] তা প্রমাণ করা হয়েছে।

শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী (দা. বা.) আল্লামা ইবনে খালদূনের উক্ত অভিমত উল্লেখ করার পর বলেনঃ

وكذلك ما جزم به ابن خلدون –رحمه الله تعالى– من أنها ليست من الوحى فى شئ، لا يمكن تأسيسه على نص من النصوص أو على دليل قطعى آخر، وما هو المانع من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بعض المعالجات بالوحى؟ والصحيح أنه لا سبيل إلى الجزم بأحد الاحتمالين فى هذا، فيمكن أن تكون بعض المعالجات وحيا، ويمكن أن تكون بعضها مبنية على التجربة بأنها ليست من الوحى فى شيئ... وأما قصة تأبير النخل التى استدل بها ابن خلدون، فلم يجزم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بشيئ، وإنما ظن ظنا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فى تلك القصة: ''فإنى إنما ظننت ظنا، ولا تؤاخذونى بالظن'' ... نعم هناك مجال للقول، بأن المعالجات المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست من قبيل تبليغ الرسالة، وليست جزء للشريعة بمعنى أن يجب اتّباعها لكل أحد في كل مكان و زمان .[١٣٧]

অর্থ- তেমনিভাবে ইবনে খালদূন (রহ.) হাদীসে বর্ণিত চিকিৎসা সমূহকে চূড়ান্তভাবে অহী না হওয়ার পক্ষে যে অভিমত পেশ করেছেন,

---

১৩৫ মুকাদ্দামায়ে ইবনে খালদূন, খ. ১, পৃ. ৬৫১

১৩৬ ৩৩-৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

137 تكملة فتح الملهم، كتاب الطب، ٤: ٢٩٣–٢٩٤ .

তা কুরআন-সুন্নাহের কোন ভাষ্য কিংবা শরীআতের কোন অকাট্য দলীল ভিত্তিক নয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর কিছু চিকিৎসা অহীর মাধ্যমে হতে কী প্রতিবন্ধকতা আছে? এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত এই যে, দৃঢ়তার সাথে তাঁর সকল চিকিৎসা অহীর ভিত্তিতে ছিল এ কথা বলা যাবে না। তেমনিভাবে সকল চিকিৎসা অহীর ভিত্তিতে ছিল না এ কথাও বলা যাবে না। বরং কিছু কিছু চিকিৎসা অহীর ভিত্তিতে ছিল আর কিছু কিছু চিকিৎসা শুনা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ছিল। تأبير نخل বা খেজুর গাছে পরাগযোগের ঘটনার দ্বারা উপরোক্ত বিষয়ের উপর দলীল পেশ করা ঠিক নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে নিশ্চিত ভাবে কিছু বলেননি বরং এভাবে বলেছেন, ''فإنى إنما ظننت ظنا، ولاتواخذونى بالظن'' "আমি তো অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে বলেছি মাত্র। অতএব, অনুমানকৃত বিষয়ে তোমরা আমাকে অভিযুক্ত করবে না।"

হ্যাঁ, এখানে এ কথা বলার অবকাশ রয়েছে যে, চিকিৎসা বিষয়ক হাদীসগুলো তিনি রাসূল হিসেবে ও শরীআতের অংশ হিসেবে বলেননি যে, সর্বযুগে সকল এলাকায় সকলের জন্য এর অনুকরণ আবশ্যক হবে।[১৩৮]

মোদ্দাকথা, চিকিৎসা বিষয়ক হাদীসগুলো অহীর ভিত্তিতে হোক কিংবা না হোক এগুলো শরী'আত হিসেবে ছিল না। অতএব, এগুলোর উপর আমল করা ইবাদত ও সাওয়াবের কাজ নয় এবং এগুলোর উপর আমল করা উম্মতের জন্য আবশ্যক নয়। তেমনিভাবে সুন্নাতে গায়রে হুদার অন্যান্য প্রকার গুলোও শরীআত হিসেবে ছিল না। তাই এগুলোর উপর আমল করাও উম্মতের জন্য আবশ্যক নয়। তবে এগুলো ফেলে দেয়ারও নয়। ক্ষেত্র বিশেষ আমল করতে পারলে গণীমত মনে করা চাই। কিন্তু একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, আসল দ্বীন এগুলো নয় বরং আসল দ্বীন হল, সুন্নাতে হুদা। এগুলোর উপর আমল করাই ইবাদত।

---

১৩৮ তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, খ. ৪, পৃ. ২৯৩-২৯৪

ইমাম আব্দুল হাই লাখনূভী রহ. লিখেন,

سنن الهدى ، إنما سميت بها ، لأن الأخذ بها موجب للاهتداء ، كيف لا ؟ ، و قد قال تعالى : قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إلخ ، فألزم اتبـــاع النبي صلى الله عليه وسلم ، و هو أعم من أن يكون فى الأقوال أو فى الأفعال ، و من المعلوم أن الأفعال التي لم يواظب عليها ، أو واظب عليها عادة ، و لـــزم الأخذ بها لوقع الحرج ، فتعين اللزوم فى الأفعال التي واظب عليها عبـــادة ، و رتب الله تعالى عليه حصول محبته .... ، و أما سنن الزوائد ، فلما لم يكن تركها موجبا للضلالة ، و لا مخلا فى أصل الهداية ، و إن لم يحصل كمال الهداية سميت بذلك ، اهـــ[١٣٩] قلت : و المراد هنا بالزائدة غير الهدى . و الله سبحانه و تعالى أعلم .

---

139 السعاية شرح شرح الوقاية ، في مبحث الطهارة ، ١ : ١٧٣ .

تعريف الطبيب الحاذق
বিজ্ঞ ডাক্তারের পরিচয়
Identity of Muslim Proficient Doctor

বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখ রয়েছে যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে “ত্ববীবে হাযেক” তথা বিজ্ঞ ডাক্তার বললে রোযা ভাঙ্গা, কোন হারাম বস্তু খাওয়া, তায়াম্মুম করা ও মাসেহ করা ইত্যাদি জায়েয হয়, অন্যথায় জায়েয হয় না। তাই “ত্বাবীবে হাযেক” কাকে বলে তা জানা আবশ্যক।

যার মধ্যে নিম্নবর্ণিত শর্ত ও গুণাবলী পাওয়া যায় তাকে ‘طبيب حاذق’ বা ‘বিজ্ঞ ডাক্তার’ বলে। পর্যায়ক্রমে গুণগুলো হলোঃ

১। রোগ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকা।

২। রোগের কারণ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকা।

৩। রোগীর প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকা।

৪। রোগীর দুর্বলতা ও সবলতার দিকে লক্ষ্য রেখে ওষুধ ব্যতীত খাদ্য ও সতর্কতার মাধ্যমে চিকিৎসা করার যোগ্যতা থাকা।

৫। রোগীর মেজাজ ও স্বভাব বুঝা অর্থাৎ কার জন্য কী ধরণের ওষুধ প্রয়োজন তা বুঝার যোগ্যতা থাকা।

৬। রোগের কারণে স্বাভাবিক মেজাজের পরিবর্তে নতুন সৃষ্ট মেজাজ বুঝার যোগ্যতা রাখা।

৭। রোগীর বয়সের খেয়াল রাখা এবং বয়স কম বেশি হলে চিকিৎসার মধ্যে কী পরিবর্তন হবে তা জানা ও সে অনুপাতে চিকিৎসা করার যোগ্যতা থাকা।

৮। রোগীর অভ্যাস সম্পর্কে অবগত থাকা। অর্থাৎ অভ্যাসের পরিবর্তনে চিকিৎসায় কি পরিবর্তন করতে হয় এ সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা।

৯। কাল ও ঋতু দেখে চিকিৎসা করা। অর্থাৎ ঋতুর পরিবর্তনে ওষুধের কী পরিবর্তন হবে তা জানা থাকা, যাতে করে সে অনুপাতে চিকিৎসা করতে পারে।

১০। রোগীর দেশ, জন্মস্থান ও তার এলাকার আবহাওয়া সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা এবং এগুলোর পরিবর্তনে চিকিৎসার কী পরিবর্তন ঘটে তা জানা।

১১। রোগ সৃষ্টির সময়ের আবহাওয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখা ও ঐ সময়ের আবহাওয়ার কী প্রভাব তা জানা থাকা।

১২। রোগের বিপরীতমুখী ওষুধ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকা।

১৩। ওষুধের ক্রিয়া, পর্যায়, স্তর ও রোগীর শক্তির সামঞ্জস্য সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকা।

১৪। শুধু রোগ দূর করাই উদ্দেশ্য না হওয়া বরং এভাবে রোগ মুক্ত করার জ্ঞান থাকা যেন এর দ্বারা অন্য কোন কঠিন রোগ সৃষ্টি না হয়। যেমন- পেনিসিলিন (ইঞ্জেকশন) খেলে খুজলী নিরাময় হয়ে যায় কিন্তু এর সাথে সাথে রোগীও মারা যায়। তাই খাওয়ার পরিবর্তে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে ওষুধ পুশ করা হয়। এতে যদিও খাওয়ার তুলনায় ওষুধের প্রভাব কম হয় কিন্তু রোগী মৃত্যু থেকে রক্ষা পায়।

১৫। সহজ থেকে সহজতর পন্থায় চিকিৎসা করতে জানা। যেমন- খাদ্য দ্বারা চিকিৎসা সম্ভব হলে ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা না করা।

১৬। একক ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা সম্ভব হলে একাধিক ওষুধ মিশ্রণ করে চিকিৎসা না করা। অর্থাৎ এ দু'ধরণের ওষুধের পার্থক্য জানা।

১৭। রোগীর রোগের চিকিৎসা সম্ভব কিনা এ সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা এবং তা পূর্বেই দেখে নেয়া। চিকিৎসা সম্ভব না হলে অযথা চিকিৎসার জন্য রোগীকে উদ্বুদ্ধ না করার মানসিকতা থাকা।

১৮। রোগ যে অবস্থায় আছে সেখান থেকে আরো বৃদ্ধি না করে তা প্রতিরোধ করার জ্ঞান থাকা এবং এ অনুপাতে চিকিৎসা করা। অবশ্য আদি যুগের ডাক্তারগণ এবং বর্তমান হোমিও প্যাথিক ডাক্তারগণ রোগকে পূর্ণতায় পৌছার পর চিকিৎসা ও প্রতিকার করার পক্ষপাতি। কিন্তু এ পদ্ধতিটি সঠিক মনে হয়না, কারণ রোগ পূর্ণতায় উন্নীত হতে হতে অবশেষে রোগীকে বাঁচানো দায় হয়ে পড়ে।

১৯। রূহ এবং অন্তরের রোগ সমূহ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে পারদর্শী হওয়া। কেননা রূহ ও অন্তর শরীরের উপর অনেক প্রভাব বিস্তার করে।

২০। রোগীর সাথে ছোটদের মত নম্র ও স্নেহময়ী আচরণ করার যোগ্যতা ও অভ্যাস থাকা।

২১। রোগীকে সর্বদা তার রোগ নূন্যতম, হালকা ও সাধারণ হওয়ার প্রবোধ দেয়া, তার চিকিৎসা সহজ ও স্বল্প মেয়াদী বলে সান্ত্বনা দেয়ার এবং রোগ কঠিন ও মারাত্মক; এ কথা কখনো না বলার অভ্যাস থাকা।

২২। বর্তমান স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জ্ঞান থাকা ও তা অটুট রাখার চেষ্টা করা।

২৩। হারানো স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে জ্ঞাত থাকা ও তা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করা।

২৪। রোগের কারণসমূহ সমূলে বিনাশ করার জ্ঞান থাকা ও এর জন্য চেষ্টা করা। সমূলে বিনাশ সম্ভব না হলে সাধ্যমত কমানোর চেষ্টা করা। অন্ততপক্ষে রোগ বৃদ্ধি হতে না দেয়ার জ্ঞান থাকা।

২৫। বড় কষ্ট দূর করার লক্ষ্যে ছোট কষ্ট মেনে নেয়ার জন্য বড় ও ছোট কষ্টসমূহ নির্ণয় সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা।

২৬। বড় উপকারের স্বার্থে ছোট উপকার পরিত্যাগ করার লক্ষ্যে উপকারদ্বয়ের পার্থক্য অর্থাৎ কোনটি বড় আর কোনটি ছোট তা নির্ণয় করার জ্ঞান থাকা। ইত্যাদি

উপরোল্লেখিত গুণ (শর্ত) গুলো যে ডাক্তারের মধ্যে পাওয়া যাবে সে ‘طبيب حاذق’ বা ‘বিজ্ঞ ডাক্তার’। আর যার মধ্যে পাওয়া যাবে না সে ‘বিজ্ঞ ডাক্তার’ নয়।[১৪০]

---

140 الطب النبوي لإبن القيم، ص : ١٤١–١٦١، زاد المعاد فى هدى خير العباد، فصل الأمور التى يجب أن يراعيها الطبيب الحاذق، ٤: ١١١–١١٣ . [مع تفصيل يسير مني]

আত তিব্বুন নববী, পৃ. ১৪১-১৬১, যাদুল মা'আদ, খ. 8, পৃ. ১১১-১১৩। [আমার পক্ষ থেকে সামান্য ব্যাখ্যা সহকারে]

مسئلة إذن المريض للعلاج
চিকিৎসার জন্য রুগির অনুমতি প্রয়োজন কি না?
The Section of Permission from Diseased for Treatment

মানুষ যদিও নিজ দেহের মালিক নয়, বাস্তাব মালিক তো আল্লাহ পাকই, তথাপিও তিনি মানুষকে তার শরীআতের সাথে সাংঘর্ষিক না হলে দেহকে মালিকের মতই ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। অতএব, তার দেহের ব্যাপারে যেকোন ধরণের হস্তক্ষেপ করতে হলে তার অনুমতি আবশ্যক। এ ব্যপারে ইসলামিক ফিকাহ একাডেমি জেদ্দা এর কারারাত/সিদ্ধান্তাবলী একটু ব্যাখ্যা সহকারে তুলে ধরছি।

ক) রুগি যদি অনুমতি প্রদানের যোগ্য হয় তাহলে তার চিকিৎসার জন্য অনুমতি শর্ত। যদি সে অনুমতি প্রদানের যোগ্য না হয় (যেমন, নাবালেগ অথবা পাগল কিংবা বুদ্ধিপ্রতিবন্দী হয়) তাহলে তার অভিভাবকের অনুমতি নিতে হবে। আর অভিভাবকদের সিরিয়াল শরীআত অনুযায়ী ধর্তব্য হবে। যেমন, পিতা, পিতা না থকালে দাদা; দাদা না থাকলে ভাই ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, তাদের অনুমতি সেখানেই হবে যেখানে রুগির উপকার হবে এবং তার কষ্ট দূর বা লাঘব হবে।

যদি স্পষ্ট ভাবে বুঝা যায় যে, রুগির ক্ষতি হচ্ছে। কিন্তু অভিভাবক চিকিৎসার অনুমতি দিচ্ছে না, তাহলে এ অধিকার তার পরবর্তী অভিভাবকের উপর বর্তাবে। এ ভাবে এ দায়িত্ব শরীআতে নির্ধারিত অভিভাবক সিরিয়াল অনুযায়ী সরকারের উপরও বর্তাবে।

খ) চিকিৎসা যদি প্রতিরোধ মূলক হয় অথবা রোগ ছোঁয়াছে হয় তাহলে সরকার বাধ্যতামূলক তাকে চিকিৎসার করার অধিকার রাখে।

গ) রুগি গুরুতর অবস্থায় পতিত হলে (যেমন, এক্সিডেন্ট হলে, আগুনে পুড়ে গেলে, বিষ পান করলে) তার অনুমতি ব্যতিরেকেই চিকিৎসা করা যাবে।[১৪১]

---

১৪১ কারারাতু মাজ্জাল্লাতি মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী, পৃ. ৩৫, ৩৬, কারার নং ৬৯/৫/৭

مسئلة تعدية الأمراض

রোগ সংক্রমণ সংক্রান্ত মাসআলা

Contagious Disease Problem

ইসলাম ও ছোঁয়াচে রোগ (Islam &Contagious Disease)

রোগব্যাধি ছোঁয়াচে হওয়া সম্পর্কে দু'ধরণের হাদীস পাওয়া যায়।

১. কোনো কোনো হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, ছোঁয়াচে রোগ বলতে কিছু নেই। যেমনঃ

عن أبي هريرة –رضي الله تعالى عنه–، حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا هامّة، فقال أعرابي: يا رسول الله! فما بال الإبل تكون فى الرمل كأنها الظباء، فيجيئ البعير الأجرب، فيدخل فيها، فيجربها كلها؟ قال: فمن أعدى الأول؟ .[১৪২]

অর্থ- হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) হতে বর্ণিত, যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ ছোঁয়াচে রোগ বলতে কিছু নেই, সফর মাসেও অশুভ নেই[১৪৩], আর পেঁচার মধ্যে কুলক্ষণের কিছু নেই,

---

142 أخرجه البخارى فى الطب، باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن، ٢: ٨٥٦، ٨٥٧، رقم الحديث: ٥٧١٧، وباب لاهامة، رقم الحديث: ٥٧٧٠، وباب لاعدوى، رقم الحديث: ٥٧٧٥، ومسلم فى الطب، باب لا عدوى ولاطيرة، ٢: ٢٣٠، رقم الحديث: ٥٧٤٩، واللفظ له

143 জাহেলী যুগের লোকেরা ধারণা করত, (চন্দ্র বৎসরের দ্বিতীয় মাস) সফর মাসটি অশুভ। তাই তারা নিজেদের ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে খেয়াল-খুশী মত মুহার্‌রমকে সফর এবং সফর মাসকে মুহার্‌রম মাস বানিয়ে আগপাছ করে নিত। এর আরেকটি অর্থ হল, পেটে বড় ক্রিমি জাতীয় সাপের মত এক প্রকার প্রাণী হত। ফলে পেটে খুব যন্ত্রণা হত। আরবদের ধারণা, এটাও একটা সংক্রামক। তাই রাসূলুল্লাহ

তখন এক গ্রাম্য ব্যক্তি বলে উঠল, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে উটের এ দশা কেন হয় যে, উটের পাল ময়দানে হরিণের মত বিচরণ করে। এমতাবস্থায় তাদের সাথে চর্মরোগাক্রান্ত একটি উট এসে মিশে যায় এবং তাদেরকেও চর্মরোগাক্রান্ত করে দেয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন, আচ্ছা! তাহলে প্রথম উটটির চর্মরোগ কোথা হতে আসল?[১৪৪]

২. আবার কোনো কোনো হাদীস দ্বারা ছোঁয়াচে রোগের অস্তিত্ব আছে বলে বুঝা যায়। যেমনঃ

عن أبي هريرة –رضي الله تعالى عنه–، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ... وفر من المجذوم كما تفر من الأسد.[١٤٥]

অর্থ- হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ কুষ্ঠরোগী হতে এমন ভাবে পলায়ন কর, যেমন তুমি সিংহ হতে পলায়ন কর।[১৪৬]

عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف، حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لايورد ممرض على مصِّح. قال أبوسلمة: كان أبو هريرة يحدثهما كليهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .[١٤٧]

সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন, এতে ছোঁয়াচে বা সংক্রামক কিছু নেই বরং এটা একটা কুসংস্কার ও ভ্রান্ত আকীদা।

১৪৪ বুখারী, খ. ২, পৃ. ৮৫৬-৮৫৭, হাদীস নং ৫৭১৭, ৫৭৭০, ৫৭৭৫, মুসলিম, খ. ২, পৃ. ২৩০, হাদীস নং ৫৭৪৯

145 أخرجه البخارى فى الطب، باب الجذام، ٢: ٨٥٠، رقم الحديث: ٥٧٠٧

১৪৬ বুখারী, খ. ২, পৃ. ৮৫০, হাদীস নং ৫৭০৭

147 أخرجه البخارى فى الطب، باب لا عدوى، ٢: ٨٥٩، رقم الحديث: ٥٧٧٤، ومسلم فى الطب، باب لا عدوى ولا طيرة، ٢: ٢٣٠، رقم الحديث: ٥٧٤٥، واللفظ له .

অর্থ- আবূ সালামা বিন আব্‌দুর রহমান বিন আউফ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ রুগ্ন উটকে সুস্থ উটের সাথে মেশাবে না।[১৪৮]

عن عبدالله بن عامر بن ربيعة، أن عمر خرج إلى الشام، فلما جاء سرغ، بلغه أن الوباء وقع بالشام، فأخبره عبدالرحمن بن عوف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض، فلاتقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها، فلا تخرجوا فرارا منه، فرجع عمر بن الخطاب من سرغ .[١٤٩]

وفى هذه القصة عن عبدالله بن عباس (فى رواية أخرى) : فنادى عمر فى الناس أنى مصبح على ظهر، فاصبحوا عليه، فقال أبوعبيدة بن الجراح: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها ياأبا عبيدة! –وكان عمر يكره خلافه– نعم! نفر من قدر الله إلى قدر الله.[١٥٠]

অর্থ- হযরত আব্‌দুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে রবী'আ থেকে বর্ণিত যে, একবার হযরত উমর (রাযি.) সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। পথে সূরাগ নামক স্থানে পৌঁছলে সংবাদ পান যে, সিরিয়ায় মহামারী দেখা দিয়েছে। অতঃপর হযরত আব্‌দুর রহমান ইবনে আউফ তাকে অবগত করলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যখন তোমরা কোন এলাকায় মহামারী সম্পর্কে শুনতে পাও, তখন সে এলাকায় প্রবেশ করবে না। আর যদি কোন এলাকায় মহামারী দেখা দেয় এবং তোমরা সেখানে থাক, তাহলে মহামারী থেকে পালানোর উদ্দেশ্যে সে এলাকা থেকে বের হবে না। অতপর হযরত উমর (রাযি.) সূরাগ থেকে ফিরে আসলেন।[১৫১]

---

১৪৮ বুখারী, খ. ২,পৃ. ৮৫৯, হাদীস নং ৫৭৭৪, মুসলিম, খ. ২, পৃ. ২৩০, হাদীস নং ৫৭৮৫

149 رواه مسلم فى الطب، باب الطاعون والطيرة، ٢: ٢٢٩، رقم الحديث: ٥٧٤١

150 أخرجه مسلم فى الطب، باب الطاعون، ٢: ٢٢٩، رقم الحديث: ٥٧٣٨ .

১৫১ মুসলিম, খ. ২, পৃ. ২২৯, হাদীস নং ৫৭৪১

উক্ত ঘটনায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে (অপর বর্ণনায়) এ কথারও উল্লেখ রয়েছে, হযরত উমর (রাযি.) ঘোষণা দিলেন যে, আমি আগামী কাল সকালে আরোহীর পিঠে আরোহণ করে এখান থেকে প্রত্যাবর্তন করব। অতএব, কাল সকালে সকলেই ঐ স্থান থেকে প্রত্যাবর্তন করবে। এ কথা শুনে হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জার্‌রাহ রাযি. বললেনঃ হে উমর! আল্লাহর ফায়সালা হতে পলায়ন করছ? উত্তরে হযরত উমর (রাযি.) বললেন, হে আবূ উবায়দা! এ কথা তুমি ছাড়া যদি অন্য কেউ বলতো (এ পরিমাণ আশ্চর্য হতাম না, যেমন আশ্চর্য হয়েছি তুমি বলার কারণে)। উল্লেখ্য, হযরত উমর (রাযি.) এ মতের বিরোধীতাকে অপছন্দ করছেন। (এরপর হযরত উমর রাযি. বললেন) হ্যাঁ, আমরা আল্লাহর এক ফায়সালা হতে অন্য ফায়সালার দিকে প্রত্যাবর্তন করছি।[১৫২]

এ সকল হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে ছোঁয়াচে রোগের অস্তিত্ব আছে। অন্যথায় হাদীসে মহামারী আক্রান্ত এলাকায় ঢুকতে এবং সেখান থেকে বের হতে নিষেধ করা হলো কেন? এর কারণ তো এটাই যে, মহামারী এলাকায় প্রবেশ করলে প্রবেশকারীও মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে পড়বে। আর ঐ এলাকা থেকে বের হলে তার সাথে ঐ রোগ বাইরেও ছড়িয়ে পড়বে। এতে ছোঁয়াচে রোগ আছে বলেই প্রমাণিত হয়।

রোগ সংক্রমণ সংক্রান্ত হাদীস সমূহের বৈপরীত্যের নিরসন

উল্লিখিত হাদীসগুলোতে ছোঁয়াচে রোগ থাকা বা না থাকার যে বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়, এর সমন্বয় সাধনের ব্যাপারে যদিও হাদীস ব্যাখ্যাদাতাদের প্রসিদ্ধ অভিমত এই যে, "সংক্রামক ব্যাধি বলতে বাস্তবে কোন কিছু নেই। তবে কুষ্ঠরোগী বা এ ধরণের রোগী থেকে দূরে থাকার যে নির্দেশ হাদীসে দেয়া হয়েছে, তা এজন্য ছিল যে, সুস্থ ব্যক্তি অসুস্থ ব্যক্তির সংস্পর্শে যাওয়ার পর যদি সে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাহলে সে

---

১৫২ মুসলিম, খ. ২, পৃ. ২২৯, হাদীস নং ৫৭৩৮

একথা মনে করবে যে, রোগ সংক্রমণের কারণে সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ফলে তার আকীদা ও বিশ্বাস বিনষ্ট হয়ে যাবে। কেননা সে তো বাস্তবে আল্লাহ পাকের হুকুমেই অসুস্থ হয়েছে।"

কিন্তু এ ব্যাপারে সর্বাধিক বিশুদ্ধ অভিমত হল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যে "সংক্রামক ব্যাধি বলতে কোন কিছু নেই" এ কথা বলেছেন, এর দ্বারা "সংক্রামক রোগ"কে অস্বীকার করা উদ্দেশ্য নয়, বরং একথা দ্বারা জাহেলী ও অন্ধকার যুগের বিশ্বাসকে খন্ডন করা উদ্দেশ্য ছিল। কারণ, তাদের বিশ্বাস ছিল যে, নির্দিষ্ট এমন কিছু ব্যাধি রয়েছে যা আল্লাহ তা'আলার হুকুম ছাড়াই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। অথচ "সংক্রামক রোগ" নিজ শক্তিতে কোন কিছু করতে সক্ষম নয়, যতক্ষণ না আল্লাহ পাক তার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করেন। কেননা আল্লাহ পাক চাইলে তিনি যে রোগের মাঝে সংক্রমণের শক্তি সৃষ্টি করেছেন সে রোগ থেকে সংক্রমণের শক্তি রহিতও করতে পারেন।

শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী (দামাত বারাকাতুহুম) বলেনঃ

فالحاصل: أنه لوثبت طبيا أن جراثيم بعض الأمراض تنتقل من جسم إلى جسم آخر، فإن ذلك لاينافى ماورد فى حديث الباب من نفى العدوى، فإن المنفى هو كون هذا الشيئ مؤثرا بذاته دون أن يخلقه الله تعالى، ولا شك فى أن هذا الاعتقاد شرك وكفر. أما الاعتقاد بأن انتقال الجراثيم ربما يسبب المرض كما تسببه الأشياء الأخرى الضارة، وأن كل ذلك موقوف على مشية الله تعالى وتقديره، بحيث أنه إن لم يشأ الله تعالى ذلك، لم تنتقل الجراثيم، أو انتقلت، فلم تسبب المرض، فهذا اعتقاد صحيح، لامانع منه شرعاً، وليس ذلك بمخالف لحديث الباب. وبما أن العادة جرت بانتقال بعض الأمراض من جسد إلى جسد آخر، كالجذام والطاعون، فإن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بالحذرمنه فى درجة اختيار الأسباب والتدابير الوقائية، فإن اختيارها لاينافى التوكل. وعقيدة التقدير مادام الإنسان معتقدا بأن تأثير الأسباب ليس ذاتيا، وانما هو موقوف على مشية

الله تعالى قائلاً: ثقة بالله وتوكلا عليه. وذلك للتنبيه على أن هذا المرض وإن كان يعدى فى العادة ولكن تعديته موقوفة على تقدير الله تعالى، وليس ذلك بتأثيره الذاتى.[١٥٣]

অর্থ- মোটকথা, ডাক্তারী পরীক্ষায় যদি এ কথা প্রমাণিত হয় যে, কিছু কিছু[১৫৪] রোগ-জীবাণু এক জনের শরীর থেকে অপর জনের শরীরে প্রবেশ করে, তবুও এ মতটি যে সমস্ত হাদীসে 'لا عدوى' (সংক্রামক বলতে বাস্তবে কিছু নেই) বলা হয়েছে, সে সমস্ত হাদীসের পরিপন্থী নয়। কেননা 'لا عدوى' বলে ছোঁয়াচে রোগকে অস্বীকার করা হয়নি। বরং জীবাণুর মধ্যে যে, ('সংক্রামক ব্যাধি বলতে বাস্তবে কিছু নেই' দ্বারা) তার নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই, একথাই বুঝানো হয়েছে। জাহেলী যুগে জীবাণুর নিজস্ব ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করা হত, যা নিঃসন্দেহে শির্‌ক ও কুফ্‌র।

পক্ষান্তরে, এ বিশ্বাস রাখা যে, জীবাণু সংক্রমিত হওয়া অনেক সময় রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন অন্যান্য ক্ষতিকর বস্তু ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এগুলো সবই আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত ও তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ তিনি যদি ইচ্ছা না করেন, তাহলে রোগ জীবাণু সংক্রমণ হবে না, অথবা সংক্রমণ হবে, কিন্তু রোগের কারণ হবে না, এমন বিশ্বাস শরীআতের দৃষ্টিতে যেমন অবাঞ্ছিত নয়, তেমনি সংশ্লিষ্ট হাদীসের বিপরীতও নয়। কিন্তু কিছু রোগ ছোঁয়াচে হওয়ার ব্যপারে সমাজে যে প্রচলন রয়েছে যেমন- কুষ্ঠ রোগ ও মহামারী; রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এগুলো থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন প্রতিরোধমূলক তদবীর ও আসবাব (উপকরণ) গ্রহণার্থে। কেননা এগুলো গ্রহণ করা তাওয়াক্কুল এবং তকদীরের পরিপন্থী নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত

---

153 تكملة فتح الملهم، كتاب الطب، باب لا عدوى ولا طيرة، مسئلة تعدية الأمراض، ٤: ٣٧٢.

১৫৪ বর্তমানে ডাক্তারদের মতানুসারে সকল রোগই জীবাণু থেকে হয়ে থাকে এবং সব জীবাণু এক জনের শরীর থেকে অপর জনের শরীরে প্রবেশ করতে পারে।

মানুষের বিশ্বাস এমন থাকবে যে, উপকরণের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া তার নিজস্ব কোন প্রভাব নয়। বরং এসব আল্লাহ পাকের ইচ্ছার উপরই নির্ভরশীল।

এ কারণে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ছোঁয়াচে রোগের হাদীস দ্বারা সতর্ক করেছেন যে, এ ধরণের রোগ যদিও সংক্রামক কিন্তু তার সংক্রমণ আল্লাহ পাকের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, তার নিজস্ব কোন শক্তি, প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া নেই।[১৫৫]

মোটকথা, হাদীসে ছোঁয়াচে রোগকে অস্বীকার করা হয়নি বরং ভ্রান্ত আকীদাকে খন্ডন করা হয়েছে মাত্র। আর দুনিয়া হল دار الأسباب (উপকরণ নির্ভরস্থান), এ হিসেবে আল্লাহ তা'আলা তার স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী প্রায় সকল কার্যক্রম আসবাবের মাধ্যমে সম্পাদন করে থাকেন। আসবাব ও উপকরণ সমূহের মধ্য হতে ছোঁয়াচে বা সংক্রামক ব্যাধিও একটি উপকরণ। তবে একজন মুমিনের জন্য এ বিশ্বাস রাখা অবশ্যই জরুরী যে, পার্থিব জগতের অন্যান্য আসবাব ও উপকরণ সমূহের ন্যায় এটিও কার্যত আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও হুকুমের উপর নির্ভরশীল।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা থাকলে উক্ত আসবাব ও উপকরণ যথারীতি প্রতিক্রিয়াশীল হবে। পক্ষান্তরে, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও হুকুম না থাকলে উক্ত আসবাব ও উপকরণ প্রতিক্রিয়াহীন বা বিফল হয়ে যাবে। অতএব, রোগী থেকে সতর্ক থাকা তাওয়াক্কুল ও শরী'আত পরিপন্থী নয়। বরং রোগ ছোঁয়াচে হওয়ার কারণে রোগী থেকে সতর্ক থাকাই বাঞ্ছনীয়।

عن عمر –رضي الله تعالى عنه–، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى صاحب بلاء، فقال:"الحمد لله الذى عافانى مما ابتلاك به وفضلنى على كثير ممن خلق تفضيلا"[١٥٦]، إلا عوفى من ذلك البلاء كائنا ما كان ما

---

১৫৫ তাকমিলাতু ফাত্হিল মুলহিম, খ. ৪, পৃ. ৩৭২

১৫৬ قد روى عن أبى جعفر محمد بن على، أنه قال: ... يقول ذلك فى نفسه، ولا يسمع صاحب البلاء. رواه الترمذى فى الدعاء، باب ما يقول إذا راى مبتلى، ٢: ١٨١، رقم الحديث: ٣٤٣١ .

عاش.[১٥٧] وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من راى مبتلى، فقال: "الحمد لله الذى عافانى مما ابتلاك به وفضلنى على كثير ممن خلق تفضيلا"، لم يصبه ذلك البلاء.[١٥٨]

অর্থ- হযরত উমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত কিংবা কোন মুসিবতগ্রস্থ ব্যক্তিকে দেখে الحمد لله الذى عافانى مما ابتلاك به وفضلنى على كثير ممن خلق تفضيلا দু'আটি[১৫৯] পড়বে সে তার জীবনদ্দশায় উক্ত রোগ বা মুসীবত থেকে নিরাপদ থাকবে।[১৬০]

এখান থেকেও রোগ সংক্রমণ হয় বলে ইশারা পাওয়া যায়। তা না হলে উক্ত দু'আ পড়লে ঐ রোগ-ব্যাধি ইত্যাদি মুসীবত থেকে নিরাপদে থাকার অর্থ কী? রুগীর কাছে গিয়ে এ দু'আ না পড়লে ঐ রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বিধায়ই দু'আটি পড়তে বলা হয়েছে।

---

157 أخرجه الترمذي فى أبواب الدعوات، باب ما يقول إذا راى مبتلى، ٢: ١٨١، رقم: ٣٤٣١ ، و قال : هذا حديث غريب ، وابن ماجه في كتاب الدعوات ، باب ما يدعوبه الرجل إذا نظر إلى أهل البلاء ، ص: ٢٧٧، وأورده الهيثمي فى المجمع فى الأذكار ، باب ما يقول إذا رأى مبتلى ، ١٠: ١٩٩-٢٠٠ ، رقم الحديث : ١٧١٣٨-١٧١٣٩ عن البزار ، والطبرانى فى الصغير ، والأوسط ، وقال: وإسناده حسن .

158 أخرجه الترمذي في أبواب الدعوات ، باب ما يقول إذا راى مبتلى، ٢: ١٨١، رقم: ٣٤٣٢، و قال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه .

১৫৯ দোয়াটি রোগীকে শুনিয়ে পড়বে না, অন্যথায় রোগী মনে কষ্ট পাবে। (তিরমিযী, খ. ২, পৃ. ১৮১, হাদীস নং ৩৪৩১)

১৬০ তিরমিযী, খ. ২, পৃ. ১৮১, হাদীস নং ৩৪৩১,৩৪৩২, ইবনে মাজাহ, পৃ. ২৭৭, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, খ. ১০, পৃ. ১৯৯-২০০, হাদীস নং ১৭১৩৮, ১৭১৩৯

حكم استعمال الدواء الوقائي قبل الداء
রোগের পূর্বে প্রতিষেধক ব্যবহারের হুকুম
The Judgment of Useing Vaccine before Disease

একটি বিখ্যাত প্রবাদ,
আরবীতে- ‘‘الوقاية خير من العلاج’’
ইংরেজীতে- "Prevention is better than cure"
বাংলায়- “রোগ নিরাময়ের চেয়ে প্রতিকার শ্রেয়”

রোগ হওয়ার পূর্বে তার প্রতিষেধক ব্যবহার করা নাজায়েয বা অবৈধ নয় এবং তা তাওয়াক্কুলেরও পরিপন্থী নয়।

শিশুদের সতর্কতা মূলক পোলিও, হাম, ধনুষ্টংকার, হেপাটাইটিস-বি, ইত্যাদি যে সকল অগ্রিম টিকা দেয়া হয় এগুলো অবৈধ নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মহামারী আক্রান্ত এলাকায় গমন না করার ও মহামারী এলাকা থেকে বেরিয়ে না আসার যে পরামর্শ দিয়েছেন তা সতর্কতার ভিত্তিতেই ছিল। তেমনি ভাবে হযরত উমর (রাযি.) দামেস্কের মহামারী উপদ্রুত এলাকায় প্রবেশ না করে তার দ্বার- প্রান্ত থেকে মদীনায় ফিরে আসাও অগ্রিম সতর্কতার ভিত্তিতে ছিল। এ ছাড়া আরো যে সকল হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এমন নানা ধরণের ওষুধের সন্ধান দিয়েছেন যেগুলো দ্বারা ভবিষ্যতে রোগ-ব্যাধি থেকে নিরাপদ থাকা যায় সেগুলো দ্বারাও তাই বুঝে আসে। যেমন-

عن سعد بن أبي وقاص –رضي الله تعالى عنه–، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اصطبح كل يومٍ تمرات عجوة لم يضره سمٌّ، ولاسحر ذلك اليوم إلى الليل. وقال غيره: سبع تمرات، يعنى حديث على.[١٦١]

---

১৬১ أخرجه البخارى فى الطب، باب الدواء بالعجوة للسحر، ٢: ٨٥٩، رقـــم الحـــديث: ٥٤٤٥، ٥٧٦٨، ٥٧٦٩، واللفظ له، ومسلم فى الأشربة، باب فضل تمر المدينة، ٢: ١٨١،

অর্থ- হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি প্রত্যহ সকালে সাতটি 'আজওয়া'[১৬২] খেজুর ভক্ষণ করবে তাকে ওই দিন কোন বিষ বা যাদু ক্ষতি করতে পারবে না।[১৬৩]

উক্ত হাদীস রোগের পূর্বে সতর্কতা মূলক রোগ না হওয়ার জন্য ওষুধ ব্যবহারের স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। এছাড়াও যে সকল হাদীসে রোগ-ব্যাধি ও অনিষ্টতা থেকে বাঁচার জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যে সমস্ত দু'আ-কালাম পড়ার কথা শিক্ষা দিয়েছেন সেগুলোও উক্ত মতের স্বপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ বহন করে।[১৬৪]

رقم الحديث: ٥٢٩٧، وأبوداؤد فى الطب، باب فى تمر العجوة، ٢: ٥٤١، رقم الحــديث: ٣٨٧٠.

১৬২ অতি উৎকৃষ্ট মানের একজাতীয় খেজুর।

১৬৩ বুখারী, খ. ২, পৃ. ৮৫৯, হাদীস নং ৫৪৪৫, ৫৭৬৮, ৫৭৬৯, মুসলিম, খ. ২, পৃ. ১৮১, হাদীস নং ৫২৯৭, আবূ দাউদ, খ. ২, পৃ. ৫৪১, হাদীস নং ৩৮৭০

১৬৪ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ، للشيخ عبد العزيز بن باز، حكم التداوى بالتعطيم قبل وقوع الداء، ٦: ٢٦–٢٧ .

মাজমূআয়ে ফাতাওয়া ওয়া মাকালাতুন মুতানাওবিআহ লিশ্ শাইখ আব্দিল আযীয বিন বায, খ. ৬, পৃ. ২৬-২৭

مرض الموت
মরণব্যাধি
Last Disease

রোগ যখন এ পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, রোগী নিজের স্বাভাবিক ও অভ্যাসগত প্রয়োজন মিটানোর জন্য ঘরের বাইরে যেতে অক্ষম হয়ে পড়ে। আর মহিলা ঘরের ভিতরেও নিজের প্রয়োজন পূরণ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে এবং আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে এক বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই এ রোগে মারা যায়। চাই সে শয্যাশায়ী হউক কিংবা না হউক। তখন এই রোগ 'مرض الموت' বা 'মরণব্যাধি' বলে গণ্য হবে। তবে যদি এ অবস্থায় এক বছর অতিবাহিত হয়ে যায় তাহলে আর এ রোগকে 'মরণব্যাধি' তথা 'مرض الموت' বলা হবে না। অতএব, এ অবস্থায় তার সকল কাজ কর্ম, এবং কৃত ও সম্পাদিত লেনদেন ও চুক্তি (Contract/Agreement) সুস্থ ব্যক্তির ন্যায় সম্পন্ন ও সংগঠিত হিসেবে বিবেচিত হবে।

হ্যাঁ, যদি উপরোল্লেখিত অবস্থা হওয়ার পর রোগ দিন দিন বাড়তে থাকে তাহলে এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পরেও এ রোগকে 'মরণব্যাধি' তথা 'مرض الموت' ধরা হবে এবং 'مرض الموت' বা 'মরণব্যাধি'র বিধি-বিধান তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

وفى المعراج: وسئل صاحب المنظومة عن حد مرض الموت، فقال: كثرت فيه أقوال المشايخ [١٦٥]، واعتمدنا فى ذلك على قول الفضل، وهو أن لا يقدر أن

---

165 المذكورة فى تبيين الحقائق للزيلعى، مبحث طلاق المريض، ٣: ١٤٣، ما نصه:

و هو الذى لا يقوم بحوائجه فى البيت،كما يعتاده الأصحاء، وإن كان يقدر على القيام بتكلف، والذى يقضى حوائجه فى البيت وهو يشتكى لا يكون قادراً، لأن الإنسان قل ما يخلو عنه.

يذهب فى حوائج نفسه خارج الدار، والمرأة لحاجتها داخل الدار لصعود السطح ونحوه، اهـــ . وهذا الذى جرى عليه فى باب طلاق المريض، وصححه الزيلعى.

أقول: والظاهر أنه مقيد بغير الأمراض المزمنة التى طالت، ولم يخف منها الموت كالفالج ونحوه، وإن صيرته ذا فراش ومنعته عن الذهاب فى حوائجه، فلا يخالف ما جرى عليه أصحاب المتون والشروح هنا، تأمل .[١٦٦]

وفي مجلة الأحكام العدلية (مادة ١٥٩٥) : مرض الموت هو المرض الذى يخاف فيه الموت فى الأكثر الذى يعجز المريض عن رؤية مصالحه الخارجة عن داره إن كان من الذكور، ويعجز عن رؤية المصالح الداخلة فى داره إن كان من الإناث، ويموت على ذلك الحال قبل مرور سنة، صاحب فراش[١٦٧] كان أو لم يكن، وإن امتد مرضه دائما على حال ومضى عليه سنة يكون فى حكم الصحيح، وتكون تصرفاته كتصرفات الصحيح حاله اعتبارا من وقت التغير إلى الوفاة مرض موت.

وقيل:إذا كان يخطى ثلاث خطوات من غير أن يستعين بغيره فهو صحيح حكما،وإلا فهو مريض.

والصحيح أن من عجز عن قضاء حوائجه خارج البيت فهو مريض، وإن أمكنه القيام بها فى البيت، إذ ليس كل مريض يعجز عن القيام بها فى البيت، كالقيام للبول والغائط.

وقيل: المريض من لايقدر على أداء الصلاة جالساً.

وقيل: من لايقدر أن يقوم إلا أن يقيمه غيره.

وقيل: من لايقدر على المشى إلا أن يهارى بين اثنين. (دلاور حسين)

166 رد المحتار، كتاب الوصايا، ١٠: ٣٥٣، ٣٥٤، مكتبة زكريا ديوبند، الهند .

167 وانظر أيضا مجلة الأحكام العدلية، المادة: ٧٣، والفقه الإسلامى وأدلته، ٤: ٢٩٧٨، ٦: ٤٥٠٣، ١٠: ٧٥٧٤، فى حكم تبرعات المريض من كتاب الوصايا. (دلاور حسين)

داء نقص المناعة المكتسبة أو الإيدز
এইচ.আই.ভি/এইড্স
HIV/AIDS

যে ভাইরাস (জীবাণু) দ্বারা এইড্স রোগ সৃষ্টি হয় তাকে Human Immounodeficiency Virus / فيروس نقص المناعة البشرية [১৬৮] সংক্ষেপে H.I.V. বলা হয়। মানব দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হারানোর জন্য দায়ী ভাইরাসকে H.I.V. (এইচ.আই.ভি) বলা হয়।

তেমনিভাবে ইংরেজী AIDS (এইড্স) শব্দটি Acquired immune deficiency syndrome or acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) [داء نقص المناعة المكتسبة أو الإيدز] [১৬৯] (একোয়ার্ড ইমিউন ডিফিশনসি সিনড্রম) এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এর অর্থ- শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হারানোর আলামত বা লক্ষণ। এ রোগের কোন চিকিৎসা এখনও আবিস্কার হয়নি।

H.I.V. (এইচ.আই.ভি) এর ভাইরাস/জীবাণু রক্তের সাথে মিশে রক্তের শ্বেত কনিকাগুলোকে মেরে ফেলে। এতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধ্বংস হয়ে যায়। যার দরুন বিভিন্ন রকম উপসর্গ বা রোগের আলামত দেখা দেয়। ফলে যে কোন সাধারণ রোগেই এইড্স আক্রান্ত ব্যক্তি মারা যেতে পারে এবং মারা যায়।

এইড্স এর উৎপত্তি

১৯৮১ সালে সর্ব প্রথম এ ভাইরাসটি ধরা পড়ে। ডাক্তার ও বিজ্ঞানীদের মতে অবৈধ যৌন মিলন থেকে এর উৎপত্তি। তাদের মতে সমকামিতাই (পুরুষে পুরুষে হোক কিংবা নারী নারীর সাথে হোক) এর জন্য বেশি দায়ী। তাই দেখা গেছে যেসব সমাজে অবাধ যৌনাচার ও ব্যভিচার চলে তাদের উপরই এ অভিশাপ বেশি নেমে এসেছে। পক্ষান্তরে,

---

168 From Wikipedia, June 2011.
169 From Wikipedia, June 2011.

যে সমস্ত এলাকায় ইসলামী মূল্যবোধ ও রীতি-নীতি মেনে চলা হয় ঐ সমস্ত এলাকা এখনও এ অভিশাপ থেকে মুক্ত আছে।

এ রোগের উপসর্গ বা লক্ষণ

এইচ.আই.ভি/এইড্‌স সংক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে অধিকাংশ রোগীর কোন লক্ষণ বা উপসর্গ থাকে না। এ ভাইরাসটি দেহের কোষে দ্রুত বিস্তার লাভ করার ফলে কিছুদিন পর যেসব উপসর্গ দেখা দেয় তার মধ্য থেকে কিছু হল:

১. অস্বাভাবিকভাবে দেহের ওজন কমতে থাকা, দু'মাসের মধ্যে এক দশমাংশের বেশি হ্রাস পাওয়া।
২. এক মাসের বেশি সময় ধরে সর্বক্ষণ কিংবা থেমে থেমে জ্বর থাকা।
৩. এক মাসের বেশি সময় ধরে ডায়রিয়া থাকা।
৪. এক মাসের বেশি সময় ধরে ক্রমাগত কাশি হওয়া।
৫. ফুসফুসে ঘা বা সংক্রমণ হওয়া।
৬. সারা শরীরে চুলকানি হওয়া।
৭. ত্বকে সংক্রমণ সহ Kapasis Sarcoma নামক কঠিন চর্মরোগ হওয়া।
৮. বার বার মুখে, জিহ্বায় কিংবা গলায় চক্রাকার সংক্রমণ (Candidiasis) হওয়া।
৯. বগলের নিচে ও রানের মাঝখান সহ সারা দেহের লসিকা গ্রন্থি (Iymph Nodes) ফুলে যাওয়া।
১০. শরীর ক্রমশ শুকিয়ে গিয়ে কাঁপতে থাকা ইত্যাদি।

এইড্‌স এর ভয়াবহতা

এইড্‌স একবার হলে আর বাঁচার আশা নেই। কারণ এ পর্যন্ত এর কোন চিকিৎসা আবিস্কার হয়নি। ২/৪ বছরের মধ্যেই ধুকে ধুকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

এইড্স জীবাণু কোথায় থাকে

১. মানুষের বীর্যে (মনী)
২. বীর্যপাতের আগে নির্গত পিচ্ছিল রসে (মযী)
৩. রোগ বশত: উত্তেজনা বিহীন নির্গত পিচ্ছিল রসে (ওয়াদী)
৪. যোনি নিঃসৃত রসে
৫. রক্তে
৬. প্রস্রাবে
৭. অশ্রুতে
৮. ও মুখের লালাতে

তবে শেষ তিন প্রকারে এইড্স জীবাণু খুবই কম থাকে যা রোগ সংক্রমণ ঘটাতে পারে না।

এইড্স কিভাবে ছড়ায়

১. পুরুষে পুরুষে যৌনমিলনে
২. নারীর সাথে নারীর যৌন মিলনে
৩. স্বামী পর নারীর সাথে দৈহিক মিলন করলে
৪. স্ত্রী পর পুরুষের সাথে দৈহিক মিলন করলে
৫. পিতা-মাতার মাধ্যমে অর্থাৎ পিতা-মাতার মধ্যে এইড্স থাকলে তা তাদের সন্তানদের মধ্যে সংক্রমিত হয়।
৬. সংক্রমিত ব্যক্তির দেহে ব্যবহৃত ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ বা যন্ত্রপাতির মাধ্যমে (অর্থাৎ একই সিরিঞ্জ একাধিক ব্যক্তি ব্যবহার করলে একজন থেকে অপরের মধ্যে সংক্রমিত হয়।
৭. সংক্রমিত রক্তের মাধ্যমে (অর্থাৎ এইড্স আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত গ্রহণের মাধ্যমে)
৮. মদ সেবনের মাধ্যমে। মাদক সেবীরা সাধারণত উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করে থাকে। মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা অবাধ যৌনাচারে গা ভাসিয়ে দিয়ে থাকে তাই তাদের এইচ.আই.ভি (HIV) তে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি।

৯. পতিতালয়ের মাধ্যমে। অর্থাৎ পতিতালয়ে যাতায়াত কারীদের মাধ্যমে এ মরণঘাতি রোগ ছড়িয়ে পড়ে।

এইড্‌স এ ঝুঁকিপূর্ণ

১. পতিতা
২. যৌনকর্মী
৩. বহুগামী পুরুষ
৪. বহুগামী নারী
৫. মদ্যপায়ী
৬. ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে মাদক দ্রব্য গ্রহণকারী ব্যক্তি
৭. সমকামী পুরুষ
৮. সমকামী নারী
৯. উচ্ছৃঙ্খল যৌন জীবনযাপনে অভ্যস্ত পুরুষ-নারী

وقاية الإيدز
এইড্‌স প্রতিরোধ
Aids Prevention

যেমনিভাবে এখন পর্যন্ত এইড্‌স রোগের কোন চিকিৎসা আবিস্কার হয়নি তেমনিভাবে এইড্‌স থেকে মুক্ত থাকার জন্যও অদ্যাবধি কোন প্রতিষেধক টিকা আবিস্কার হয়নি। তাই এর প্রতিরোধই হচ্ছে একমাত্র প্রতিকার। অতএব, আল্লাহকে ভয় করে ড্রাগ বা মাদক ব্যবহার বন্ধ করে (No to drug), সমকামিতা (চাই পুরুষে পুরুষে হোক কিংবা নারী নারীর সাথে) বহুগামিতা, অবাধ যৌনাচার, অবৈধ যৌন মিলন বা ব্যভিচার পরিহার করে ইসলামী বিধি-বিধান ও অনুশাসন মেনে চললে এ অভিশপ্ত ভাইরাস থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে। আল্লাহ পাক বলেনঃ

ياايها الذين امنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون .[١٧٠]

অর্থ- হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, প্রতিমা ও ভাগ্য নির্ধারক তীর সমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কাজ। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাক, এতে করে তোমরা সফলকাম হবে।
[১৭১] আল্লাহ পাক আরও বলেনঃ

ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا .[١٧٢]

অর্থ- তোমরা ব্যভিচারের ধারে কাছেও যেও না। কারণ, এটি নিঃসন্দেহে সুস্পষ্ট অশ্লীলতা এবং মন্দ পথ।
[১৭৩] বিশ্ববাসী এখন বুঝতে পেরেছে যে, অবৈধ যৌনমিলন/ব্যাভিচার কত বড় জঘন্য পন্থা ও এর ভয়াবহতা কত বেশি! এ পথ কত পঙ্কিল! এ পথ ধরেই এসেছে ভয়াবহ এইড্‌স নামক মৃত্যুর পরওয়ানা!
আল্লাহ পাক বলেনঃ

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن .[١٧٤]

অর্থ- হে নবী বলুনঃ আমার রব প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল অশ্লীল কাজকে হারাম করে দিয়েছেন।[১৭৫]

তেমনিভাবে সমকামিতাও (চাই পুরুষে পুরুষে হোক কিংবা নারী নারীতে) সম্পূর্ণ হারাম।

আল্লাহ পাক বলেনঃ

---

170 سورة المائدة، آية: ٩٠ .

১৭১ সূরা মায়িদাহ, আয়াত: ৯০

172 سورة بنى إسرائيل، آية: ٣٢.

১৭৩ সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ৩২

174 سورة الأعراف، آية : ٣٣ .

১৭৫ সূরা আল আ'রাফ, আয়াত: ৩৩

ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العلمين، إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل، وتأتون فى ناديكم المنكر فما كان جواب قومه الا أن قالوا ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين.[176]

অর্থ- স্মরণ কর লূতকে, তিনি যখন তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেনঃ তোমরা এমন এক অশ্লীল কাজ শুরু করলে যা তোমাদের পূর্বে সৃষ্টি জগতের কেউ করেনি। তোমরা পুরুষে উপগত হচ্ছ, রাহাজানি করছ এবং নিজেদের মজলিসে (ক্লাবে) প্রকাশ্যে সকলের সামনে গর্হিত কাজ করছ (সমকামিতায় লিপ্ত হচ্ছ)। উত্তরে তাঁর সম্প্রদায় বললঃ যদি তুমি সত্যবাদী হও তাহলে আমাদের উপর আল্লাহর আযাব নিয়ে আস।[১৭৭]

অতঃপর তাদের উপর আযাব আসল যে, তাদের সম্পূর্ণ বস্তিকে উল্টোকরে তাদের চাপা দিয়ে ধ্বংস করে দেয়া হল। সে ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদ আজকের ডেড সী (Dead Sea) বা মরুসাগর (البحر الميت)। যেখানে আজও কোন প্রাণী জীবিত থাকতে পারছে না।

আল্লাহ পাক বলেনঃ

ولقد تركنا آية بينة لقوم يعقلون.[১৭৮]

অর্থ- আমি বুদ্ধিমান লোকদের জন্য এতে সুস্পষ্ট নিদর্শন রেখে দিয়েছি।[১৭৯]

মরুসাগর সম্পর্কে কিছু শিক্ষণীয় কথা

মিসরী গবেষক আবদুল ওয়াহ্হাব আন নাজ্জার লিখেনঃ এ সাগরটি এভাবেই জন্মে যে, হযরত লূত (আ.) এর জাতির উপর আযাব অবতীর্ণ হয়, তাদের বস্তি উল্টে দেয়া হয়, এতে মরু সাগরের জন্ম হয়। অন্যথা

---

176 سورة العنكبوت، آية : ٢٨، ٢٩ .

১৭৭ সূরা আনকাবূত, আয়াত: ২৮,২৯

178 سورة العنكبوت، آية: ٣٥ .

১৭৯ সূরা আনকাবুত, আয়াত: ৩৫

হযরত লূত (আ.) এর পূর্বে এখানে কোন সাগর ছিল না। এ সাগর বস্তি উল্টে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বিধায় অন্য কোন বড় সাগরের সাথে এর কোন যোগাযোগ নেই। অসাধারণ ঘটনাই এর উৎপত্তির মূল কারণ। এজন্যই প্রাচীন কাল থেকে আরবরা একে বুহাইরায়ে লূত তথা লূত সাগরও বলে আসছে। ছোট এ সাগরটি পঞ্চাশ মাইল দীর্ঘ এবং এগার মাইল প্রশস্ত। এর মোট আয়তন পাঁচ শত একান্ন বর্গমাইল।

মরুসাগরের কতিপয় বৈশিষ্ট

১. বড় কোন সাগরের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। আয়তনের দিক থেকে এটিকে একটি ঝিল বলাই যথার্থ, কিন্তু এর পানি নিখাদ সামুদ্রিক পানি হওয়ায় একে বাহ্‌র (সাগর) বা বুহাইরা (ছোট সাগর) বলা হয়।

২. এ সাগরটির পিঠ অন্যান্য সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৩০০ (তেরশত) ফুট নীচু।

৩. এ সাগরের পানি অন্যান্য সাগরের পানির তুলনায় অনেক গাঢ়।

৪. এ সাগরের লবনাক্ততা অন্যান্য সাগরের তুলনায় অনেক বেশি। অন্যান্য বড় বড় সাগরে চার থেকে ছয় শতাংশ লবনাক্ততা থাকে, পক্ষান্তরে মরু সাগরের পানিতে লবণের গড় পরিমাণ তেইশ থেকে পঁচিশ শতাংশ।

৫. এ সাগরের পানিতে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করলে দেহে এক প্রকার রাসায়নিক উপাদান চিমটে থাকে যা দূর করার জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হয়। সাধারণ পানি দ্বারা বারংবার ধুলেও সহজে এ উপাদান দেহ থেকে দূর হয় না।

৬. এ সাগরে মাছ সহ অন্য কোন প্রাণী জীবিত থাকে না। বরং পানিতে পড়ার সাথে সাথেই মরে যায়।

৭. এ সাগরে কোন উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় না।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সাধারণত এর ব্যাখ্যা এভাবে করা হয় যে, অস্বাভাবিক লবনাক্ততার কারণে এরূপ হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে ইহা হযরত লূত (আ.) এর জাতির উপর অবতীর্ণ আযাবের প্রতিক্রিয়া হওয়া

অস্বাভাবিক কিছু নয়। এ সাগরের উক্ত বৈশিষ্টের কারণেই একে মরু সাগর বলা হয়। এর এ নাম গ্রীকদের যুগ থেকে চলে আসছে।

৮. মরু সাগর অঞ্চলটি ভূমন্ডলের সর্বনিম্ন অঞ্চল। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পৃথিবীর বড় বড় সাগরগুলোর পৃষ্ঠ থেকে মরু সাগরের পৃষ্ঠ তেরশত ফুট নীচে। সমগ্র বিশ্বে সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে এত নীচু আর কোন অঞ্চল নেই। তাইতো আল্লাহ্ তা'আলা কওমে লূত এর বস্তি সমূহের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে ইরশাদ করেছেনঃ

فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها .[১৮০]

অর্থ- অবশেষে যখন আমার হুকুম আসল তখন উক্ত জনপদের উপরকে নিচে করে দিলাম।[১৮১] এর অর্থ এও হতে পারে যে, উক্ত জনপদকে উল্টে দিলাম। আবার এও হতে পারে যে, আমি পৃথিবীর উচ্চাঞ্চলকে নিম্নাঞ্চলে পরিণত করে দিলাম।

আল্লাহু আকবার! এ থেকে এক দিকে পবিত্র কুরআনের অলৌকিকতা প্রকাশ পায় যে, চৌদ্দশত বছর পূর্বে এমন এক ভৌগলিক বাস্তবতা সম্পর্কে আলোকপাত করেছে যা বহু শতাব্দী পর ভূগোল বিশারদদের নিকট স্পষ্ট হয়েছে এবং এমনভাবে তা উপস্থাপন করা হয়েছে যে, সে যুগের লোকদেরও এ বক্তব্যের সুস্পষ্ট অর্থ অনুধাবন করতে বিন্দুমাত্র জটিলতা দেখা দেয়নি।

অপরদিকে এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, উক্ত জাতির উপর আপতিত আযাবে ইলাহীর এ ঘটনা কেয়ামত পর্যন্ত দূরদর্শীদের জন্য শিক্ষার উপকরণ হয়ে থাকবে। জনপদ উল্টে গেছে। অধিবাসী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। যুগের বিস্ময়রূপে একটি সাগর আত্মপ্রকাশ করেছে। আর অদ্যাবধি এ ভূমি বিশ্বের নিম্নতম ভূমি হয়ে আছে।

আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

---

180 سورة هود، آية: ٨٢ .

১৮১ সূরা হূদ, আয়াত: ৮২

فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا وكنا لنحن الوارثين .[182]

অর্থ- হ্যাঁ, এ হল তাদের বাসস্থান, যা তাদের পরে আর আবাদ হয়নি তবে সামান্য। আর আমিই তার উত্তরাধিকারী ছিলাম।[১৮৩]

সহস্র বছর পূর্বে হযরত লূত (আ.) এ ভূখন্ডে অবিচলতার পর্বতরূপে তার বেহাঙ্গাম জাতির সংশোধনের চেষ্টা চালিয়েছিলেন, যারা মানবতার মূল্যকে আঁচড়ে বিকৃত করে নিজেদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ সমকামীতার কাজে সমগ্র বিশ্বে দূর্নাম কুড়িয়েছে। এমনকি ঘৃণিত সে কাজের নামই ঐ জাতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায় ও এ কাজকে “লাওয়াতাত” বলা হয়। এমন মনে হয় যেন তাদের এ চারিত্রিক অধঃপতনকে কেয়ামত পর্যন্ত আগত মানুষের জন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য একটি রূপ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাদের এ ঘৃণিত ও অতি নিম্ন কর্মের কারণে তাদের গোটা বসতিকে বিশ্বের সর্বনিম্ন অঞ্চলে পরিণত করে দেয়া হয়েছে।[১৮৪]

এতে স্পষ্ট প্রতিয়মান হয় যে, এ কাজটি (সমকামীতা) কত ঘৃনিত ও নিম্নমানের। একমাত্র এ ঘৃণিত কাজটি পরিহার করার মাধ্যমেই বিশ্ববাসী মরণঘাতি এইড্স থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে।

الحكم الشرعي المتعلق بالإيدز أو داء نقص المناعة المكتسبة
এইচ.আই.ভি (HIV)/এইড্স (AIDS) সংক্রান্ত শরয়ী বিধান
The Religious Judgment of AIDS/HIV

এ যাবত এইড্স (AIDS) এর পরিচয়, উৎপত্তি, লক্ষণ, ভয়াবহতা, কিভাবে ছড়ায়, এইড্স জীবাণু কোথায় থাকে, এইড্স প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়াদিকে চিকিৎসাবিদ্যার আলোকে আলোকপাত করা হয়েছে। এখন শরীআতের দৃষ্টিতে এইড্স ও তৎসংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান পেশ করা হলঃ

---

182 سورة القصص، آية: ٥٨ .

১৮৩ সূরা কাছাছ, আয়াত: ৫৮

184 জাহানে দীদাহ্, পৃ. ২০৭-২১২ (সংক্ষেপিত), যমযম বুক ডিপো, দেওবন্দ।

এইড্‌স ও তৎসংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান সমূহ

১। এইড্‌স আক্রান্ত ব্যক্তিকে চাকরি/পদ বা দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দান বা বরখাস্ত করার বিধান।

২। অন্যের শরীরে ইচ্ছাকৃত এইচ.আই.ভি (HIV)/এইড্‌স (AIDS) সংক্রমণ করানোর বিধান।

৩। এইড্‌স আক্রান্ত স্বামী/স্ত্রীর পরস্পরের হক-অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্য সমূহের বিধান। যথা-

(ক) এইড্‌স আক্রান্ত মহিলার গর্ভপাত (Abortion) করার বিধান।

(খ) এইড্‌স আক্রান্ত মায়ের জন্য তার দুগ্ধপোষ্য এইড্‌সমুক্ত সুস্থ সন্তানকে দুগ্ধপান করানোর বিধান।

(গ) স্বামী বা স্ত্রীর কোন একজনের এইড্‌স আক্রান্ত হওয়ার কারণে অপরজনের বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার সংক্রান্ত বিধান।

(ঘ) এইড্‌স আক্রান্ত ব্যক্তির স্বামী-স্ত্রী সূলভ আচরণ এবং যৌন মিলনের বিধান।

৪। এইড্‌স কী مرض الموت বা মরণ ব্যাধি?

উপরোক্ত বিধি-বিধান সমূহের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

এক. এইড্‌স আক্রান্ত ব্যক্তিকে চাকরি/পদ বা দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দান বা বরখাস্ত করার বিধান।

বর্তমান চিকিৎসা বিদ্যার সকল থিউরী এ যাবত এ কথা নিশ্চিতভাবে ব্যক্ত করে যে, এক সাথে চলাফেরা, উঠা-বসা, কথা-বার্তা, শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ-নির্গমন, পোকা-মাকড় অথবা একত্রে পানাহার, গোসল, সাঁতার কিংবা খাদ্যদ্রব্যসহ বিভিন্ন ব্যবহারিক পাত্র ইত্যাদি দৈনন্দিন স্বাভাবিক জীবন যাপনের দ্বারা এইচ.আই.ভি (HIV)/এইড্‌স (AIDS) এর ভাইরাস সৃষ্টি হয় না এবং ছড়ায় না, সংক্রমণও হয় না। বরং এইচ.আই.ভি (HIV)/এইড্‌স (AIDS) এর ভাইরাস কিছু মৌলিক

অবস্থায় ছড়ায় বা সংক্রমণ হয়। যা পূর্বে "এইড্স কিভাবে ছড়ায়" শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুতরাং এইড্স আক্রান্ত ব্যক্তিদের থেকে যেসব ক্ষেত্রে এইড্স সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা বা আশংকা থাকে না সেসব ক্ষেত্রে এইড্স আক্রান্ত ব্যক্তিকে তার চাকরি/পদ ও দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দান বা বরখাস্ত করা এবং তার এইড্সমুক্ত সহকর্মীদের থেকেও দূরে সরিয়ে রাখা শরীআতের দৃষ্টিতে ওয়াজিব বা অত্যাবশ্যকীয় হবে না।

দুই. অন্যের শরীরে ইচ্ছাকৃত এইচ.আই.ভি (HIV)/এইড্স (AIDS) সংক্রমণ করানোর বিধান।

অন্যের শরীরে ইচ্ছাকৃত এইচ.আই.ভি (HIV)/এইড্স (AIDS) সংক্রমণ করানো হারাম। যেভাবেই হোক না কেন তা কবীরা গুনাহ্ ও মারাত্মকতম অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। যার দরুন সে পার্থিব শাস্তি যোগ্য হবে। তবে এই শাস্তি অপরাধের আকার, প্রচণ্ডতা, জনগণ ও সমাজের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি এবং প্রভাব বিস্তারের অনুপাতে ভিন্ন ভিন্ন হবে।

যদি ইচ্ছাকৃত সংক্রমণকারীর উদ্দেশ্য হয় সমাজে এই মরণঘাতি রোগের প্রচার-প্রসার করা তাহলে তার এই কাজ حرابة (বিদ্রোহ) ও إفساد فى الارض (দেশে সন্ত্রাস ও বিশৃংখলা সৃষ্টি) এরই অন্যতম একটা প্রকার হিসেবে গণ্য হবে। যাকে কুরআনুল কারীমের ভাষায় "আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-সংগ্রাম ও পৃথিবীতে সন্ত্রাস, বিশৃংখলা সৃষ্টি" বলা হয়েছে। এমন ব্যক্তির শাস্তি কুরআনুল কারীমেঃ

১। হত্যা;

২। ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো;

৩। হস্ত-পদ বিপরীত দিকে থেকে কেটে ফেলা;

৪। অথবা দেশ থেকে বহিস্কৃত করা; ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে।

কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছেঃ

إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم .[১৮৫]

অর্থ- "যারা আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূল (সা.) এর সাথে সংগ্রাম করে এবং দেশে হাঙ্গামা, সন্ত্রাস ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে, অথবা শুলীতে চড়ানো হবে, অথবা তাদের হস্ত-পদ সমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে, কিংবা দেশ থেকে বহিস্কার করা হবে।"[১৮৬]

অতএব যদি সংক্রমণকারীর উদ্দেশ্য এ হয় যে, সমাজে এ মরণঘাতি রোগের প্রচার-প্রসার হউক তাহলে তার উপরও কুরআনে কারীমে অবতীর্ণ উক্ত চার প্রকারের শাস্তির যে কোন এক প্রকার কার্যকর করা যাবে।

আর যদি ইচ্ছাকৃত সংক্রমণের দ্বারা উদ্দেশ্য হয়, কোন নির্দিষ্ট এক ব্যক্তিকে সংক্রমিত করা। আর ঐ ব্যক্তি সংক্রমিতও হয়ে পড়েছে কিন্তু এখনও মারা যায়নি, তাহলে ঐ ইচ্ছাকৃত সংক্রমণকারী বিচারকদের অভিমত সাপেক্ষে যথাযথ শাস্তিযোগ্য হবে। আর ঐ সংক্রমিত ব্যক্তি মারা গেলে তাকে হত্যার শাস্তি প্রয়োগ করা বিবেচনাধীন থাকবে।

যদি ইচ্ছাকৃত সংক্রমণের দ্বারা কোন নির্দিষ্ট এক ব্যক্তিকে সংক্রমিত করা উদ্দেশ্য হয়, কিন্তু ঐ ব্যক্তি সংক্রমিত হয়নি তাহলেও সে যথাযথ শাস্তিযোগ্য হিসেবে গণ্য হবে।

তিন. এইড্‌স আক্রান্ত গর্ভবতী মহিলার গর্ভপাত (Abortion) করার বিধান।

এইড্‌স আক্রান্ত গর্ভবতী মহিলার এইড্‌স এর ভাইরাস দ্বারা তার গর্ভস্থ বাচ্চা সাধারণত রূহ (প্রাণ) আসার পরেই কিংবা প্রসবের প্রাক্কালেই

---

185 سورة المائدة، آية: ٣٣ .

১৮৬ সূরা মায়িদাহ, আয়াত: ৩৩

সংক্রমিত হয়। সুতরাং শরীআতের দৃষ্টিতে এই কারণে গর্ভপাত করা জায়েয হবে না। কারণ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে তার রোগের কারণে হত্যা করার কোন যৌক্তিকতা নেই।

চার. এইড্স আক্রান্ত মায়ের এইড্সমুক্ত সুস্থ সন্তানকে লালন-পালন ও দুগ্ধপান করানোর বিধান।

চিকিৎসা বিদ্যার থিউরী অনুযায়ী এইড্স আক্রান্ত মায়ের এইড্সমুক্ত সন্তানকে লালন-পালন ও দুগ্ধপান করানোর দ্বারা এইড্স সংক্রমণ হওয়াটা নিশ্চিত নয়, এটা স্বাভাবিক জীবন যাপনের মত। সুতরাং শরীআতের দৃষ্টিতেও এইড্স আক্রান্ত মায়ের এইড্সমুক্ত সুস্থ সন্তানকে লালন-পালন ও দুগ্ধপান করানোর কোন বাধা-নিষেধ নেই। যতক্ষণ না চিকিৎসা বিদ্যার থিউরী অনুযায়ী নিষেধ না হবে।

পাঁচ. স্বামী-স্ত্রীর দু'জনের মধ্য হতে এইড্সমুক্ত স্বামী বা স্ত্রীর কোন একজনের এইড্স আক্রান্ত স্ত্রী বা স্বামীর থেকে বিচ্ছেদের অধিকার।

স্ত্রীর জন্য এইড্স আক্রান্ত স্বামীর থেকে বিচ্ছেদ চাওয়ার অধিকার রয়েছে। কেননা যৌন মিলনে ও স্বামী-স্ত্রী সূলভ আচরণে মরণঘাতি এইড্স এর সংক্রমণ ঘটে। যা একবার হলে মৃত্যু নিশ্চিত। অতএব, সে তার সতর্কতা অবলম্বনের অধিকারকে কাজে লাগাতে পারবে।

তেমনিভাবে স্ত্রী আক্রান্ত হলে স্বামীর জন্যও ঐ স্ত্রী থেকে বিচ্ছেদের অধিকার থাকবে।

ছয়. এইড্স আক্রান্ত ব্যক্তির স্বামী-স্ত্রী সূলভ আচরণ ও যৌন মিলনের অধিকার।

এইড্স এর কারণে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার থাকলে স্বামী-স্ত্রী সুলভ আচরণ ও যৌন মিলন থেকে বিরত থাকার অধিকার থাকা আরও যুক্তিসঙ্গত।

সাত. মরণঘাতি এইড্‌স কি مرض الموت (মরণব্যাধি) হিসেবে বিবেচিত হবে?

যখন এইড্‌স এর লক্ষণ বা উপসর্গ সমূহ পূর্ণভাবে প্রকাশ পাবে ও পাওয়া যাবে এবং এইড্‌স আক্রান্ত ব্যক্তিকে স্বাভাবিক ও অভ্যাসগত প্রয়োজন মিটানোর জন্য ঘরের বাইরে যাওয়া থেকে অক্ষম করে দিবে তখন শরীআতের দৃষ্টিতে এইড্‌স কে مرض الموت বা মরণব্যাধি হিসেবে গণ্য করা হবে।[১৮৭]

مسئلة التداوي بالمحرم
হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসার বিধান

The Judgment of Treatment by Prohibited

হালাল বস্তু দ্বারা চিকিৎসা সম্ভব হলে হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা জায়েয নেই। হালাল বস্তু দ্বারা চিকিৎসা সম্ভব না হলে হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা বৈধ। তবে এর জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে। যথা:

১. মুসলমান বিজ্ঞ ডাক্তারগণ (যা "বিজ্ঞ ডাক্তারের পরিচয়" শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে) একথা বলতে হবে যে, কোন হালাল বস্তু দ্বারা এ রোগের চিকিৎসা সম্ভব নয়।

২. এ হারাম বস্তুই তার জন্য একমাত্র চিকিৎসা। তখন চিকিৎসার জন্য হারামের আশ্রয় গ্রহণ করা জায়েয।

আদ্দুররুল মুখতারে আছে,

---

187 قرارات مجلة مجمع الفقه الإسلامى، مرض نقص المناعة المكتسب (الأيدز) العـــدد: ٩، الجزء: ٤، الصفحة: ٦٩٣، رقم القرار: ٩٨/٧/٩٤، ص: ٤٧ .

ক্বারারাতু মাজাল্লাতি মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী, জেদ্দা, সংখ্যা. ৯, খ. 8, পৃ. ৬৯৩, ক্বারার নং ৯৪/৭/৯৮, পৃ. ৪৭

يرخص (أي التداوي بالمحرم) إذا علم فيه الشفاء ، و لم يعلم دواء

অর্থ: হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করা বৈধ। যদি এর মধ্যে আরোগ্য আছে বলে জানা যায় এবং এ ছাড়া অন্য কোন ওষুধ জানা না থাকে।[১৮৯]

একটি প্রশ্ন ও তার নিরসন

হাদীস শরীফে হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, হারাম বস্তুর মাঝে রোগ ছাড়া কোন চিকিৎসা নেই তাহলে ডাক্তার এ কথা বলবে কিভাবে যে, এ হারাম বস্তুর মাঝেই তার একমাত্র চিকিৎসা? অতএব, তা বৈধ হয় কিভাবে? যেমন-

عن علقمة بن وائل عن أبيه، ذكر طارق بن سويد أو سويد بن طارق– رضي الله تعالى عنه–، سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه، ثم سأله، فنهاه، فقال له:

يا نبى الله! إنها دواء، قال النبى صلى الله عليه وسلم: لا، ولكنها داء.[١٩٠]

অর্থ- হযরত ওয়ায়িল থেকে বর্ণিত, তারিক ইবনে সুয়াইদ অথবা সুয়াইদ ইবনে তারিক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে মদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তা পান করতে নিষেধ করেন। পুনরায় জিজ্ঞেস করলে তিনি তা পান করতে নিষেধ করে দেন। অতপর তিনি

---

১৮৮ الدر المختار مع رد المحتار ، كتاب الطهارة ، باب المياه قبيل فصل فى البئر ، ١: ٢١٠ .

১৮৯ আদ্দুররুল মুখতার [ফাতাওয়ায়ে শামী সংলগ্ন], খ. ১, পৃ. ২১০

১৯০ أخرجه مسلم فى الأشربة، باب تحريم التداوى بالخمر، ٢: ١٦٣، رقم الحديث: ٥١٠٣، والترمذى فى الطب، باب ماجاء فى كراهية التداوى بالمسكر، ٢: ٢٤، رقم الحديث: ٢١١٩–٢١٢٠ ، وأبوداؤد فى الطب، باب فى الأدوية المكروهة، ٢: ٥٤١، رقم الحديث: ٣٨٦٨ .

বললেন- হে আল্লাহর নবী! এটি একটি ওষুধ। উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ না, (এটি ওষুধ নয়) বরং অসুখ।[১৯১]

عن أبي الدرداء –رضي الله تعالى عنه–، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تتداووا بحرام.[١٩٢]

অর্থ- হযরত আবূ দারদা (রাযি.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ তা‘আলাই রোগ ও তার চিকিৎসা সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক রোগের প্রতিষেধকও সৃষ্টি করেছেন। অতএব তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ কর। তবে হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করবে না।[১৯৩]

এ ছাড়া আরো বহু হাদীস দ্বারা এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, হারাম বা অবৈধ বস্তুর মধ্যে চিকিৎসা নেই। তাহলে হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা বৈধ হয় কিভাবে?

উত্তর: হাদীসগুলোর অর্থ এই যে, হালাল চিকিৎসা থাকা অবস্থায় হারামের মধ্যে চিকিৎসা থাকে না, অতএব তখন হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করা জায়েয নেই। কিন্তু হালাল চিকিৎসা না থাকলে তখন হারাম আর হারাম থাকে না, অতএব তার মধ্যে তখন চিকিৎসাও চলে আসে। তাই এ অপারগ অবস্থায় হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা বৈধ হয়ে যায়। যেমন- জীবনরক্ষার্থে ক্ষুধা অবস্থায় হালাল কোন খাদ্য না থাকলে মৃত ও শূকরের গোস্ত খাওয়াও হালাল হয়ে যায়। কেননা, আল্লাহ তা‘আলা হালাল খাদ্য না থাকা অবস্থায় মৃত্যুমুখী ক্ষুধার্ত ব্যক্তির জন্য হারামকে হালাল করেছেন। তেমনিভাবে হারাম বস্তুতে (হারাম থাকা অবস্থায়) আমাদের

---

১৯১ মুসলিম, খ.২, পৃ. ১৬৩, হাদীস নং ৫১০৩, তিরমিযী, খ. ২, পৃ. ২৪, হাদীস নং ২১১৯, ২১২০, আবূ দাউদ, খ. ২, পৃ. ৫৪১, হাদীস নং ৩৮৬৮

192 أخرجه أبوداؤد فى الطب، باب فى الأدوية المكروهة، ٢: ٥٤١، رقم الحديث: ٣٨٦٤

.

১৯৩ আবূ দাউদ, খ. ২, পৃ. ৫৪১, হাদীস নং ৩৮৬৪

জন্য চিকিৎসা থাকে না। অপারগ অবস্থায় হারাম বস্তু আর হারাম থাকে না বরং হালাল হয়ে যায়। সুতরাং এ অবস্থায় এর মধ্যে চিকিৎসা থাকার কথা হাদীসে নিষেধ করা হয়নি।[১৯৪]

এ ছাড়াও হাদীসে উরাইনা (حديث عرينة) উক্ত মতের স্বপক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। হাদীসটি নিম্নরূপঃ

عن أنس بن مالك –رضي الله تعالى عنه–، أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فاجتووها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة، فتشربوا من ألبانها و أبوالها.[١٩٥]

অর্থ- হযরত আনাস বিন মালিক (রাযি.) থেকে বর্ণিত, একবার উরাইনা গোত্রের কিছু লোক মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে আগমন করে। কিন্তু মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূল (স্বাস্থ্য সম্মত) না হওয়ায় (তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে)। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেনঃ তোমরা যদি চাও, সাদাকার উটের নিকট চলে যাও (যেগুলো মদীনা থেকে ছয় মাইল দূরে

---

১৯৪ تكملة فتح الملهم،كتاب القسمة، باب حكم المحاربين والمرتدين، مسألة التداوى بالمحرم، ٢: ٣٠٤، وعمدة القارى، ٣ : ٢٣٣ ، وفيض البارى، ١: ٣٢٩، وبذل المجهود، ١٦: ١٩٩، ومعارف السنن، ١: ٢٧٨ .

তাকমিলাতু ফাত্হিল মুলহিম, খ. ২, পৃ. ৩০৪, উমদাতুল ক্বারী, খ. ৩, পৃ. ২৩৩, ফয়যুল বারী, খ. ১, পৃ. ৩২৯, বযলুল মাজহূদ, খ. ১৬, পৃ. ১৯৯, মাআরিফুস সুনান, খ. ১, পৃ. ২৭৮

195 أخرجه البخارى فى الوضوء، باب أبوال الإبل، ١: ٣٦–٣٧، رقم الحديث: ٢٣٣، و فى كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، ٢: ١٠٠٥، رقم الحديث: ٦٨٠٢، ومسلم فى القسامة، باب حكم المحاربين، ٢: ٥٧، رقم الحديث: ٤٢٢٩، واللفظ له .

কুবা নামক অঞ্চলে সংরক্ষিত ছিল) এবং সেখানে গিয়ে তোমরা উটের দুধ ও পেশাব পান কর।[১৯৬]

উটের পেশাব নাপাক ও হারাম হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ওষুধ হিসেবে তা পান করার পরামর্শ দেন এবং এতে তারা আরোগ্যও লাভ করে। এতে প্রমাণিত হয় যে, প্রয়োজনে ওষুধ হিসেবে হারাম বস্তু সেবন করা জায়েয আছে এবং তাতে আরোগ্যও লাভ হয়। যেমনিভাবে যুদ্ধের মাঠে রেশমি কাপড় পরিধান করা জায়েয হয়ে যায়।[১৯৭]

অ্যালকোহল মিশ্রিত ওষুধ ও আতর ইত্যাদির হুকুম

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বর্তমানের অ্যালকোহল (Alcohol) মিশ্রিত হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক ওষুধসমূহের হুকুমও প্রতিয়মান হয় যে, যদি বাস্তবে অ্যালকোহলের মিশ্রণ ব্যতীত কোন ওষুধ ভাল না থাকে এবং যথাযথ ক্রিয়া ও প্রভাব বিস্তার করতে না পারে তাহলে প্রয়োজনের খাতিরে অ্যালকোহল মিশ্রিত ওষুধ ব্যবহার করা শরীআতের দৃষ্টিতে অবৈধ হবে না।

দ্বিতীয়তঃ বর্তমানে অ্যালকোহল যা ওষুধ, আতর, সেন্ট, রং ও কালি ইত্যাদিতে ব্যবহার হয়, তা সাধারণত আঙ্গুর ও খেজুরের নির্যাস থেকে প্রস্তুত করা হয় না। বরং তা শস্যদানার ছিলকা ও পেট্রোল ইত্যাদি থেকে প্রস্তুত করা হয়। এ ধরণের অ্যালকোহল ইমাম আযম আবূ হানীফা

---

১৯৬ বুখারী, খ. ১, পৃ. ৩৬-৩৭, হাদীস নং ২৩৩, ও খ. ২, পৃ. ১০০৫, হাদীস নং ৬৮০২, মুসলিম, খ. ২, পৃ. ৫৭, হাদীস নং ৪২২৯

১৯৭ আদ্দুরুল মুখতার [রদ্দুল মুহতার সংলগ্ন], খ. ১, পৃ. ৩৬৫

(الدر المختار مع رد المحتار، باب المياه قبيل فصل البئر، مطلب فى التداوى بالمحرم، ١: ٣٦٥، وباب الرضاع، ٤: ٣٩٧–٣٩٨ وباب البيع الفاسد، مطلب فى التداوى بلبن البنت للرمد قولان، ٧: ٢٦٤، وباب المتفرقات بعد بيع السلم، مطلب فى التداوى بالمحرم، ٧: ٤٨٠، والحظر والإباحة، فصل فى البيع، ٩: ٥٥٨، والأشربة، ١٠: ٢٨)

(রহ.) এর মতানুসারে নাপাক ও হারাম নয়। তাই ব্যাপক প্রচলনের কারণে এর ব্যবহার নাজায়েয বা হারাম হবে না।[১৯৮]

তৃতীয়তঃ বর্তমানে উল্লিখিত বস্তু সমূহ দ্বারাও অ্যালকোহল কমই বানানো হয়, এর জন্য পানিতে এক ধরণের পোকার চাষ হয় যা অনুবিক্ষণযন্ত্র ব্যতীত দেখা যায় না। মেডিসিনের মাধ্যমে এগুলোর পরিচর্যা করা হয়, নির্ধারিত সময়ের পর নিংড়িয়ে ও চিপে ঐ পোকা থেকে রস বের করে অ্যালকোহল তৈরী করা হয়। এতে আঙ্গুর, খেজুর ও বিভিন্ন শষ্য দানা থেকে অ্যালকোহল তৈরী করার তুলনায় খরচ অনেক কম হয়।

উক্ত অ্যালকোহল যেহেতু পানিতে বসবাসকারী প্রাণী থেকে তৈরী করা হয় সেহেতু তা নাপাক হওয়ার প্রশ্নই আসে না। কেননা পানিতে বসবাসকারী সকল জীবিত ও মৃত প্রাণী সর্বাবস্থায় পাক।

চতুর্থতঃ এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, খেজুর ও আঙ্গুর থেকে প্রস্তুতকৃত অ্যালকোহলকেই যদি ওষুধ, আতর, সেন্ট ও কালি ইত্যাদিতে মেশানো হয় তাহলে মেশানোর পর দেখতে হবে যে, তার আসল সত্তা বা মূল উপাদান অবশিষ্ট থাকে কি না। এ সম্পর্কে শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী (দা. বা.) তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব ‘বুহুছ ফী কাযায়া ফিকহিয়্যাহ মুআছরাহ’ গ্রন্থের একাদশ ‘বহছ’ (Treatise)[১৯৯] এ উল্লেখ করেনঃ

ثم هناك جهة أخرى ينبغي أن يسأل عنها خبراء كيمياء، وهو أن هذه الكحول بعد تركيبها بأدوية أخرى هل تبقى على حقيقتها أو تستحيل حقيقتها وماهيتها بعمليات كيماوية؟

---

১৯৮ তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, খ. ৩, পৃ. ৬০৮

(تكملة فتح الملهم ، كتاب الأشربة ، باب تحريم الخمر ، حكم الكحول المسكرة ، ٣: ٦٠٨)

১৯৯ বুহুছ ফী কাযায়া ফিকহিয়্যাহ মুআছরাহ, খ. ১, পৃ. ৩৪১

فإن كانت ماهيتها تستحيل بهذه العمليات، بحيث لا تبقى كحولاً، وإنما تصير شيئاً اخر، فيظهر أن عند ذلك يجوز تناولها باتفاق الأئمة، لأن الخمر إذا صارت خلاّ جاز تناولها فى قولهم جميعاً، لاستحالة الحقيقة.[২০০]

অর্থ- এখানে আরেকটি দিক রয়েছে আর তা হল, অভিজ্ঞ রসায়নবিদ তথা ওষুধ প্রস্তুতকারকদেরকে জিজ্ঞেস করা চাই যে, এ সমস্ত অ্যালকোহল বিভিন্ন ওষুধের সাথে মেশানোর পর তার আসল সত্তা বহাল থাকে, না কি ওষুধের সাথে সংমিশ্রনের ফলে তার মূল সত্তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। যদি ওষুধের সাথে মেশানোর পর তার মূল সত্তা অবশিষ্ট ও বহাল না থাকে (আর অবশিষ্ট না থাকাই স্বাভাবিক) তাহলে ঐ অ্যালকোহল আর অ্যালকোহল থাকে না। বরং ভিন্ন কোন বস্তুতে পরিণত হয়ে যায়। তখন তা ব্যবহার করা ও খাওয়া সকল ইমামদের নিকট সম্পূর্ণরূপে জায়েয। কেননা মদ সির্কা হয়ে গেলে বাস্তব সত্তা পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার কারণে তা পান করা সকলের নিকট জায়েয হয়ে যায়।[২০১]

200 بحوث فى قضايا فقهية معاصرة، أجوبة عن استفتاء المركز الإسلامى بواشنطن، ١: ٣٤١.

২০১ বুহুছ ফী কাযায়া ফিকহিয়্যাহ মু'আছরাহ, খ. ১, পৃ. ৩৪১

২য় অধ্যায়

العمليات الجراحية

অস্ত্রোপচার/অপারেশন

Operation

মানুষের দেহে অস্ত্রোপচার

মানুষের দেহে অস্ত্রোপচার দুই প্রকারঃ

এক. জীবিত মানুষের দেহে অস্ত্রোপচার।

দুই. মৃত মানুষের দেহে অস্ত্রোপচার।

জীবিত মানুষের দেহে অস্ত্রোপচার আবার দুই প্রকারঃ

এক. তার নিজের উপকারার্থে অস্ত্রোপচার।

দুই. অন্যের উপকারার্থে অস্ত্রোপচার।

মৃত মানুষের দেহে অস্ত্রোপচার আবার দুই প্রকারঃ

এক. মৃত্যুর কারণ জানার লক্ষ্যে।

দুই. জীবিত মানুষের উপকারার্থে।

জীবিত মানুষের উপকারার্থে অস্ত্রোপচার আবার দুই প্রকারঃ

এক. জীবিত মানুষের দৈহিক উপকারার্থে।

দুই. জীবিত মানুষের আর্থিক উপকারার্থে।

নিম্নে প্রত্যেক অবস্থার উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হলঃ

জীবিত মানুষের দেহে তার নিজের উপকারার্থে অস্ত্রোপচার

জীবিত মানুষের দেহে তার নিজের উপকারার্থে যেমন, চিকিৎসা ইত্যাদির লক্ষ্যে অস্ত্রোপচার বৈধ কি না এ ব্যাপারে বৈধ-অবৈধ তথা

জায়েয-নাজায়েয উভয় ধরণের মতামত পাওয়া যায়। যারা নাজায়েয মনে করেন, তারা নিম্নে বর্ণিত যুক্তি ও দলিল পেশ করে থাকেন।

অপারেশন নাজায়েয হওয়ার দলীল

১- আমরা আমাদের দেহের মালিক নই, এর প্রকৃত মালিক হলেন আল্লাহ তা'আলা। তাই আল্লাহ পাকের মালিকানাধীন বস্তুতে অন্য কারোর হস্তক্ষেপের অধিকার নেই। এ জন্যই তো আত্মহত্যা হারাম ও মহাপাপ। যদি আমরা আমাদের দেহের মালিক হতাম তাহলে আত্মহত্যার মাধ্যমে নিজের জীবনের অবসান ঘটানো অবৈধ হত না। সুতরাং এর উপর অস্ত্রোপচারও বৈধ হবে না।

২- অপারেশনে রোগীর কঠিন ও ভীষণভাবে কষ্ট স্বীকার করা নিশ্চিত, আর এর বিপরীতে আরোগ্য লাভ নিশ্চিত নয় বরং সম্ভাব্য। সুতরাং সম্ভাব্য আরোগ্যের লক্ষ্যে নিশ্চিত কষ্ট স্বীকার করা যুক্তি সঙ্গত নয়।

৩- বর্তমান যুগের ন্যায় যদিও এমন অপারেশন পদ্ধতির অস্তিত্ব অতিতে ছিল না, কিন্তু 'দাগ' লাগানোর মাধ্যমে আদি যুগে যে চিকিৎসার প্রচলন ছিল তা অপারেশনের দৃষ্টান্ত হতে পারে। আর দাগের মাধ্যমে চিকিৎসার ব্যাপারে অনুমতি ও নিষেধ উভয় ধরণের হাদীস পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে অর্থাৎ আদেশ ও নিষেধের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে হাদীস শাস্ত্রের বিধান অনুসারে নিষেধাজ্ঞার হাদীসকে প্রাধান্য দেয়া হয়।

عن عمران بن حصين –رضي الله تعالى عنه–، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكى، فاكتوينا، فما أفلحن ولا أنجحن. [202]

---

202 رواه أبوداؤد فى الطب، باب الكى، ٢: ٥٤٠، رقم الحديث: ٣٨٥٩، واللفظ لـه، والترمذى فى الطب، باب ما جاء فى كراهية الكى، ٢: ٢٥، رقم الحديث: ٢٠٤٩، و قال: هذا حديث حسن صحيح.

অর্থ- হযরত ইমরান ইবনে হুছাইন (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সেঁক ও দাগ দেয়াকে নিষেধ করেছেন। অতঃপর আমরা দাগ দিয়েছি কিন্তু এতে আমরা সফলতা ও আরোগ্য লাভ করতে পারিনি।[২০৩]

অপারেশন জায়েয হওয়ার দলীল

পক্ষান্তরে, যারা অপারেশন জায়েয মনে করেন, তারা নিম্নে বর্ণিত দলীলসমূহ পেশ করে থাকেন।

১ -

عن أبي هريرة –رضي الله تعالى عنه–، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان فى شيء مما تداويتم به خير، فالحجامة .[٢٠٤]

অর্থ- হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ তোমাদের চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে শিঙা লাগানোই উত্তম চিকিৎসা।[২০৫]

'শিঙা লাগানোর পূর্বে অস্ত্রোপচার করা হয়' এর দ্বারা অপারেশন প্রমাণিত হয়। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, অপারেশনে বড় ধরণের অস্ত্রোপচার হয়ে থাকে আর শিঙার অস্ত্রোপচার ছোট ধরণের হয়ে থাকে।

২ -

عن جابر –رضي الله تعالى عنه–، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا، فقطع منه عرقا، ثم كواه عليه .[٢٠٦]

---

২০৩ আবূ দাউদ, খ. ২, পৃ. ৫৪০, হাদীস নং ৩৮৫৯, তিরমিযী, খ. ২, পৃ. ২৫, হাদীস নং ২০৪৯

204 رواه أبوداؤد فى الطب، باب الحجامة، ٢: ٥٣٩، رقم الحديث: ٣٨٥٨ .

২০৫ আবূ দাউদ, খ. ২, পৃ. ৫৩৯, হাদীস নং ৩৮৫৮

206 رواه مسلم فى الطب، باب لكل داء دواء، ٢: ٢٢٥، رقم الحديث: ٥٧٠١، واللفظ له، و أبوداؤد فى الطب، باب فى قطع العروق، ٢: ٥٤٠، رقم الحديث: ٣٨٥٧ .

অর্থ- হযরত জাবির (রাযি.) থেকে বর্ণিত; একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উবাই বিন কা'বের নিকট একজন ডাক্তার পাঠালেন। অতঃপর সে তার একটি রগ কেটে এর উপর দাগ লাগিয়ে দেয়।[২০৭]

উক্ত হাদীসে রগ কাটার কথা অপারেশন জায়েয হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ বহন করে।

৩ -

عن عائشة –رضي الله تعالى عنها–، أنها قالت: ماخير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما، الخ .[٢٠٨]

অর্থ- হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে দুই কাজের মধ্যে যে কোন একটির অবকাশ দেয়া হলে তিনি সব সময় তুলনামূলক সহজ কাজটি গ্রহণ করতেন।[২০৯]

এই হাদীসটিও অপারেশন জায়েয হওয়ার একটি দলীল। কেননা,

(ক) অসুখ যেমনিভাবে কষ্টকর ও ক্ষতিকর তেমনিভাবে অপারেশনও কষ্টকর ও ক্ষতিকর। আর অপারেশনের কষ্ট ও ক্ষতি অসুখের কষ্ট ও ক্ষতি থেকে সহজ। কারণ অসুখের কষ্ট মৃত্যুমুখী। পক্ষান্তরে, অপারেশনের কষ্ট জীবনমুখী। অন্য ভাষায়, অসুখের কষ্ট মৃত্যুর দিকে টেনে নেয়। পক্ষান্তরে, অপারেশনের কষ্ট জীবনের দিকে টেনে নেয়।

(খ) অসুখের কষ্ট দীর্ঘ মেয়াদী। পক্ষান্তরে, অপারেশনের কষ্ট সাময়িক। যেমন প্রাপ্ত বয়স্ক খৎনা বিহীন ব্যক্তির খৎনা করানোকে না

---

২০৭ মুসলিম, খ. ২, পৃ. ২২৫, হাদীস নং ৫৭০১, আবূ দাউদ, খ. ২, পৃ. ৫৪০, হাদীস নং ৩৮৫৭

208 رواه البخارى فى الأدب، باب قول النبى صلى الله عليه وسلم: يَسِّرُوا وَلاَتُعَسِّرُوا، ٢: ٩٠٤، رقم الحديث: ٦١٢٦،وفى المناقب، باب صفة النبى صلى الله عليه وسلم،١: ٥٠٣، رقم الحديث: ٣٥٦٠ .

২০৯ বুখারী, খ. ২, পৃ. ৯০৪, হাদীস নং ৬১২৬ ও খ. ১, পৃ. ৫০৩, হাদীস নং ৩৫৬০

করানোর তুলনায় অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। অথচ খৎনা করতে গেলে ডাক্তার তার সতর দেখবে যা হারাম। কিন্তু হারাম অর্থাৎ সতর দেখবে অল্প সময়ে জন্য, আর এর দ্বারা সুন্নাতের উপর আমল হবে স্থায়ীভাবে।

(গ) অসুখ স্বাস্থ্যহানি করে পক্ষান্তরে অপারেশন অসুস্থ দেহকে সুস্থ করে দেয়। অতএব, দীর্ঘ মেয়াদী ক্ষতি থেকে বাঁচার লক্ষ্যে ছোট ও সাময়িক ক্ষতি মেনে নেয়া উক্ত হাদীসের অনুসরণই হবে।

৪ -

قال الله تعالى: يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل.[২১০]

অর্থ- সম্মানিত মাস সম্পর্কে তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে যে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন? বলে দাও, এতে যুদ্ধ করা অনেক বড় পাপ। আর আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা, কুফরী করা, মসজিদে হারামের পথে বাধা দেয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদের বহিষ্কার করা, আল্লাহর নিকট তার চেয়েও বড় পাপ। আর ধর্মের ব্যাপারে ফেতনা সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও মহাপাপ।[২১১]

তাই এ মাসে সকল মারাত্মক গুনাহ থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করা অপরাধ হলেও ঐ তুলনায় হালকা অপরাধ। এজন্য মহাপাপের তুলনায় হালকা অপরাধ তথা সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করাকে বরদাশত/ ক্ষমার্হ করা হয়েছে।

তেমনি ভাবে অপারেশন অসুস্থ থাকার তুলনায় হালকা ও সহজ, তাই হালকা ও সহজ পন্থা অবলম্বন করার লক্ষ্যে অপারেশন করলেই উক্ত আয়াতের উপর আমল হবে।

---

210 سورة البقرة، آية: ٢١٧

২১১ সূরা বাকারা, আয়াত: ২১৭

৫ -

قال الله تعالى: يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما.[212]

অর্থ- তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, এতদুভয়ের মাঝে রয়েছে মহাপাপ। আর মানুষের জন্য উপকারিতাও রয়েছে, তবে এগুলোর পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড়।[২১৩]

অপারেশন না করলে যদিও অপারেশনের কষ্ট থেকে বাঁচা যায়, কিন্তু এর থেকেও বড় কষ্ট অসুস্থতার দীর্ঘদিনের ভোগান্তি থেকে যায়। সুতরাং অপারেশনের রাস্তা অবলম্বন করলেই উল্লিখিত আয়াতের উপর আমল হবে।

৬ - ফিকাহ শাস্ত্রের সর্বস্বীকৃত একটি মূলনীতি (Principle)

لو كان أحدهما أعظم ضررا من الاخر فإن الأشد يزال بالأخف .[٢١٤]

অর্থ- যদি দুই ক্ষতির মধ্যে তুলনামূলক একটি অপরটির চেয়ে বড় হয়, তাহলে তুলনামূলক ছোট ক্ষতি বরদাশ্‌ত করার মাধ্যমে বড় ক্ষতিকে প্রতিহত করতে হয়।

অতএব, তুলনামূলক অপারেশনের মত ছোট ক্ষতি বহনের মাধ্যমে অসুস্থ থাকার মত বড় ক্ষতি প্রতিরোধ করাই শ্রেয়।[২১৫]

৭ - ফিকাহ শাস্ত্রের আরেকটি মূলনীতি

إذا تعارض مفسدتان روعى أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما .[٢١٦]

---

212 سورة البقرة، آية: ٢١٩ .

২১৩ সূরা বাকারা, আয়াত: ২১৯

214 الأشباه والنظائر، الفن الاول، تحت القاعدة الخامسة"الضرر يزال"، ص: ٩٦، دار الفكر، بيروت .

২১৫ আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ির, পৃ. ৯৬

অর্থ- বিরোধপূর্ণ দু'টি ক্ষতির মধ্যে তুলনামূলক ছোট ক্ষতি গ্রহণ করে বড় ক্ষতিকে প্রতিরোধ করতে হয়।[২১৭]

অনুরূপ অর্থে আরেকটি কায়দা বা মূলনীতি আছেঃ

يختار أهون الشرين.

অর্থ- দুই ক্ষতির মধ্যে তুলনামূলক সহজ ক্ষতিকে গ্রহণ করা হয়।

এ হিসেবে তুলনামূলক সহজ ক্ষতি অপারেশনকে মেনে নিয়ে বড় ক্ষতি অসুস্থতা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করাই অধিক যুক্তিসঙ্গত।

৮ - হুদাইবিয়ার সন্ধিপত্রে যে শর্তসমূহ উল্লেখ করা হয়েছিল, এগুলোকেও অপারেশন বৈধ হওয়ার দলীল হিসেবে পেশ করা যেতে পারে। কেননা যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে এগুলো ইসলামের জন্য ক্ষতিকর মনে হয়েছিল কিন্তু এ ক্ষতির অন্তরালে মক্কা বিজয়ের বিরাট ভূমিকা ছিল বিধায় তা মেনে নেয়া হয়েছিল। তদ্রুপ অপারেশনের মত ক্ষতি, সুস্থতার মত বিরাট উপকারের ভূমিকা রাখে বিধায় তা মেনে নেয়াই অধিক যুক্তিসঙ্গত।

৯ -

عن أنس بن مالك –رضي الله تعالى عنه–، –وهوعم إسحاق–، قال: بينما نحن فى المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء أعرابى، فقام يبول فى المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه، مه، قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه، فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه، فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيئ من هذا البول ولا القذر، إنما هى لذكر الله، والصلاة، وقراءة القران، أو كما

---

216 الأشباه والنظائر، الفن الاول، تحت القاعدة الخامسة "الضرر يزال"، ص: ٩٨ .

২১৭ আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ির, পৃ. ৯৮

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء، فشنه عليه .[٢١٨]

অর্থ- হযরত আনাস বিন মালিক (রাযি.) বলেন, আমরা একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সাথে মসজিদে ছিলাম। এমতাবস্থায় এক গ্রাম্য ব্যক্তি মসজিদে আসল, অতঃপর মসজিদের এক কোণে সে পেশাব করতে আরম্ভ করল। সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) এ অবস্থা দেখে থাম! থাম! বলে চিৎকার করলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তোমরা তার পেশাবে বাধা সৃষ্টি করো না। সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) তাকে আর কিছু করলেন না। অতঃপর সে পেশাব শেষ করলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাকে ডেকে বললেনঃ মসজিদ মূত্র ও অপবিত্র বস্তু নিক্ষেপের স্থান নয়, বরং আল্লাহর যিকির, নামায ও কুরআন তিলাওয়াতের স্থান। অতঃপর এক ব্যক্তিকে পানি আনার আদেশ দিলেন। সে এক বালতি পানি এনে পেশাবের উপর ঢেলে দিল।[২১৯]

উক্ত হাদীসে মসজিদে মূত্র ত্যাগ করতে দেয়া নিঃসন্দেহে ঠিক ছিল না। কেননা এতে মসজিদের অসম্মানের পাশাপাশি মসজিদ অপবিত্রও হয়েছে বটে। তথাপি তাকে পেশাব থেকে বারণ না করার ফলে মসজিদের কিছু জায়গা অপবিত্র হওয়ার তুলনায় তাকে পেশাব থেকে বারণ করতে গেলে তার শারীরিক ক্ষতি ও মসজিদের অনেক জায়গা নষ্ট হওয়ার মত বড় ক্ষতি থেকে বাঁচানোই উদ্দেশ্য ছিল। তাই অপারেশনে ক্ষতি ও কষ্টের

---

২১৮ أخرجه البخاري فى الوضوء، باب ترك النبى صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابى حتى فرغ من بوله فى المسجد، ١: ٣٥، رقم الحديث: **٢١٩**، ومسلم فى الطهارة، باب وجوب غسل البول، ١: ١٣٨، رقم الحديث: **٦٥٩**، واللفظ له، والنسائى فى الطهارة، باب ترك التوقيت فى الماء، ١: ٩ .

২১৯ বুখারী, খ. ১, পৃ. ৩৫, হাদীস নং ২১৯, মুসলিম, খ. ১, পৃ. ১৩৮, হাদীস নং ৬৫৯

দিক থাকা সত্ত্বেও অপারেশন না করে রোগের অধিক কষ্ট ও ক্ষতির থেকে বাঁচার লক্ষ্যে তা মেনে নেয়াই শ্রেয়।

১০ - ফিকাহ শাস্ত্রের বিভিন্ন কিতাব সমূহেও অপারেশন বৈধ বলে উল্লেখ রয়েছে।

ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে উল্লেখ আছেঃ

ولا بأس بشق المثانة إذا كانت فيها حصاة .[২২০]

অর্থ- মূত্রাশয়ে পাথর হলে তা কেটে পাথর বের করা নাজায়েয নয়।[২২১]

ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে আরও উল্লেখ আছেঃ

لا بأس بقطع العضو إن وقعت فيه الآكلة، لئلا تسرى، كذا فى السراجية.

لا بأس بقطع اليد من الآكلة وشق البطن لما فيه، كذا فى الملتقط.[২২২]

অর্থ- কোন অঙ্গে যদি কর্কট রোগ, দুষ্টক্ষত ও ক্যান্সার ইত্যাদি (ক্ষত পচনশীল রোগ) হয়, তাহলে অন্য অঙ্গ আক্রান্ত হওয়ার আশংকায় আক্রান্ত অঙ্গ কেটে ফেলা নাজায়েয নয় (সিরাজিয়া)। তেমনিভাবে অন্য অঙ্গ আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে ক্যান্সারে আক্রান্ত হাত অথবা পেট কাটা অবৈধ নয় (মুলতাকাত)।[২২৩]

ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে আরো উল্লেখ আছেঃ

إذا أراد الرجل أن يقطع إصبعا زائدة أو شيئا آخر، قال نصيررح: إن كان الغالب على من قطع مثل ذلك الهلاك، فإنه لايفعل، وإن كان الغالب هو النجاة، فهو فى سعة من ذلك .[২২৪]

---

220 الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية، الباب الحادى والعشرون فيما يسع من جراحات بنى آدم والحيوانات، ٥: ٣٦٠ .

২২১ আলমগীরী, খ. ৫, পৃ. ৩৬০

222 الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية، الباب الحادى والعشرون فيما يسع من جراحات بنى أدم والحيوانات، إلخ. ٥: ٣٦٠ .

২২৩ আলমগীরী, খ. ৫, পৃ. ৩৬০

224 الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية، الباب الحادى والعشرون، ٥: ٣٦٠ .

অর্থ- যখন কোন ব্যক্তি তার অতিরিক্ত আঙ্গুল অথবা অন্য কোন অঙ্গ কেটে ফেলতে চায়, তাহলে তা বৈধ হবে কিনা এ ব্যাপারে হযরত নাছীর (রহ.) বলেন, যদি এতে মারা যাওয়ার আশংকা বেশি থাকে তাহলে তা করা যাবে না। পক্ষান্তরে, সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকলে এমন করার অবকাশ রয়েছে।[২২৫]

এ ধরণের আরো বহু মাসআলা বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। যা থেকে পরিষ্কারভাবে একথা বুঝে আসে যে প্রয়োজনের তাগিদে অপারেশন করা অবৈধ নয়। তবে এ ধরণের চিকিৎসা তখনই বৈধ হবে, যখন তা কোন طبيب حاذق তথা মুসলমান বিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শে হবে। অন্যথায় অপারেশন বৈধ হবে না।

উল্লিখিত মাসআলায় মারা যাওয়ার ভয় ও বেঁচে থাকার বিষয়টি নির্ণয় করবে একমাত্র মুসলমান বিজ্ঞ ডাক্তারগণ।

প্রথম পক্ষের দলীলের জবাব

উল্লেখ্য, যারা অপারেশন বা কাটা-ছেঁড়ার মাধ্যমে চিকিৎসা করাকে অবৈধ মনে করেন, তাদের এ মতটি সঠিক নয়। কেননা এর স্বপক্ষে প্রথম যে দলীলটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, "আমরা আমাদের দেহের মালিক নই, সুতরাং এর অস্ত্রোপচারের অধিকার আমাদের নেই" এ কথাটি সঠিক নয়। কারণ, যেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা আমাদের দেহের মালিক তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকটি সৃষ্টিরই মালিক, তা সত্ত্বেও তার সৃষ্টিকে কাটা-ছেড়া ও জবাই ইত্যাদি নানা উপায়ে ব্যবহার করে আমরা উপকৃত হই। আর ব্যবহারের নির্দেশ তিনিই আমাদেরকে দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেনঃ

هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعاً.[٢٢٦]

---

২২৫ আলমগীরী, খ. ৫, পৃ. ৩৬০

226 سورة البقرة، آية، ٢٩ .

অর্থ- তিনি যমীনের সবকিছু তোমাদের উপকারার্থে সৃষ্টি করেছেন।[২২৭]

আমাদের দেহ এবং শরীরও এ আয়াতের আওতাভুক্ত। অতএব, অপারেশন করে যদি দৈহিকভাবে উপকৃত হওয়া যায় তাহলে তা আল্লাহ তা'আলার হুকুমের পরিপন্থী হবে না।

দ্বিতীয় দলীল হিসেবে তারা যে বলেছেন, "অপারেশনে ভীষণ কষ্ট ও ভোগান্তি নিশ্চিত, এর বিপরীতে আরোগ্য লাভ করা সম্ভাব্য। আর সম্ভাব্য আরোগ্যের জন্য নিশ্চিতভাবে মারাত্মক কষ্ট স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত নয়।"

যদি বাস্তবে এমনই হয়, তাহলে অপারেশনকে কেউ জায়েয মনে করত না। কিন্তু এ কথাটি সকল রোগীর ব্যাপারে সর্ব ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য নয়। যেখানে طبيب حاذق তথা মুসলমান বিজ্ঞ ডাক্তার অপারেশনকে প্রাধান্য দিবে সেখানে অপারেশনের অনুমতি রয়েছে। পক্ষান্তরে, যেখানে অপারেশনকে প্রাধান্য দিবে না সেখানে অপারেশন করা কোনভাবে যুক্তিযুক্ত নয়।

তৃতীয় দলীলে "দাগ লাগানো নিষেধের হাদীস পেশ করার মাধ্যমে যে দলীল পেশ করা হয়েছিল", এ ব্যাপারে ইমামে রব্বানী, আবূ হানীফায়ে ছানী, হযরত মাও. রশীদ আহ্‌মাদ গাংগুহী (রহ.) বলেনঃ "দাগ লাগানোর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞার হাদীসগুলো রহিত হয়ে গেছে।" প্রথম অবস্থায় যখন মানুষের আকীদা এমন ছিল যে, দাগ লাগানোর মধ্যে চিকিৎসা সীমাবদ্ধ এবং দাগ লাগানোকে সরাসরি রোগমুক্তিদাতা মনে করা হত। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মানুষের আকীদা-বিশ্বাস সংশোধন করার লক্ষ্যে দাগ লাগানোকে নিষেধ করেছেন।

কিন্তু যখন মানুষের অন্তরে ইসলামী আকীদা ও বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, রোগ থেকে মুক্তিদাতা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই, দাগ লাগানো ইত্যাদি রোগ থেকে মুক্তি দাতা নয়। বরং রোগ মুক্তির একটি 'সবব্' বা উপকরণ মাত্র। আল্লাহ পাক এতে ক্রিয়া ক্ষমতা দিলে

---

২২৭ সূরা বাকারা, আয়াত: ২৯

সে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে, আর ক্রিয়া ক্ষমতা না দিলে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।

অতঃপর, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম দাগ লাগানোর মাধ্যমে চিকিৎসার অনুমতি দিয়েছেন। অতএব, এর দ্বারা অপারেশন নাজায়েয হওয়ার পক্ষে দলীল পেশ করা যাবে না।

কাটা ঠোঁট অপারেশনের মাধ্যমে জোড়া লাগানো

কাটা ঠোঁট অস্ত্রোপচারের কারণে যদি অঙ্গহানি বা কোন মারাত্মক ক্ষতির আশংকা থাকে (যেমন, ডায়াবেটিস রুগীর ক্ষত না শুকানো ইত্যাদি) তাহলে জোড়া লাগানোর জন্য কাটা ঠোঁটে অস্ত্রোপচার ঠিক হবেনা। আর যদি এরূপ আশংকা না থাকে তাহলে এতে কোন অসুবিধা নেই।

ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে আছে,

إذا أراد الرجل أن يقطع إصبعا زائدة أو شيئا آخر ، قال نصير رحمه الله تعالى : إن كان الغالب على من قطع مثل ذلك الهلاك ، فإنه لا يفعل ، وإن كان الغالب هو النجاة ، فهو في سعة من ذلك .[২২৮]

অর্থ: কোন ব্যক্তি যদি অতিরিক্ত আঙ্গুল বা অন্য কোন বর্ধিত অঙ্গ কেটে ফেলতে চায় তাহলে শায়খ নাসীর রহ. এর অভিমত হল, কাটা যদি অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৃত্যু বা অঙ্গহানির কারণ হয় তাহলে এরূপ করবে না। আর যদি অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপকারী হওয়া সাব্যস্ত হয় তাহলে এমন করা যেতে পারে।[২২৯]

---

228 الفتاوي الهندية ، كتاب الكراهية ، الباب الحادي و العشرون ، ٥ : ٣٦٠ .

২২৯ ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, খ. ৫, পৃ. ৩৬০

العمليات الجراحية لزيادة الزينة
সৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে অপারেশন
Operation for Addition to Adornment

পূর্বের আলোচনা থেকে আরেকটি বিষয়ের হুকুম পরিষ্কার হয়ে যায়। আর তা হল, সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও তা স্থায়ী করার লক্ষ্যে অপারেশন করা বৈধ কি না?

এ ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম আল্লামা মুফতী তাকী উসমানী (দা. বা.) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম' এ বিস্তারিত আলোচনার পর বলেনঃ

والحاصل: أن كل ما يفعل فى الجسم من زيادة أو نقص من أجل الزينة بما يجعل الزيادة أو النقصان مستمرا مع الجسم وبما يبدومنه أنه كان فى أصل الخلقة هكذا، فإنه تلبيس وتغيير منهى عنه، وأما ما تزينت به المرأة لزوجها من تحمير الأيدى أو الشفاه أو العارضين بما لا يلتبس بأصل الخلقة، فإنه ليس داخلاً فى النهى عند جمهور العلماء، وأما قطع الإصبع الزائدة ونحوها، فإنه ليس تغييرا لخلق الله، وإنه من قبيل إزالة عيب أو مرض فأجازه أكثر العلماء خلافاً لبعضهم .[٢٣٠]

অর্থ- মোটকথা, দেহ ও বিভিন্ন অঙ্গের সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও তা স্থায়ী করার লক্ষ্যে দেহে এমনভাবে অপারেশনের মাধ্যমে সংযোজন ও বিয়োজন করা যা দেখতে মনে হয় যেন সৃষ্টিগত ভাবেই এমন ছিল; এতে কৃত্রিম ও অকৃত্রিমের মাঝে সংমিশ্রণ ও সৃষ্টির মাঝে পরিবর্তন বুঝায় বিধায় ইসলামী শরীআতে তা সম্পূর্ণ নিষেধ। পক্ষান্তরে, মহিলারা স্বামীর

---

230 تكملة فتح الملهم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة، ٤ : ١٩٥ .

সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাদের হাত, ঠোঁট ও গন্ডদেশ লাল করে যে সাজ-সজ্জা করে তা মূল সৃষ্টির সাথে কৃত্রিম সৃষ্টির সংমিশ্রণ হয় না। তাই এগুলো জুমহুরে উলামার (অধিকাংশ আলেমের) নিকট নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত নয়। যেমনিভাবে অতিরিক্ত আঙ্গুল ইত্যাদি কেটে ফেলাও আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে পরিবর্তন করার নামান্তর নয়, বরং এতে রোগ ও ত্রুটি দূর করা হয় বিধায় অধিকাংশ আলেম এর অনুমতি দিয়ে থাকেন। তবে কিছু সংখ্যক আলেম নিষেধও করেন।[২৩১]

عن ابن عمر –رضي الله تعالى عنهما–، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:

لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة .[٢٣٢]

অর্থ- হযরত ইবনে উমর (রাযি.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ পাক ঐ নারীর উপর লা'নত ও অভিশাপ দিয়েছেন যে অন্য নারীর মাথায় কৃত্রিম চুল সংযোজন করে কিংবা নিজ মাথায় কৃত্রিম চুল সংযোজন করায় এবং যে নিজের শরীরে উল্কি আঁকে কিংবা অন্যকে আঁকিয়ে দিতে বলে।[২৩৩]

উল্লেখ্য যে, 'واشمة' বলা হয় সৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে মহিলাদের হাত, ঠোঁট, মুখমন্ডল ইত্যাদি দেহের বিভিন্ন স্থানে সুঁই বা ধারালো কোন অস্ত্র দিয়ে ছিদ্র করে সেখান থেকে রক্ত বের করে সুরমা ও চুনা জাতীয় বস্তু দ্বারা ভরাট করাকে। এতে ঐ স্থানটি সবুজ হয়ে যায়। এভাবে এতে প্রেমিকার নাম বা অন্য কোন ছবিও চিত্রিত করা যায়।[২৩৪]

---

২৩১ তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, খ. ৪, পৃ. ১৯৫

232 أخرجه البخارى فى اللباس، باب وصل الشعر، ٢: ٨٧٨، رقم الحديث: ٥٩٣٧، وباب الموصلة، ٢: ٨٧٩، رقم الحديث: ٥٩٤٠–٥٩٤٢، وباب المستوشمة، رقم الحديث: ٥٩٤٧، واللفظ له، ومسلم فى اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة، ٢: ٢٠٤، رقم الحديث: ٥٥٢٧ .

২৩৩ বুখারী, খ. ২, পৃ. ৮৭৮, হাদীস নং ৫৯৩৭ ও খ. ২, পৃ. ৫৭৯, হাদীস নং ৫৯৪০-৫৯৪২, মুসলিম, খ. ২, পৃ. ২০৪, হাদীস নং ৫৫২৭

২৩৪ তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, খ. ৪, পৃ. ১৯৩

অতিরিক্ত অঙ্গ কেটে ফেলে দেয়া

অতিরিক্ত আঙ্গুল কিংবা অন্য কোন অঙ্গ কেটে ফেলে দেয়া দু'টি শর্ত সাপেক্ষে জায়েয। শর্ত দু'টি হল:

১. অঙ্গ কাটার কারণে মারা যাওয়ার আশংকা না থাকা।

২. সুস্থ হওয়ার প্রবল ধারণা থাকা।

ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে উল্লেখ আছে,

إذا أراد الرجل أن يقطع إصبعا زائدة أو شيئا آخر، قال نصيرح: إن كان الغالب على من قطع مثل ذلك الهلاك، فإنه لايفعل، وإن كان الغالب هو النجاة، فهو فى سعة من ذلك .[২৩৫]

অর্থ- যখন কোন ব্যক্তি তার অতিরিক্ত আঙ্গুল অথবা অন্য কোন অঙ্গ কেটে ফেলতে চায়, তাহলে তা বৈধ হবে কিনা এ ব্যাপারে হযরত নাছীর (রহ.) বলেন, যদি এতে মারা যাওয়ার আশংকা বেশি থাকে তাহলে তা করা যাবে না। পক্ষান্তরে, সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকলে এমন করার অবকাশ রয়েছে।[২৩৬]

উল্লেখ্য, মারা যাওয়ার আশংকা ও সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনার বিষয়টি নির্ণয় করবে মুসলিম বিজ্ঞ ডাক্তার।

❖ ❖ ❖

---

235 الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية، الباب الحادى والعشرون، ٥: ٣٦٠ .

২৩৬ আলমগীরী, খ. ৫, পৃ. ৩৬০

حكم العمليَّة القيصريَّة
সিজারের হুকুম
Caeser's Judgment

মায়ের পেট কেটে বাচ্চা বের করাকে সিজার বলে। মায়ের পেটে বাচ্চা থাকাকালীন মা ও বাচ্চার চারটি অবস্থা হতে পারে। প্রত্যেক অবস্থার হুকুম ভিন্ন ভিন্ন। নিম্নে অবস্থাগুলোর বিস্তারিত আলোচনা ও প্রত্যেক অবস্থার হুকুম উল্লেখ করা হল।

১. মা ও বাচ্চা উভয়ই মৃত

এ অবস্থায় মায়ের পেট কেটে বাচ্চা বের করা জায়েয নেই। পেট কাটা ছাড়া বাচ্চা সহ মাকে দাফন করে দিবে।[২৩৭]

২. মা মৃত, বাচ্চা জীবিত

সর্বসম্মতিক্রমে এ প্রকারের হুকুম হল, 'মৃত মায়ের পেটের বাম পার্শ্বে কেটে বাচ্চা বের করবে।' এমন করা যদিও মায়ের সম্মানের পরিপন্থী, কিন্তু মৃত ব্যক্তির সম্মানের চেয়ে জীবিত বাচ্চার হক অনেক বেশি। তাই বাচ্চার জীবন রক্ষার্থে মৃত মায়ের উপর অস্ত্রোপচারই অধিক যুক্তিসঙ্গত।[২৩৮]

---

237 الشرح الناصر للأشباه والنظائر[المخطوطة تسكين الأرواح والضمائر] فى شرح الأشباه والنظائر،تحت القاعدة الخامسة: الضرر يزال، ٦: ٤٢٦ . আশ শরহুন নাযির, খ. ৬, পৃ. ৪২৬

238 فتح القدير، قبيل باب الشهيد، ٢: ١٠٢، والدر المختار مع رد المحتار، كتاب الجنائز، آخر مطلب فى دفن الميت، ٣: ١٤٥، وشرح المنية، مسائل متفرقة من الجنائز، ص: ٦٠٨،والفتاوى الهندية، كتاب الجنائز، الفصل الأول فى المحتضر، ١: ١٥٧، وكتاب الكراهية، الباب الحادى والعشرون فيما يسع جراحات بنى آدم، ٥: ٣٦٠ .

উল্লেখ্য, মৃত মায়ের পেটে বাচ্চা জীবিত কি না তা বুঝার তিনটি উপায় আছে। যথা-

(ক) বাচ্চা নড়াচড়ার মাধ্যমে বুঝা।

(খ) আল্ট্রাসনোগ্রাফ -এর মাধ্যমে বুঝা।

(গ) ভেজা কাপড়ের মাধ্যমে বুঝা।

অর্থাৎ লাশের পেটের উপর ভেজা কাপড় বিছিয়ে দিলে যদি কাপড়টি তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় তাহলে বুঝা যাবে যে, বাচ্চা জীবিত আছে। পক্ষান্তরে, কাপড় না শুকিয়ে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ভেজা থাকলে বুঝতে হবে যে, বাচ্চা মৃত।

৩. বাচ্চা মৃত, মা জীবিত

এ অবস্থায় যদি পূর্ণ বাচ্চাকে মায়ের পেট না কেটে কোন ভাবে বের করা সম্ভব হয় তাহলে সে পদ্ধতি অবলম্বন করবে, অন্যথায় যোনিদ্বার দিয়ে হাত ঢুকিয়ে বাচ্চার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে কেটে বের করবে।[২৩৯]

উল্লেখ্য যে, এমতাবস্থায় যদি যোনি দ্বার দিয়ে হাত ঢুকিয়ে বাচ্চা বের করার তুলনায় সিজারের মাধ্যমে বের করা সহজ হয় তাহলে তুলনামূলক সহজ পন্থা অবলম্বন করবে।[২৪০]

৪. মা ও বাচ্চা উভয়ই জীবিত

এ প্রকারের হুকুম পূর্বের যুগের ফিকহের কিতাবসমূহে এ ভাবে বর্ণিত আছে যে, মা ও বাচ্চা উভয়জনকে আপন অবস্থায় রেখে দিবে; চাই উভয়জন মৃত্যু মুখে পতিত হোক কিংবা জীবিত থাকুক, অথবা দু'জনের কোন একজন মারা যাক, আর অন্যজন জীবিত থাকুক, অর্থাৎ এ

ফাতহুল কাদীর, খ. ২, পৃ. ১০২, আদ্দুররুল মুখতার [রদ্দুল মুহতার সংলগ্ন], খ. ৩, পৃ. ১৪৫, শরহুল মুনয়া, পৃ. ৬০৮, আলমগীরী, খ. ১, পৃ. ১৫৭ ও খ. ৫, পৃ. ৩৬০

২৩৯ আদ্দরুরুল মুখতার [রদ্দুল মুহতার সংলগ্ন], খ. ৩, পৃ. ১৪৫, আলমগীরী, খ. ৫, পৃ. ৩৬০

২৪০ আশ শারহুন নাযির, খ. ৬, পৃ. ৪২৭

অবস্থায় কোন ভাবে অপারেশন করা যাবে না। কারণ, অপারেশনের মাধ্যমে বাচ্চা বের হলে বাচ্চার জীবিত থাকা অনিশ্চিত, আর পেট কাটার কারণে (ঐ যুগ হিসেবে) মায়ের মৃত্যু অবধারিত। অতএব, সম্ভাব্য জীবনের জন্য অপারেশনের মাধ্যমে মায়ের নিশ্চিত মৃত্যুর পথ অবলম্বন করা যুক্তিসঙ্গত নয়। তেমনিভাবে মাকে বাঁচানোর লক্ষ্যে যোনি দ্বারে হাত ঢুকিয়ে বাচ্চাকে কেটে বের করারও অনুমতি নেই। কেননা একটি প্রাণকে বাঁচানোর জন্য আরেকটি প্রাণ হত্যার অনুমতি শরীআতে নেই। জীবিত থাকার দিক দিয়ে মা ও বাচ্চা উভয়জনই সমান। সুতরাং এ ক্ষেত্রে উভয়জনকে আপন অবস্থায় রেখে দিবে।[২৪১]

এতে উভয়জন অথবা যে কোন একজন মারা গেলে কেউ অপরাধী হিসেবে গণ্য হবে না।

ঐ যুগে আধুনিক চিকিৎসা, অপারেশন ও ব্যান্ডিজের তেমন কোন সুব্যবস্থা ছিল না। তাই কারো পেট কাটা হলে তার বেঁচে থাকা অকল্পনীয় ছিল বিধায় ঐ যুগে উভয়জনকে আপনাবস্থায় ছেড়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। উক্ত হুকুম এ যুগের জন্য প্রযোজ্য নয়। কেননা এ যুগে সিজারের সিস্টেম রয়েছে, বরং অনেক ক্ষেত্রে সাধারণত স্বাভাবিকভাবে (Normal) বাচ্চা হওয়ার তুলনায় সিজারের মাধ্যমে বাচ্চা হওয়া সহজ, তাই এ ক্ষেত্রে তাদেরকে আপন অবস্থায় না রেখে সিজারের মাধ্যমে বাচ্চা বের করাই অধিক যুক্তিসঙ্গত, কারণ এতে মা ও বাচ্চা উভয়ের সুস্থ থাকা অনেকটা নিশ্চিত।[২৪২]

মাকে বাঁচানোর লক্ষ্যে গর্ভস্থ বাচ্চা মেরে ফেলা

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, আর তা হলো যদি এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, মা ও বাচ্চা উভয়জন জীবিত আছে বটে, কিন্তু অভিজ্ঞ ডাক্তারদের মতে বাচ্চাকে মেরে বের না করা হলে, মা ও বাচ্চা উভয় জন

---

২৪১ রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ১৪৫
২৪২ আশ শরহুন নাযির, খ. ৬, পৃ. ৪২৯

মারা যাবে। পক্ষান্তরে, বাচ্চা মেরে ফেললে মায়ের জীবিত থাকা অনেকটা নিশ্চিত। এমতাবস্থায় বাচ্চাকে মেরে মাকে জীবিত রাখা বৈধ হবে কি না? এ মাসআলাটিকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ

(১) বাচ্চার বয়স ছয় মাস বা ততোধিক

(২) বাচ্চার বয়স ছয় মাসের কম

নিম্নে উক্ত অবস্থাদ্বয়ের হুকুম উল্লেখ করা হলঃ

(১) যদি বাচ্চার বয়স ছয় মাস কিংবা ততোধিক হয় তাহলে জীবিত থাকার ক্ষেত্রে মা ও বাচ্চা উভয়জন এক সমান বিধায় একজনের জীবনকে আরেক জনের জীবনের উপর প্রাধান্য দেয়া অযৌক্তিক। এতে উভয়জন কিংবা যে কোন এক জন মারা গেলে যেহেতু এর দায়দায়িত্ব কারো উপর বর্তাবে না। তাই একজনকে মেরে অপর জনকে বাঁচানোর পদক্ষেপ নেয়া বৈধ হবে না।

এখানে কেউ বলতে পারে যে, উভয়ের মৃত্যুর চেয়ে এক জনের মৃত্যুর বিনিময়ে আরেকজনকে বাঁচানোর চেষ্টা করাও যুক্তিসঙ্গত। তেমনিভাবে বাচ্চার মৃত্যুর তুলনায় মায়ের জীবিত থাকা অনেকটা সহজ। এ দৃষ্টিকোন থেকে বাচ্চাকে মেরে মাকে জীবিত রাখাও যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। এর উত্তরে বলা যায় যে, বাচ্চাটি তো বেকসুর ও নিরপরাধ, তার মাকে বাঁচানোর জন্য তাকে মারা হবে কেন? এমন অনুমতি না থাকাটাই যুক্তিযুক্ত।

'ফাতাওয়ায়ে কাযীখান' ও 'ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী'তে আছেঃ

وإذا اعترض الولد فى بطن الحامل، ولم يجدوا سبيلا لاستخراج الولد إلا بقطع الولد إربا إربا، ولولم يفعلوا ذلك يخاف هلاك الأم، قالوا: إن كان الولد ميتا فى البطن لابأس به، وإن كان حيا لم يجز أن يقطع الولد إربا إربا، لأنه قتل النفس المحترمة لصيانة نفس أخرى من غير تعد منه، وذلك باطل .[٢٤٣]

243 الفتاوى الخانية على هامش الهندية، كتاب الحظر والإباحة، فصل الختـــان، ٣: ٤١٠، ومثله فى الفتاوى الهندية، ٥: ٣٦٠ .

অর্থ- গর্ভবতী মহিলার পেটে যদি বাচ্চা পাথালি ও প্রস্থিত হয়ে যায় এবং খণ্ড খণ্ড করে বের করা ব্যতীত অন্য কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব না হয়। আর এমন না করলে মায়ের মারা যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। ফকীহগণ বলেনঃ যদি পেটের বাচ্চা মৃত হয় তাহলে এতে কোন সমস্যা নেই। আর যদি বাচ্চা জীবিত হয়, তাহলে বাচ্চাকে কেটে খণ্ড খণ্ড করে বের করা জায়েয নেই। কেননা এটা একটি সম্মানিত জীবনকে তার পক্ষ থেকে কোনো প্রকারের বাড়িবাড়ি ও অপরাধ ব্যতীত আরেকটি জীবন বাঁচানোর লক্ষ্যে হত্যা করা হচ্ছে, যা একেবারেই অবৈধ।[২৪৪]

এই ইবারতটিতে যদিও ছয় মাসের কথা উল্লেখ নেই, কিন্তু উদ্দেশ্য তাই। তবে বর্তমানে সাধারণত এমন পরিস্থিতির সম্মুখিন হতে হয় না। কারণ, সিজারের মাধ্যমে বাচ্চা বের করে আনলে মা ও বাচ্চা উভয়জনই বেঁচে যায়। তারপরও যদি বাচ্চা মারা যায় তাহলে তাকে মেরে ফেলা হয়েছে বলা যাবে না। বরং সে মারা গেছে বলতে হবে। অতএব, এর দায়ভার কারোর উপর বর্তাবে না।

(২) আর বাচ্চার বয়স যদি ছয় মাসের কম হয় তাহলে এ ক্ষেত্রে মাকে জীবিত রাখার খাতিরে বাচ্চাকে মেরে ফেলার অবকাশ থাকতে পারে। কেননা ছয় মাসের পূর্বে বাচ্চা জন্ম নিলে অথবা সিজারের মাধ্যমে বের করে আনলে বাচ্চার জীবিত না থাকাটা প্রায় নিশ্চিত। অতএব এখানে যদিও বাচ্চা জীবিত কিন্তু সে তো কোন অবস্থাতে বাঁচবে না। তাকে আপন অবস্থায় রেখে দিলে তার মারা যাওয়ার পাশাপাশি তার মাও মারা যাবে। অর্থাৎ দু'জনই মারা যাবে। পক্ষান্তরে তাকে মেরে ফেললে মা বাঁচবে। তাই উভয়জন মারা যাওয়ার পরিবর্তে মাকে জীবিত রাখা যুক্তিসঙ্গত।

অতএব যদি বাচ্চাকে পেটে রেখে জীবিত রাখার সব ধরণের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায় এবং বিজ্ঞ ডাক্তারগণ এ কথা বলেন যে, বাচ্চাকে পেটে

---

২৪৪ ফাতাওয়ায়ে কাযীখান [আলমগীরী সংলগ্ন], খ. ৩, পৃ. ৪১০, আলমগীরী, খ. ৫, পৃ. ৩৬০

রাখাটা মায়ের মৃত্যুর কারণ হবে, তাহলে শুধু এ ক্ষেত্রে বড় ক্ষতি থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে বাচ্চাকে মেরে ফেলার অনুমতি দেয়া যেতে পারে।

وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين: أن بقاء الجنين فى بطن أمه يسبب موتها، وذلك بعد إستفادة كافة الوسائل لإنقاذ حياته. وإنما رخص الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط؛ دفعا لأعظم الضررين، وجلبا لعظمى المصلحتين.[২৪৫]

অর্থ- বাচ্চার বয়স চার মাস হয়ে গেলে এ বাচ্চা গর্ভপাত করা বৈধ নয়। হ্যাঁ, যদি বাচ্চাকে বাঁচানোর যথাসাধ্য চেষ্টার পর একাধিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তারা এ কথা বলে যে, বাচ্চাকে তার মায়ের পেটে রেখে দিতে গেলে এ বাচ্চা তার মায়ের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তাহলে দুই ক্ষতির মধ্য হতে মারাত্মক ক্ষতিকে প্রতিহত করার ও বড় উপকারকে অর্জনের লক্ষ্যে বাচ্চা গর্ভপাত করা বৈধ হবে।[২৪৬]

এর একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত ও নযীর এ হতে পারে যে,

منها: جواز الرمى إلى كفار تترسوا بصبيان المسلمين .[২৪৭]

অর্থাৎ মুসলিম ও অমুসলিমদের যুদ্ধের সময় যদি কাফেররা মুসলমান বাচ্চাদেরকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে, তাহলে তাদের দিকে তীর, গুলি ইত্যাদি নিক্ষেপ করা বৈধ।[২৪৮] যদিও এতে মুসলমান বাচ্চারা মারা যায়। কেননা তীর বা গুলি নিক্ষেপ না করলেও ঐ বাচ্চাগুলোর জীবন কাফেরদের হাতে নিশ্চিত নয়। আর তীর বা গুলি নিক্ষেপ করলে কাফেররা পরাজিত হবে, এতে বহু মুসলমানের জীবন নিশ্চিত।

---

245 الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضي ، ١: ٢٨١ .

২৪৬ আল ফাতাওয়াল মুতাআল্লিকা বিততিব্বি ওয়া আহকামিল মারযা, খ. ১, পৃ. ২৮১

247 الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص: ٨٧ .

২৪৮ আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ির, ইবনে নুজায়িম মিসরী, পৃ. ৮৭

কারণ তীর বা গুলি নিক্ষেপ না করার ক্ষেত্রে কাফেররা বিজয়ী হলে তারা হাজারো মুসলমানের জীবন নাশ করে দিবে। আর মুসলমান বাচ্চাদের (যাদেরকে কাফেররা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে) দিকে তীর বা গুলি নিক্ষেপ করার ক্ষেত্রে মুসলমানরা বিজয়ী হলে কিছু মুসলিম বাচ্চাদের অনিশ্চিত জীবন নাশ হবে। কিন্তু হাজারো মুসলমানের জীবন রক্ষা হবে। তাই অনিশ্চিত জীবন নাশ করে নিশ্চিত জীবন রক্ষা করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। পূর্বোক্ত মাসআলাতেও ছয় মাসের কম বয়সের বাচ্চার অনিশ্চিত জীবনকে হত্যা করে মায়ের নিশ্চিত জীবনকে রক্ষা করা হবে মাত্র। তাই একে অযৌক্তিক বলা যাবে না।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, যদি কেউ অন্যকে বাধ্য করে যে, তুমি অমুক ব্যক্তিকে হত্যা কর, অন্যথায় তোমাকে হত্যা করা হবে। এ ক্ষেত্রে তো নিজের জীবন বাঁচানোর লক্ষ্যে অন্যকে হত্যা করা বৈধ হয় না। অতএব, মা ও বাচ্চার ক্ষেত্রেও মায়ের জীবন বাঁচানোর লক্ষ্যে বাচ্চার জীবন নষ্ট করা বৈধ হবে না।

উত্তর ঃ এক্ষেত্রে যাকে বাধ্য করা হচ্ছে আর যাকে হত্যা করার কথা বলা হচ্ছে উভয়জনের জীবন এক সমান। কাউকে হত্যা না করলে উভয়জনই বাঁচবে। পক্ষান্তরে মা ও বাচ্চার জীবন এক সমান নয়। কেননা বাচ্চা ছয় মাসের আগে হলে বাঁচবে না, বরং তার মারা যাওয়া নিশ্চিত। তাই উক্ত যুক্তিটি অযৌক্তিক তথা قياس مع الفارق। এ জন্যই তো এমন বাচ্চাকে মেরে ফেললে কিসাস ওয়াজিব হয় না।

❖ ❖ ❖

نقل العضو

অঙ্গ স্থানান্তর

ORGAN DISPLACEMENT

নিজ দেহের কোন অঙ্গ অন্য স্থানে স্থানান্তর

নিজ দেহের কোন অঙ্গ এক স্থান থেকে সরিয়ে নিয়ে অন্য স্থানে সংযোজন করা নিম্নে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে বৈধ ও জায়েয:

১. অঙ্গ সরানোর দ্বারা যে ক্ষতি হবে অন্য জায়গায় সংযোজন করলে ঐ ক্ষতির তুলনায় অধিক উপকার হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকা।

২. কোন অঙ্গ নষ্ট কিংবা অকেজো হয়ে যাওয়া। যেমন- দেহের কোন জায়গার রগ বা চামড়া নষ্ট অথবা অকেজো হয়ে গেছে, তাই অন্য জায়গা থেকে রগ বা চামড়া কেটে এনে এখানে জোড়া দেয়া।

৩. কোন অঙ্গের আকৃতি নষ্ট হয়ে যাওয়া। তাই অন্য জায়গা থেকে কিছু গোস্ত কেটে এনে বিকৃত আকৃতিকে ঠিক করে দেয়া।

৪. কোন দোষ তথা বিশ্রী অবস্থা দূর করার জন্য হওয়া। যেমন, পঁচন ধরার কিংবা পুড়ে যাওয়ার কারণে কোন অঙ্গ বিকৃত হয়ে গেছে। তাই অন্যস্থান থেকে গোস্ত কিংবা চামড়া এনে ঐ বিশ্রী অঙ্গ সুশ্রী করে দেয়া।

৫. কোন অঙ্গ এমন কুৎসিত হওয়া যা অন্যের জন্য ঘৃণা অথবা কষ্টের কারণ হয়। যেমন, একজিমা কিংবা পুঁজ পড়া ইত্যাদি। তাই দূষিত অঙ্গটি কেটে ফেলে দিয়ে অন্যস্থান থেকে কিছু অংশ কেটে এনে এখানে লাগিয়ে দেয়া। যাতে করে ঐ অঙ্গ আর কুৎসিত বা ঘৃণিত না থাকে ইত্যাদি।[২৪৯]

---

249 قرارات مجمع الفقه الإسلامي بجدة ، العــدد: ٤ ، الجــزاء: ١، رقــم القــرار (١) ٨٨/٠٨/٤ م ، ص : ٩، مع إيضاح .

ক্বারারাতু মাজাল্লাতি মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী, জিদ্দা, সংখ্যা. ৪, খ. ১, পৃ. ৫০৭, কারার নং (১) ৪/০৮/৮৮, পৃ. ৯। [সামান্য ব্যাখ্যা সহ]

গুপ্তাঙ্গ সংযোজন

একজনের গুপ্তাঙ্গ অপরজনের দেহে সংযোজন বৈধ নয়। কারণ এতে অন্যের সতর দেখার গুনাহ সর্বদা হতেই থাকবে।

জীবিত মানুষের দেহে অন্যের উপকারার্থে অস্ত্রোপচার

একজনের অঙ্গ অন্যজনের দেহে সংযোজন

জীবিত মানুষের দেহে অন্যের উপকারার্থে অস্ত্রোপচার একজনের দেহের কোন অংশ অন্যজনের দেহে স্থানান্তরের জন্য হয়ে থাকে। অঙ্গ হিসেবে এ বিষয়টিকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

(১) অঙ্গটি এমন হওয়া যার উপর মানুষের জীবন নির্ভরশীল। এ ধরণের অঙ্গও আবার দুই প্রকার। যথা:

(ক) এমন অঙ্গ যা একজনের দেহে একটিই থাকে। যেমন- হার্ট, কলিজা ও ব্রেন ইত্যাদি। এ ধরনের অঙ্গ স্থানান্তরের জন্য অস্ত্রোপচার ও এগুলো স্থানন্তর করা কোন ক্রমেই বৈধ নয়, হারাম। কারণ, এতে যার অঙ্গটি নেয়া হবে সে মারা যাবে। একজনের জীবন বাঁচানোর জন্য আরেকজনের জীবন নষ্ট করা বৈধ নয়, হারাম।

(খ) এমন অঙ্গ যা দেহে একাধিক থাকে। যেমন, কিডনি ও ফুসফুস ইত্যাদি। শরীআতে নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে এর জন্য অস্ত্রোপচার ও এ ধরনের অঙ্গ স্থানান্তর করা জায়েয ও বৈধ।

শর্তগুলো হল ঃ

১. যার দেহের অঙ্গ নেয়া হচ্ছে তার অনুমতি নেয়া।
২. অঙ্গ সংযোজন না করলে রুগীর মারা যাওয়া প্রায় নিশ্চিত হওয়া।
৩. বিজ্ঞ ডাক্তারের এ কথা বলা যে, এতে রুগীর জীবন বেঁচে যাবে। আর অঙ্গদাতার তেমন মারাত্মক কোন ক্ষতি হবে না, ইত্যাদি।

(২) এমন অঙ্গ যার উপর জীবন নির্ভরশীল নয়। তবে অঙ্গটি মানুষের মৌলিক কাজে ব্যবহার হয়। যেমন, চক্ষু। এ ধরণের অঙ্গ সমূলে অন্যকে দিয়ে দেয়ার জন্য অস্ত্রোপচার বৈধ নয়। অতএব, কেহ যদি উভয় চক্ষু অন্য কাউকে দিয়ে দিতে চায় তা বৈধ হবে না। এক চক্ষু দেয়া বৈধ কিনা তা এখনও বিবেচনাধীন।

(৩) অঙ্গটি এমন হওয়া যা সরিয়ে নিলে পুনরায় আবার নতুন করে সৃষ্টি হয়ে যায়। যেমন, রক্ত ও চামড়া ইত্যাদি। এগুলো স্থানান্তর **১**নং এর 'খ' এ উল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষে জায়েয ও বৈধ।

(৪) ঐ সমস্ত অঙ্গ যা কারোর দেহ থেকে এমনিতেই পৃথক হয়ে গেছে অথবা কোন কারণবশতঃ পৃথক করা হয়েছে তবে তা আর পুনরায় ঐ দেহে লাগানো হবে না, এমন অঙ্গ অন্যের দেহে সংযোজনের মাধ্যমে উপকৃত হওয়া বৈধ।[২৫০]

এ সম্পর্কে দলীল ভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা নিম্নে করা হল:

একজন মানুষের অঙ্গ দ্বারা অপরের অঙ্গের কাজ নেয়ার ও চিকিৎসা করার যদিও অনেক উপকারিতা রয়েছে; কিন্তু এর কিছু ক্ষতিকর দিকও রয়েছে। উপকারের দিকে লক্ষ্য রেখে কেউ কেউ একজনের অঙ্গ অপরজনের দেহে সংযোজন করাকে জায়েয মনে করেন। দলীল হিসেবে তারা কিছু ফিকহী কায়দা ও মূলনীতি যেমন,'الضرورات تبيح المحظورات' এবং 'المشقة تجلب التيسير' ইত্যাদি পেশ করে থাকেন।

পক্ষান্তরে, ক্ষতিকর দিকগুলোর দিকে লক্ষ্য রেখে কেউ কেউ একজনের অঙ্গ অপরজনের অঙ্গের সাথে সংযোজন করাকে নাজায়েয মনে করেন এবং ঐ সমস্ত দলীল পেশ করে থাকেন, যা মৃত দেহে অস্ত্রোপচার

---

250 قرارات مجمع الفقه الإسلامي، العدد: ٤، الجزاء: ١، رقم القـــرار (١) ٤/٠٨/٨٨م ص ١٠، مع إيضاح .

ক্বারারাতু মাজাল্লাতি মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী। জিদ্দা, সংঘা, ৪, খ. ১, পৃ. ৫০৭, কারার নং (১) ৪/০৮/৮৮৩, পৃ. ১০।

অধ্যায়ে নাজায়েযের প্রবক্তাগণের স্বপক্ষে উল্লেখ করা হবে। বিশেষ করে এতে মানব অঙ্গের অসম্মান হয় ও পরবর্তীতে মানব অঙ্গগুলো অন্যান্য পণ্যের ন্যায় বাজারে বেচা-কেনা হওয়ার প্রবল আশংকা রয়েছে। মুফতী আযম পাকিস্তান হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ.), আল্লামা ইউছুফ বিন্নুরী (রহ.), মুফতী রশীদ আহমাদ লুধিয়ানভী (রহ.) ও মুফতী ওয়ালী হাসান টোংকী (রহ.) প্রমুখ উল্লিখিত আশংকার কারণে অঙ্গ সংযোজনকে নাজায়েয মনে করেন।

এখানে দেখার বিষয় হল, যে মান-অপমানের ভিত্তি ও মাপকাঠি কী? এবং তা নির্ধারণ করবে কে? গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝে আসে যে, মান-অপমান নির্ধারণ করার মাপকাঠি তিনটি। যথা-

(১) শরী'আত [شريعة]।

(২) বিবেক-বুদ্ধি [عقل]।

(৩) ও সমাজ [عرف]।

শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত মান-অপমানের মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয় না। বিবেক ও আকল সব সময় ও সর্ব ক্ষেত্রে মান-অপমান নির্ধারণ করতে পারে না।[২৫১]

কেননা, বিবেক-বুদ্ধি প্রদীপতুল্য। আর প্রদীপের কাজ রাস্তা দেখানো, রাস্তা চেনানো নয়।[২৫২]

---

২৫১ নূরুল আনওয়ার, পৃ. ৪৪

نور الأنوار، مبحث الأمر، ص: ٤٤، وحاشيته للشيخ عبد الحليم اللكنوى .

২৫২ এ সম্পর্কে ডক্টর ইকবাল মরহুম সুন্দর উক্তি পেশ করেছেনঃ

خرد کیا ہے چراغِ رہ گذر ہے ☆ خرد سے راہرو وروشن بصر ہے

دوورون خانہ ہنگامہ ہے کیا کیا ☆ چراغ رہگذار کو کیا خبر ہے

خرد واقف نہیں ہے نیک وبد سے ☆ بڑھی جاتی ظالم اپنی حد سے

অর্থ- "বিবেক-বুদ্ধি পথিকের চেরাগ মাত্র। ও পথিক! (বিবেক-বুদ্ধি নামক চেরাগের তুলনায়) চক্ষু অধিক উজ্জল। ঘরের অভ্যন্তরে কী ঘটছে পথিকের বাতি তা কী বুঝবে? বিবেক-বুদ্ধি ভাল মন্দের ব্যাপারে অজ্ঞ (বিবেক-বুদ্ধি অনেক সময়) নিজ গন্ডি থেকে বেরিয়ে যায়।" ফলে পদস্খলন ঘটে।

দ্বিতীয়ত: সকলের বিবেক-বুদ্ধি এক রকম হয় না। কার বিবেক কে মাপকাঠি হিসেবে ধরা হবে তা নির্ণয় করবে কে?

মান-অপমান নির্ধারণ করার তৃতীয় ভিত্তি সমাজ, যা পরিবর্তনশীল। কখনো কোন কাজ সমাজের দৃষ্টিতে ভাল হিসেবে বিবেচিত হয়, আবার পরবর্তীতে ঐ কাজটি মন্দ ও খারাপ কাজ হিসেবে আখ্যায়িত হয়। আবার কোন কাজ কোন সমাজে ভাল মনে করা হয়, অন্য সমাজে ঐ কাজটি খুবই খারাপ হিসেবে বিবেচিত হয়। এ জন্যই যেখানে শরীআতের পক্ষ থেকে কোন কিছু উল্লেখ থাকে, সেখানে আকল ও সমাজের উপর মান-অপমানের ভিত্তি রাখা যায় না, আর যেখানে শরী'আত চুপ থাকে সেখানেই আকল ও সমাজকে ভাল-মন্দ নির্ণয়কারী বিবেচনা করা যায়।

উল্লিখিত ব্যাখ্যাকে সামনে রেখে দেখা যেতে পারে যে, বর্তমানে যে পদ্ধতিতে এক দেহের অঙ্গ অন্য দেহের অঙ্গের সাথে সংযোজন করা হয় তা বাস্তবে অপমানজনক কি না?

ইসলামের দৃষ্টিতে মানব জাতি সর্বাধিক সম্মানিত। এজন্য মানব জাতির মানহানি ও অসম্মান শরীআতে জায়েয নেই। কিন্তু কুরআন ও হাদীসে কোথাও মানব জাতির ইজ্জত ও সম্মানের এমন কোন কাঠামো ও সীমারেখা নির্ধারণ করা হয়নি যে, এমন করলে সম্মান করা হবে আর এমন করলে অসম্মান করা হবে। আর এ ক্ষেত্রে সম্মান ও অসম্মানের মাপকাঠি হিসেবে সমাজকেই সামনে রাখা হয়।

قال الفقهاء أيضا: كل ما ورد به الشرع مطلقا، ولا ضابط له فيه، ولا فى اللغة، يرجع فيه إلى العرف،كالحرزفى السرقة.[٢٥٣]

অর্থ- ফুকাহায়ে কিরাম বলেনঃ যে সব বিষয় সম্পর্কে শরীআতের বিধান নিরংকুশ এবং শরী'আত ও অভিধানেও এর কোন নিয়ম-নীতি উল্লেখ নেই, সে সব বিষয়ে সামাজিক প্রচলনের আশ্রয় নেয়া হয়। যেমন, চুরির ব্যাপারে সম্পদের সংরক্ষণ ইত্যাদি।[২৫৪]

---

253 أصول الفقه الإسلامى، ٢: ٨٣١ .

২৫৪ উসূলুল ফিকহিল ইসলামী, খ. ২, পৃ. ৮৩১

যেমন, সংরক্ষিত মাল চুরি করলে চোরের হাত কাটা হয়। অরক্ষিত মাল চুরি করলে হাত কাটা হয় না। এখন কোন অবস্থাকে রক্ষিত বলা হবে আর কোন অবস্থাকে অরক্ষিত, এ ব্যাপারে শরীআতে স্পষ্ট কোন মাপকাঠি উল্লেখ নেই। অতএব, এ ক্ষেত্রে সামাজিক প্রচলনের আশ্রয় নিয়ে রক্ষিত ও অরক্ষিত বিবেচনা করা হবে।

সামাজিক প্রথা ও প্রচলন পরিবর্তনশীল

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, কিছু কিছু সামাজিক প্রথা ও প্রচলন স্থান ও যুগের ভিন্নতার কারণে পরিবর্তন হয়ে থাকে। একই প্রথা ও প্রচলন স্থান-কালের ভিন্নতার কারণে সেই প্রথা ও প্রচলন বিপরীতমুখী বিচার-বিশ্লেষিত হয়। কখনো কোনো কাজ সামাজিকভাবে সঠিক ও ভাল মনে করা হয়। আবার পরবর্তীতে হুবহু সে কাজটিই সামাজিক ভাবে ভুল ও মন্দ বলে বিবেচিত হয়।
ইমাম আবূ ইস্‌হাক শাতিবী (রহ.) বলেনঃ

والمتبدلة: منها: مايكون متبدلاً فى العادة من حسن إلى قبح، وبالعكس؛ مثل كشف الرأس، فإنه يختلف بحسب البقاع فى الواقع، فهو لذوى المروات قبيح فى البلاد المشرقية، وغير قبيح فى البلاد المغربية، فالحكم الشرعى يختلف باختلاف ذلك، فيكون عند أهل المشرق قادحا فى العدالة، وعند أهل المغرب غير قادح .[٢٥٥] وهو مذهب الحنفية .[٢٥٦]

অর্থ- যে সমস্ত বিষয় পরিবর্তনশীল তম্মধ্য হতে সামাজিক প্রথা ও প্রচলনও একটি পরিবর্তনশীল বিষয়। অর্থাৎ কখনো কোন সামাজিক

---

255 الموافقات فى أصول الشريعة لأبى إسحاق الشاطبى، القسم الثالث،كتاب المقاصد، المسئلة الرابعة عشر، ٢: ٢١٦ .

256 أصول الإفتاء لشيخ الإسلام العلامة محمد تقى العثمانى، تحت العنوان: "تغير الحكم بتغير العرف"، ص: ١٣٣-١٣٨ .

প্রচলন ভাল মনে করা হয়, পরবর্তীতে তা মন্দ হিসেবে বিবেচিত হয়। আবার কখনো কোন প্রচলন মন্দ মনে করা হয়, পরবর্তীতে তা ভাল হিসেবে বিবেচিত হয়। যেমন- মাথা খোলা রাখা, অর্থাৎ মাথায় টুপি ব্যবহার না করা, স্থান ও কালের বিভিন্নতার কারণে পরিবর্তন হয়েছে। প্রাচ্যের দেশ সমূহে মাথা খোলা রাখা ভদ্র, মান্য ও সম্মানিত লোকদের দৃষ্টিতে মন্দ মনে করা হয়। পক্ষান্তরে, পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে মন্দ মনে করা হয়না। এ ক্ষেত্রে শরীআতের হুকুম দুই এলাকার জন্য ভিন্ন ভিন্ন হবে। অতএব, মাথা খোলা রাখা অর্থাৎ টুপি ব্যবহার না করা প্রাচ্যের দেশ গুলোতে সাক্ষ্য প্রদানের উপযুক্ততার পরিপন্থী। পক্ষান্তরে পাশ্চত্যের দেশ গুলোতে মাথা খোলা রাখা সাক্ষ্য প্রদানের উপযুক্ততার পরিপন্থী নয়।[২৫৭] হানাফী মাযহাবের মতামতও এমনই।[২৫৮]

তেমনিভাবে কালের পরিবর্তনে প্রাচ্যের দেশগুলোতেও মাথা খোলা রাখা বর্তমানে দোষনীয় রয়নি। অতএব, যারা টুপি ব্যবহার করেনা তাদেরকে এ কারণে সাক্ষ্য প্রদানে অনুপযুক্ত বলা যাবে না।

তেমনিভাবে ইসলামী শরী'আত যেহেতু মানব সম্মান ও অসম্মানের নির্দিষ্ট কোন নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করেনি, তাই সর্বকালে ও সর্বক্ষেত্রে ঐ যুগ ও এলাকার প্রচলনের আলোকেই কোন বিষয়ের সম্মান ও অসম্মানের সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

ফুকাহায়ে কিরাম মানব অঙ্গ দ্বারা উপকৃত হওয়াকে নিষেধ করেছেন ঠিক, কিন্তু এ নিষেধাজ্ঞার কারণ এ ছিল যে, ঐ সময় মানব অঙ্গ থেকে উপকৃত হওয়াকে অসম্মান মনে করা হত এবং ঐ যুগে এমন পদ্ধতির প্রচলনও ছিল না যে, সম্মানজনক পন্থায় মানব অঙ্গ থেকে উপকৃত হওয়া যায়। পক্ষান্তরে, বর্তমান যুগে এ কাজকে অসম্মান মনে করা হয় না। অধিকন্তু একে সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ মনে করা হয়। তাই বড় বড় বুদ্ধিজীবীগণ মৃত্যুকালে নিজের অঙ্গ দানের অসিয়ত করে যান। আর এ

---

২৫৭ আল মুওয়াফাকাত, ইমাম শাতিবী রহ., খ. ২, পৃ. ২১৬

২৫৮ উসূলুল ইফতা, শায়খুল ইসলাম আল্লামা মুফতী তাকী উসমানী দা. বা., পৃ. ১৩৩-১৩৮

অসিয়ত তাদের সুনামের কারণ হয় এবং একে তারা মানব সেবার অন্যতম মাধ্যম মনে করেন। এ হিসেবে এক জনের অঙ্গ অন্য জনের অঙ্গের সাথে সংযোজন ও তা ব্যবহার বৈধ হওয়া বাঞ্চনীয়।

দ্বিতীয়তঃ এক জনের রক্ত অপর জনের দেহে প্রবেশ করানো প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে বৈধতার ফতোয়া দেয়া হয়েছে। অথচ রক্ত মানব দেহেরই একটি অংশ। রক্তকে যদিও দুধের সাথে তুলনা করে এ ফতোয়া প্রদান করা হয়েছে কিন্তু এ তুলনাটি পুরোপুরিভাবে সঠিক হয়েছে ও রক্তের সাথে মিল খেয়েছে বলা যায় না। কারণ, দুধের সৃষ্টি এজন্যই যে, তা এক দেহ থেকে বেরিয়ে অন্য দেহের উপকারে আসবে। পক্ষান্তরে, রক্ত দেহের ভিতরে থেকেই দেহের কাজে লাগবে। তথাপিও তা অন্যের দেহে প্রবেশ করানো বৈধ বলে বিবেচিত হয়েছে। তাই রক্তের সাথে তুলনা করে অন্যান্য অঙ্গের ব্যাপারেও এই হুকুম তথা বৈধতার হুকুম দেয়া যায়।

তৃতীয়তঃ জীবন রক্ষার স্বার্থে অনেক ক্ষেত্রে সম্মানিত বস্তুর অসম্মান কে মেনে নেয়া হয়। যেমন, সিজার ও মানব দেহের অস্ত্রোপচার অধ্যায়ে মায়ের পেট কেটে বাচ্চা বের করার মাসআলা উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন শরীফ এর সম্মান মানব অঙ্গ থেকে অনেক বেশি এমন কি বিনা ওযুতে কুরআন শরীফ স্পর্শ করা জায়েয নেই। আর ফরয গোসল অবস্থায় তা ধরা ও পড়া কোনটিই জায়েয নেই। তথাপি মানুষের চিকিৎসার স্বার্থে রক্তের মত নাপাক বস্তু দিয়ে তা লেখাকে জায়েয বলা হয়েছে।

إذا سال الدم من أنف إنسان ولا ينقطع حتى يخشى عليه الموت، وقد علم أنه لو كتب فاتحة الكتاب أو الإخلاص بذلك الدم على جبهته ينقطع، فلا يرخص له ما فيه، وقيل: يرخص كما رخص فى شرب الخمر للعطشان وأكل الميتة فى المخمصة. وهو الفتوى.[٢٥٩]

259 رد المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، مطلب فى التداوى بالمحرم، قبيل فصل البئر، ١: ٣٦٥، عن الحاوى القدسي .

অর্থ- যদি কারো নাক থেকে রক্ত প্রবাহিত হয় আর তা বন্ধ না হওয়ার ফলে মৃত্যুর আশংকা দেখা দেয় এবং প্রবল ধারণা হয় যে, তার কপালে ঐ রক্ত দিয়ে সূরা ফাতিহা অথবা সূরা ইখলাস লিখলে রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে, তাহলে তার জন্য এর অনুমতি নেই। তবে এটাও বলা হয়েছে যে, তার জন্য এর অনুমতি রয়েছে। যেমনিভাবে পিপাসার্ত ব্যক্তির পিপাসা নিবারণের জন্য (কোন হালাল পানীয় বস্তু না পেলে) মদ পান করার এবং ক্ষুধায় মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তির জন্য (কোন হালাল খাবার না পেলে) মৃত প্রাণীর গোস্ত খাওয়ার অনুমতি রয়েছে আর এর উপর ফতোয়া প্রদান করা হয়েছে।[২৬০]

ইমদাদুল ফাতাওয়ায়ে উল্লেখ আছেঃ

এ ধরণের চিকিৎসা নাজায়েয না বললেও কুরআনের শ্রদ্ধা ও মাহাত্ম্যের দিকে লক্ষ্য করে এমন চিকিৎসা গ্রহণ না করাকেই উত্তম বলা হয়েছে।[২৬১] অর্থাৎ হযরত থানভী (রহ.) এ চিকিৎসাকে অনুত্তম বলেছেন। কিন্তু জায়েয হওয়ার মতটিও মেনে নিয়েছেন।

তেমনিভাবে মৃত প্রাণীর চামড়ায় লেখাও নাজায়েয নয়।[২৬২]

অতএব, জীবন রক্ষার খাতিরে মানব সম্মান হানি হলেও তা মেনে নেয়া অযৌক্তিক নয়।

وذكر العلامة ابن قدامة، إن عند بعض الحنفية يباح للمضطر أكل لحم الإنسان الميت ... ثم قال ... وهو أولى، لأن حرمة الحى أعظم.[٢٦٣]

---

২৬০ রদ্দুল মুহতার, খ. ১, পৃ. ৩৬৫

২৬১ ইমদাদুল ফাতাওয়া, খ. 8, পৃ. ৩৬-৩৮

262 خلاصة الفتاوى،كتاب الكراهية، الفصل الخامس فى الأكل، تحت عنوان: ومن السنة، ٤: ٣٦٠ .

খুলাছাতুল ফাতাওয়া, খ. 8, পৃ. ৩৬০

263 المغني، كتاب الذبائح، مبحث المضطر، مسئلة ومن اضطر فأصاب الميتة الخ مع الشرح الكبير، ١١: ٨١ .

وأما فى كتبنا الحنفية فلم أجد تصريحه فيها غير أنه يفهم من قول ابن نجيم فى الأشباه، (ص: ٤٥٥) : ''الصيد أولى من لحم الإنسان'' أنه لم يجد شيئا غير لحم الإنسان الميت يباح له أكله.[٢٦٤]

অর্থ- ইবনে কুদামা (রহ.) বলেনঃ কোন কোন হানাফী আলেমগণের মতে নিরুপায় ব্যক্তির জন্য মৃত মানুষের গোস্ত খাওয়া জায়েয আছে। অতঃপর তিনি বলেন, এমন করাই উত্তম। কেননা জীবিত ব্যক্তির সম্মান মৃতের তুলনায় অনেক বেশি।[২৬৫]

আমাদের হানাফী মাযহাবের ফিক্‌হের কিতাব সমূহে এ ব্যাপারে স্পষ্ট কোন বক্তব্য পাইনি। তবে ইবনে নুজাইমের প্রসিদ্ধ কিতাব আল আশবাহ এর একটি কথা থেকে বিষয়টি প্রতীয়মান হয়। কথাটি হল ''الصيد أولى من لحم الإنسان'' তথা কোন ইহরাম বাঁধা ব্যক্তি ক্ষুধার তাড়নায় মারা যাওয়ার উপক্রম হলে তার ক্ষুধা নিবারণের জন্য মক্কার হেরেমের ভিতরের শিকার ও মানুষের গোস্ত ব্যতীত অন্য কিছু না পেলে উভয়টি হারাম হওয়া সত্ত্বেও মানুষের গোস্তের তুলনায় শিকারের গোস্ত খাওয়া উত্তম।

এ থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যদি মানুষের গোস্ত ব্যতীত অন্য কিছু না পায় তাহলে এমন অবস্থায় জীবন রক্ষার্থে মানুষের গোস্ত খাওয়াও বৈধ।[২৬৬]

সুতরাং মানুষের গোস্ত খাওয়ার কারণে তার মানহানি হওয়া সত্ত্বেও জীবন বাঁচানোর জন্য বৈধ হলে; খাওয়া ব্যতীত অন্য কোন পন্থায় তার কোন অঙ্গ কাজে লাগানো বৈধ হওয়াই অধিক যুক্তিসঙ্গত।

এখানে ''كسر عظم الميت ككسره حيا'' ও ''لعن الله الواصلة والمستوصلة'' হাদীসদ্বয়ের কারণে সন্দেহ না করা উচিত। কারণ, এখানে

---

264 الشرح الناصر [تسكين الأرواح]، تحت القاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، ٦: ٣٦٦.

২৬৫ আল মুগনী, খ. ১১, পৃ. ৮১

২৬৬ আশ শারহুন নাযির [তাসকীনুল আরওয়াহ], খ. ৬, পৃ. ৩৬৬

প্রথম হাদীসে বিনা প্রয়োজনে মৃতের হাড় ভাঙ্গাকে জীবিত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গার মতই অপরাধ বলা হয়েছে। প্রয়োজনে এমন করলে তা এ নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত হবে না।

এজন্যই তো পেট কেটে বাচ্চা বের করা এবং কারো কোন কিছু খেয়ে মারা গেলে পেট কেটে তা বের করার অনুমতি রয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা মৃত দেহের অস্ত্রোপচার অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

আর দ্বিতীয় হাদীস দ্বারাও এর বিপরীত দলীল পেশ করা সঠিক হবে না। কারণ, বিনা প্রয়োজনে শুধু সাজ-সজ্জার উদ্দেশ্যে যারা এমন করে তাদের লা'নত করা হয়েছে। আমাদের আলোচিত মাসআলার ক্ষেত্রে অঙ্গ সংযোজন বিনা প্রয়োজনে করা হয় না। অতএব, তা হাদীসে বর্ণিত লা'নতের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

আলোচনার সার সংক্ষেপ

উক্ত আলোচনার সার সংক্ষেপ এই যে, বর্তমানে একজনের দেহের অঙ্গ অন্য জনের দেহে সংযোজনের যে পন্থা ও পদ্ধতি আবিস্কৃত হয়েছে তা মানব সম্মানের পরিপন্থী নয়। অতএব, এমন করা নাজায়েযও নয়, তবে এর জন্য নিম্নে বর্ণিত শর্তগুলো পাওয়া যাওয়া আবশ্যক:

১. রোগীর প্রাণ রক্ষা উদ্দেশ্য হতে হবে, অথবা কোন গুরুত্বপূর্ণ অচল অঙ্গ সচল করা উদ্দেশ্য হতে হবে। যেমনঃ দৃষ্টি শক্তি ইত্যাদি। অর্থাৎ কারো দৃষ্টি শক্তি কিংবা দৃষ্টি শক্তির ন্যায় কোন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ অচল হয়ে গেলে তা সচল করা উদ্দেশ্য হতে হবে।

২. কোন বিজ্ঞ ডাক্তারের এ কথা বলতে হবে যে, এমন করলে সুস্থতা ফিরে পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

৩. মৃত ব্যক্তির কোন অঙ্গ নিতে হলে তার জীবদ্দশায় এর অনুমতি দিয়ে যেতে হবে। কেননা সে এক হিসেবে নিজের দেহের মালিক।

৪. তার ওয়ারিশদেরও অনুমতি থাকতে হবে। কেননা মৃত্যুর পর ওয়ারিশগণ তার লাশের অবিভাবক। এজন্যই তো ঘাতকের কিসাসের দাবির অধিকার তাদের।

৫. জীবিত ব্যক্তির অঙ্গ নিতে হলে তার অনুমতি আবশ্যক এবং এতে তার বড় ধরণের কোন ক্ষতি না হতে হবে। কারণ, এক ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য তার সমপরিমাণ কিংবা এর চেয়েও বড় ক্ষতির সম্মুখিন হওয়া বৈধ নয়।

আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ির এ আছে,

"الضرر لا يزال بالضرر." [২৬৭]

অর্থ- "এক ক্ষতির মাধ্যমে অপর ক্ষতি দূর করা হয় না।" কেননা এতে কোন লাভ নেই।[২৬৮]

মুসলমানের দেহে অমুসলমানের অঙ্গ সংযোজন

কোন অমুসলমানের রক্ত গ্রহণ জায়েয হওয়া থেকে এ মাসআলা বের হয়ে আসে যে, প্রয়োজন বোধে মুসলমানের দেহে অমুসলিমের অঙ্গও সংযোজন করা যাবে। তবে "মুসলিমদের জন্য অমুসলিমদের রক্তগ্রহণ" শিরোনামে যে কারণ দর্শিয়ে তাদের রক্তগ্রহণ করা থেকে যথাসাধ্য বিরত থাকাকে শ্রেয় বলা হয়েছে, সে কারণটি এখানেও বিদ্যমান বিধায় তাদের অঙ্গ সংযোজন থেকেও মুসলমানদের যথাসাধ্য বিরত থাকা শ্রেয়।

মানবদেহে অন্য কোন প্রাণীর অঙ্গ সংযোজন করা

কোন প্রাণীর হাড়, নখ ও দাঁত ইত্যাদি যে সমস্ত অঙ্গে প্রাণ সঞ্চার হয় না কিংবা নিতান্ত কম প্রাণ সঞ্চার হয়। তা দ্বারা মানব দেহের অচল

---

267 الأشباه والنظائر، تحت القاعدة الخامسة:"الضرر يزال"، ص: ٩٦ .

২৬৮ আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ির, পৃ. ৯৬

অঙ্গের কাজ নেয়ার প্রথা আদিকাল থেকে চলে আসছে। এ পদ্ধতিও শরীআতের দৃষ্টিতে অবৈধ নয়।

শরহে সিয়ারে কাবীর এ উল্লেখ আছে,

وفيه دليل فى جواز المداواة بعظم بال، وهذا لأن العظم لا يتنجس بالموات على أصلنا، لأنه لاحياة فيه إلا أن يكون عظم الإ نسان أو عظم الخنـــزير، فإنه يكره التداوى به، إلخ.[٢٦٩]

অর্থ- পুরাতন হাড় দ্বারা চিকিৎসা করা জায়েয আছে। কেননা মারা যাওয়ার কারণে হাড় নাপাক হয় না। কারণ হাড়ে জীবন থাকে না। (থাকলেও হাড়, নখ, চুল, দাঁত ও শিং ইত্যাদিতে অন্যান্য অঙ্গের তুলনায় প্রাণ সঞ্চার অত্যন্ত স্বল্প হওয়ার কারণে তা ধর্তব্য হয়না।) তবে মানুষ ও শূকরের হাড় দ্বারা চিকিৎসা করা জায়েয নেই, মাকরূহে তাহ্‌রীমী।[২৭০]

মানবদেহে কৃত্রিম অঙ্গ সংযোজন করা

আদিকাল থেকে মানুষের দাঁত ইত্যাদি কোন অঙ্গ অচল হয়ে পড়লে অন্য কোন জড় পদার্থ বা উদ্ভিদ দ্বারা তার বিকল্প ব্যবস্থা নেয়া হত। এভাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর অনুমতিক্রমে কোনো কোনো সাহাবী কৃত্রিম অঙ্গ ব্যবহার করেছেন।

হাদীসে আছেঃ

عن عبد الرحمن بن طرفة، أن جده عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من ورق فانتن عليه. فأمره النبى صلى الله عليه وسلم، فاتخذ أنفا من ذهب.[٢٧١]

---

269 شرح السير الكبير ، ١: ٩٠، طبع دكن .

২৭০ শরহে সিয়ারে কাবীর, খ. ১, পৃ. ৯০

271 رواه أبوداؤد فى الخاتم، باب ما جاء فى ربط الأسنان بالذهب، ٢: ٥٨١، رقم الحديث: ٤٢٢٦ .

অর্থ- আব্দুর রহমান বিন তরাফা (রাযি.) বর্ণনা করেন যে, তার দাদা আরফাজা বিন আসআদ (রাযি.) এর নাক 'কুলাব' যুদ্ধে কেটে যায়। তাই তিনি রুপার নাক বানিয়ে নেন, কিন্তু এতে দুর্গন্ধ দেখা দেয়। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর আদেশে তিনি একটি সোনার নাক বানিয়ে নেন।[২৭২]

অতএব, উল্লিখিত পদ্ধতি শরীআতের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণভাবে জায়েয ও বৈধ।

মানুষ ব্যতীত অন্য কোন প্রাণীর দেহে অস্ত্রোপচার

মানুষ ব্যতীত অন্য কোন প্রাণীর দেহে অস্ত্রোপচার বৈধ ও জায়েয। চাই তা জীবিত হোক কিংবা মৃত। তেমনিভাবে তার নিজের উপকারার্থে হোক কিংবা অন্য কোন প্রাণীর অথবা মানুষের।

আল্লাহ পাক বলেন,

هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا.[273]

অর্থ: তিনিই সে সত্তা যিনি যা কিছু যমীনে আছে সব কিছু তোমাদের উপকারার্থে সৃষ্টি করেছেন।[২৭৪]

এ আয়াত দ্বারা এ কথা পরিস্কার বুঝা যায় যে, এগুলো থেকে যে ভাবে উপকৃত হওয়া যায় সে ভাবে উপকৃত হওয়ার অনুমতি রয়েছে।

তিনি আরো বলেন,

إنا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون.[275]

অর্থ: আমি আমার নিজ হাতের তৈরী বস্তু দ্বারা তাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তারাই এগুলোর মালিক।[২৭৬]

---

২৭২ আবূ দাউদ, খ. ২, পৃ. ৫৮১, হাদীস নং ৪২২৬

273 سورة البقرة ، آية : ٢٩ .

২৭৪ সূরা বাকারা, আয়াত : ২৯

275 سورة يس ، آية : ٧١ .

২৭৬ সূরা ইয়াসিন, আয়াত : ৭১

মালিকের জন্য তার মালিকানাধীন বস্তুর উপর তার উপকারার্থে সব ধরণের হস্তক্ষেপ বৈধ। তবে বিনা প্রয়োজনে অহেতুক এদেরকে কষ্ট দেয়া মোটেও বৈধ নয় বরং হারাম।

পৃথককৃত অঙ্গ পুনস্থাপনের পর পাক থাকবে?

দেহের এক স্থানের অঙ্গ অন্য স্থানে স্থানান্তর করলে তদ্রুপ এক জনের অঙ্গ অন্যজনের দেহে সংযোজন করলে অথবা কোন প্রাণীর অঙ্গ সংযোজন করলে তা সংযোজনের পর পাক থাকবে কী না এ ব্যপারে দুইটি মতামত পাওয়া যায়।

এক. পাক থাকবে না, পৃথক হওয়ার পর থেকেই নাপাক হয়ে যাবে, এরপর আর পাক হবে না। কারণ হাদীস শরীফে আছে ঃ

عن أبي واقد الليثي –رضي الله تعالى عنه– ، عن النبي صلى الله عليه و سلم ، قال : ما قطع من البهيمة و هي حية ، فهو ميت .[٢٧٧]

অর্থ ঃ হযরত আবু ওয়াকিদ আল-লায়সী (রা.) বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ কোন জীবিত প্রাণী থেকে যে অঙ্গটিকে কেটে ফেলা হয়েছে তা মৃত।[২৭৮]

عن أبي سعيد الخدري –رضي الله عنه– : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن جباب أسنمة الإبل و إليات الغنم ، و قال : ما قطع من حي فهو ميت.[٢٧٩]

---

277 أخرجه الحاكم فى المستدرك ، في كتاب الذبائح ، ٥ : ٢١٨٨ ، رقم الحديث : ٧٧٦٠، و قال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، و وافقه الذهبي فى التلخيص .

২৭৮ আল মুস্তাদরাক লিল হাকেম, খ. ৫, পৃ. ২১৮৮, হাদীস নং ৭৭৬০

279 أخرجه الحاكم فى المستدرك ، في كتاب الذبائح ، ٥ : ٢١٨٨ ، رقم الحديث : ٧٧٦١، و قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، و وافقه الذهبي فى

অর্থ ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উটের কুঁজ ও দুম্বার নিতম্ব কেটে খাওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে উত্তরে তিনি বলেন ঃ জীবিত প্রাণী থেকে যা কিছু কেটে ফেলা হয় তা মুর্দা।[২৮০]

দ্বিতীয় মতামতটি হল, পৃথক করে জোড়া দেয়ার পর এর মধ্যে পুনরায় জীবন সঞ্চার হলে তা আর নাপাক থাকে না, পুনরায় পাক হয়ে যায়। আমার উস্তাদ শায়খুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী (দা.বা.) লিখেন ঃ

إن الأعضاء التي لا تحلها الحياة[٢٨١]، كالظفر، والسن، والشعير، لا تنجس بإبانتها من الآدمي الحي، ولكن الأعضاء التي تحلها الحياة، مثل الأذن والأنف وغيرها، فإنها تنجس بعد إبانتها من الحي، ولكن قرَّر المتأخرون منهم أنها ليست نجسة في حق صاحبها، فلو أعادها صاحبها إلى أصلها، لا يحكم بنجاستها، وإنما هي نجسة في حق غيره، فلو زرعها غير المقطوع منه في جسمه كانت نجسة ، وهذا أيضا إذا لم تحلها الحياة، أما إذا حلتها الحياة بعد الزرع، فلا نجاسة في حق الغير أيضاً .[٢٨٢]

التلخيص . و أخرجه الترمذي فى الصيد ، باب ما جاء ما قطع من الحي فهو ميت ، ١: ٢٧٣ ، رقم الحديث : ١٥٠٨ ، ١٥٠٩ .

২৮০ আল মুস্তাদরাক লিল হাকেম, খ. ৫, পৃ. ২১৮৮, হাদীস নং ৭৭৬১, জামে' তিরমিযী, খন্ড. ১, পৃ. ২৭৩, হাদীস নং ১৫০৮, ১৫০৯

281 وفى البدائع : إن كان جزءًا فيه دم كاليد و الأذن ، رد المحتار ، ١: ٢٠٧ .

অর্থাৎ বাদায়ে কিতাবে জীবন সঞ্চারের পরিবর্তে রক্ত প্রবাহমান হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। দেখুন, রদ্দুল মুহতার, খ. ১, পৃ. ২০৭। তার কথাটি অধিক যুক্তি সংগত। কেননা নখ, চুল ইত্যাদির মধ্যে জীবন আছে, তবে রক্ত নেই। জীবন না থাকলে মাঝে মধ্যে নখ মারা যেতে দেখা যায় তা কী করে সম্ভব?

282 بحوث في قضايا فقهية معاصرة لشيخ الإسلام المفتي محمد تقي العـــسماني ، ١: ٢٧٧، مقالة: رزاعة عضو استؤصل في حد .

অর্থ ঃ ঐ সমস্ত অঙ্গ যেগুলোর মধ্যে জীবন অনুভব হয় না, যেমন, নখ, দাঁত ও চুল ইত্যাদি। এগুলো জীবিত মানুষ থেকে পৃথক করলেও নাপাক হয় না। তবে যে সমস্ত অঙ্গে অনুভাবিত জীবন থাকে। যেমন, কান ও নাক ইত্যাদি এগুলো জীবিত মানুষের দেহ থেকে পৃথক করার পর নাপাক হয়ে যায়। কিন্তু পরবর্তী ফকীহদের সিদ্ধান্ত হল এই যে, যার দেহ থেকে অঙ্গ পৃথক করা হয়েছে তার বেলায় ঐ পৃথককৃত অঙ্গটি নাপাক নয়, অন্যের বেলায় নাপাক। অতএব যদি অঙ্গটি ঐ ব্যক্তির দেহে পুনরায় জোড়া দিয়ে দেয়া হয় যার দেহ থেকে অঙ্গটি পৃথক করা হয়েছে তাহলে একে নাপাকের হুকম দেয়া যাবে না। তবে হ্যাঁ, অন্যের দেহে একে জোড়া দিলে তা নাপাক থাকবে। আর এ নাপাক থাকার হুকুমও তখন হবে যখন এর মধ্যে জীবন ফিরে না আসে। জোড়া দেয়ার পর জীবন ফিরে আসলে এ দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্যও আর নাপাক থাকবে না।[২৮৩]

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

এখানে প্রশ্ন হয় যে, অঙ্গটি পৃথক হওয়ার কারণে নাপাক হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় নাপাক বস্তু আবার পাক হয় কী করে? এর উত্তরে হযরত মাকদিসী (রহ.) বলেন ঃ

و الجواب عن الإشكال ، أن إعادة الأذن و ثباتها إنما يكون غالبا بعود الحياة إليها ، فلا يصدق أنها مما أبين من الحي ، لأنها بعود الحياة إليها صارت كأنها لم تبن ، و لو فرضنا شخصا مات ، ثم أعيدت حياته معجزة ، أو كرامة ، لعاد طاهرا .[٢٨٤]

---

২৮৩ বুহূস ফী কাযায়া ফিকহিয়্যা মু'আছারাহ, শায়খুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী, খ. ১, পৃ. ২৭৭, মাকালা: যিরাআতু উযভিন উসতু'ছিলা ফী হাদ্দিন।

284 رد المحتار ، كتاب الطهارة ، باب المياه ، ١ :٣٦١ ، و منحة الخالق ، ١: ١٩٢–١٩٤.

অর্থ: এ প্রশ্নের উত্তর হল, কান পুনরায় ঐ জায়গায় জোড়া দিয়ে দেয়া তখনই সম্ভব হয় যখন তার মধ্যে আবার জীবন ও হায়াত ফিরে আসে। অতএব হায়াত ফিরে আসার কারণে একে আর জীবিত মানুষের পৃথককৃত অঙ্গ বলা যাবে না। ব্যাপারটি কিছুটা এ ধরণের; যদি এ কথা মেনে নেয়া হয় যে, এক ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর মু'জিযা কিংবা কারামাত হিসেবে সে পুনরায় জীবিত হয়ে গেছে। তাহলে সে পুনরায় পাক হয়ে যাবে।[২৮৫]

উল্লিখিত হাদীসদ্বয়ের উত্তর ঃ

এখানে প্রশ্ন আসে যে, পূর্বে উল্লিখিত হাদীসদ্বয়ে জীবিত ব্যক্তির দেহ থেকে পৃথককৃত অঙ্গকে মুর্দা বলা হয়েছে। এর বিপরীত হুকুম দেয়া কি করে বৈধ হয়?

উত্তর ঃ

এর তিনটি উত্তর ঃ

(১) হাদীসে মৃত বলা হয়েছে। এটাই এর প্রমাণ বহন করে যে, জীবন ফিরে আসলে যেহেতু আর মৃত থাকবে না। তাই নাপাকও হবে না।

(২) হাদীসে মৃত বলা হয়েছে। নাপাক তো বলা হয়নি।

(৩) ঐ যুগে আরবের লোকেরা পশু জবাই করা ব্যতীত জীবিত অবস্থায় পশু যেমন, উটের কুঁজ ও দুম্বার পিছনের যে চরবীর একটি থলের মত ঝুলে থাকে তা কেটে খেয়ে ফেলত। আর এগুলো পুনরায় আবার আগের মত হয়ে যেত। এতে ঐ প্রাণীগুলোর কতই না কষ্ট হত। এ সম্পর্কে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেন, জীবিত প্রাণী থেকে কোন অঙ্গ পৃথক করে ফেললে তা মুর্দার হুকুমে হয়ে যায়। অতএব তা আর খাওয়া যাবে না। কেননা মুর্দা খাওয়া হারাম।

---

২৮৫ ফাতাওয়া শামী, খ. ১, পৃ. ৩৬১, মিনহাতুল খালিক, খ. ১, পৃ. ১৯২-১৯৪

এখন বুঝার বিষয় হলো ঐ যুগে জীবিত প্রাণীর কোন অঙ্গ পৃথক করে তা পুনরায় আবার জোড়া দেয়ার কল্পনাও ছিল না। পুনরায় জোড়া দেয়া তো এ যুগের আবিস্কার। আর বাস্তব কথা হল, জীবিত প্রাণী থেকে কোন অঙ্গ পৃথক করার সাথে সাথে তা মরে যায় না, অঙ্গ বিশেষ বিভিন্ন সময়ে মারা যায়। এমন কি কোন প্রাণী মরে গেলে তারও সমস্ত অঙ্গ সাথে সাথে মরে যায় না। যেমন, চক্ষু; প্রাণী মরে যাওয়ার পরও ছয় ঘন্টা পর্যন্ত জীবিত থাকে। অঙ্গগুলো মারা যাওয়ার আগে যথাযথ সংরক্ষণ না করলে কিংবা জোড়া না দিলে তা আর জোড়া নিবে না এবং এর মধ্যে জীবন সঞ্চার হবে না। তাই মারা যাওয়ার আগে তাকে সংরক্ষণ করতে হবে কিংবা জোড়া দিয়ে দিতে হবে। অতএব জোড়া দেয়ার পর জোড়া লেগে যাওয়া মানে অঙ্গটি মরেনি জীবিতই রয়েছে। তাই তাকে মুর্দা ও নাপাক বলা যাবে না। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যুগে যেহেতু জোড়া দেয়ার ও জোড়া নেয়ার কোন কল্পনাও ছিলা না তাই তিনি মুর্দা বলে দিয়েছেন। এতে জোড়া লাগানো হলে জোড়া লেগে যাওয়ার পরও তা মুর্দা ও নাপাক থাকবে এ কথা বলা হয়নি। তাই তার উপর নাপাকির হুকুম দেয়া যাবে না বরং তাকে পাকই বলতে হবে। তাই জোড়া দেয়া অঙ্গ নিয়ে নামায পড়লে নামাযেরও কোন সমস্যা হবে না।

العملية الجراحية في الجسم الميت
মৃতদেহে অস্ত্রোপচার
Operation in Corpse/Dead Body

মৃত দেহে সাধারণত তিন কারণে অস্ত্রোপচার করা হয়। যথা-

১. মৃত্যুর কারণ জানার লক্ষ্যে।

২. জীবিত মানুষের দৈহিক উপকারার্থে।

৩. জীবিত মানুষের আর্থিক উপকারার্থে।

(১) মৃত্যুর কারণ জানার লক্ষ্যে অস্ত্রোপচার

ময়না তদন্ত (Postmortem/مسئلة تشريح الجثة)

মৃত্যুর কারণ জানার জন্য শব-ব্যবচ্ছেদ এর মাধ্যমে পরীক্ষা করাকে পোস্টমোর্টেম (Postmortem) বা ময়না তদন্ত বলে।[২৮৬]

বর্তমান বিশ্বে পোস্টমোর্টেমের যে প্রথা চালু রয়েছে, অর্থাৎ মৃত্যুর কারণ জানার লক্ষ্যে মৃত দেহ কাটা-ছেঁড়া করা; এমন কি কখনো এর জন্য কবর থেকেও লাশ উত্তোলন করে দেহে অস্ত্রোপচার করা হয়, শরীআতের দৃষ্টিতে এ পোস্টমোর্টেম বা ময়নাতদন্ত বৈধ নয়। কেননা পোস্টমোর্টেমের মাধ্যমে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা নিশ্চিত নয়। আর এর দ্বারা মৃত্যুর কারণ জানা গেলেও তার উপর ভিত্তি করে কোন হুকুম প্রদান করা যায় না, যে পর্যন্ত সাক্ষী অথবা সুনিশ্চিত লক্ষণ দ্বারা ঘটনা উদ্‌ঘাটন না হবে সে পর্যন্ত কাউকে দোষারোপ করা যাবে না। যখন ময়নাতদন্তের উপর নির্ভর করে কাউকে দোষারোপ করা যায় না তখন এ অনর্থক কাজের কোন বৈধতা হতে পারে না।

---

২৮৬ আল মাওরিদ, পৃ. ৭১১

দ্বিতীয়তঃ এতে লাশের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হয়। আর (শরী'আত অসমর্থিত) বিনা প্রয়োজনে লাশের অসম্মান করা হারাম। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

ولقد كرمنا بنى آدم .[287]

অর্থ- আমি বনীআদমকে সম্মানিত করেছি। (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ৭০)

হাদীস শরীফে এসেছেঃ

عن عائشة –رضي الله تعالى عنها–، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حياً.[٢٨٨]

অর্থ- হযরত আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ মৃতের হাড় ভাঙ্গা জীবিত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গার সমপরিমাণ অপরাধ।[২৮৯]

অতএব, মৃতের গোস্ত কাটাও জীবিত ব্যক্তির গোস্ত কাটার সমপরিমাণ অপরাধ বলে গণ্য হবে।

---

287 سورة بنى إسرائيل، آية ٧٠ .

288 أخرجه أحمد في مسنده ، ١٠٠/٦ ، رقم الحديث : ٢٤٧٨٣ ، وأبو داودفي سننه ، كتاب الجنائز ، باب فى الحفار يجد العظم هل ينتكب ذلك المكان ، ٤٥٨/٢ ، رقم الحديث : ٣٢٠٧ ، وابن ماجه في سننه ، أبواب الجنائز ، باب النهي عن كسر عظام الميت ، ١ : ١١٦ ، رقم الحديث : ١٦١٦ ، و زاد من حديث أم سلمة –رضي الله تعالى عنها– : فى الإثم ، و البيهقي فى السنن الكبرى ، ٥٨/٤ ، رقم الحديث : ٦٨٧٠ ، الدارقطني في سننه ، في باب الحدود و الديات و غيرها ، ٣: ١٨٨ ، رقم الحديث : ٣١٣ ، و ابن حبان في صحيحه ، باب المريض وما يتعلق به ، ٧ : ٤٣٧ ، رقم الحديث : ٣١٦٧ ، إسناده حسن في المتابعات والشواهد ، رجاله ثقات وصدوقون .

২৮৯ মুসনাদু আহমাদ, খ. ৬, পৃ. ১০০, হাদীস নং ২৪৭৮৩, আবূ দাউদ, খ. ২, পৃ. ৪৫৭, হাদীস নং ৩২০৭, সুনানে ইবনে মাজাহ, খ. ১, পৃ. ১১৬, হাদীস নং ১৬১৬, আস-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, খ. 8, পৃ. ৫৮, হাদীস নং ৬৮৭০, সুনানে দারেকুতনী, খ. ৩, পৃ. ১৮৮, হাদীস নং ৩১৩, সহীহ ইবনে হিব্বান, খ. ৭, পৃ. ৪৩৭, হাদীস নং ৩১৬৭

আর যদি কবর থেকে লাশ বের করে পোস্টমোর্টেম করা হয় তাহলে বিনা প্রয়োজনে কবর থেকে লাশ উঠানোর মত আরেকটি নাজায়েয কাজেরও সংযোজন হলো।

আদ্‌দুররুল মুখতার ও ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ইত্যাদি কিতাবে আছেঃ

ولا يخرج منه بعد إهالة التراب إلا لحق آدمی، كأن تكون الأرض مغصوبة، أو أخذت بشفعة.[২৯০]

অর্থ- দাফন করার পর পুনরায় কবর থেকে লাশ উত্তোলন জায়েয নেই। তবে কোন মানুষের হক সম্পৃক্ত থাকলে লাশ উত্তোলন জায়েয আছে। যেমন অন্যের যমীনে কবর দেয়া, অথবা শোফার (Preemption) মাধ্যমে অন্য কেউ উক্ত যমীনের মালিক হলে। (এমতাবস্থায় লাশ উত্তোলন জায়েয আছে।)[২৯১]

বর্তমানে এ অনর্থক কাজের জন্য দাফন করার এক দু'বছর পরও কবর থেকে লাশ উত্তোলন করতে দেখা যায়। এমতাবস্থায় লাশের কঙ্কাল বা কিছু হাড় ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। আর সাধারণত এমন পোস্ট মোর্টেম দ্বারা উল্লেখযোগ্য কোন তথ্যই উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হয় না।[২৯২] তথাপি বিনা প্রয়োজনে শুধু রসম ও প্রথা হিসেবে এমন করা হয়, কোন প্রয়োজনের তাগিদে নয়। অতএব, এ ধরণের অনর্থক কাজ কখনও বৈধ হতে পারে না।

---

290 الدر المختار، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة، ۳: ۱٤٥، ومراقـــى الفــلاح مـــع الطحطاوى، كتاب الجنائز، فصل فى حملها ودفنها، ص: ٥٠٧–٥٠٨، والفتـــاوى الهنديـــة، كتاب الصلاة، الباب الحادى والعشرون فى الجنائز، الفصل السادس فى القبر والدفن والنقـــل من مكان إلى آخر، ۱: ۱٦٧ .

২৯১ আদ্দুররুল মুখতার, খ. ৩, পৃ. ১৪৫, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, খ. ১, পৃ. ১৬৭, মারাকিউল ফালাহ [হাশিয়ায়ে তহতভী সংলগ্ন], পৃ. ৫০৭-৫০৮

২৯২ শুধু বিষ খেয়ে মারা গেলে বিষের কিছু প্রভাব মাটিতে থাকতে পারে। কিন্তু এর উপর নির্ভর করে দৃঢ়তার সাথে কোন চুড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছা আদৌ সম্ভব নয়।

عن أبي هريرة –رضي الله تعالى عنه–، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لايعنيه.[২৯৩]

অর্থ- হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, অপ্রয়োজনীয় কথা ও কাজ বর্জন করাই মুসলমানের সৌন্দর্যের পরিচায়ক।[২৯৪]

মাসআলাটি লেখার পর মুনতাখাবাতে নিযামুল ফাতাওয়া এ দৃষ্টিগোচর হয় যে, হযরত মাও. মুফতী নিযামুদ্দীন আ'যমীও (রহ.) পোস্ট মোর্টেম নাজায়েয হওয়ার ফাত্ওয়া প্রদান করেছেন।[২৯৫]

ডি.এন.ও (DNO)
কঙ্কাল টেস্ট

ডি.এন.ও (DNO) [Deoxy-Ribo Nucleic Oxidase] হল, কংকাল পরীক্ষার মাধ্যমে কংকালটি কার তা চিহ্নিত করণ। এ পরীক্ষার মাধ্যমে যা সনাক্ত করা হয়, ডাক্তারদের মতানুসারে দৃঢ়তার সাথে এ কথা বলা যায় না যে, এ কংকালটি অমুকের। অতএব এর উপর নির্ভর করে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় না। তাই কবর থেকে কঙ্কাল বের করে আনা বৈধ হবে না।

---

293 أخرجه الترمذى فى الزهد، ٢: ٥٨، رقم الحديث: ٢٣١٧، ٢٣١٨، وقال: هـــذا حديث غريب، وابن ماجه فى الفتن، باب كف اللسان فى الفتنة، ص: ٢٨٦، رقم الحـــديث: ٣٩٧٦، وأحمد فى مسنده، ١: ٢٠، وأورده المتقى فى كنـــز العمال، حرف الميم،٣: ٦٤٠–٦٤١، رقم الحديث: ٨٢٩١،٨٢٩٤ .

২৯৪ তিরমিযী, খ. ২, পৃ. ৫৮, হাদীস নং ২৩১৭, ২৩১৮, মুসনাদে আহমাদ, খ. ১, পৃ. ২০, কানযুল উম্মাল, খ. ৩, পৃ. ৬৪০-৬৪১, হাদীস নং ৮২৯১, ৮২৯৪

২৯৫ মুনতাখাবাতে নিযামুল ফাতাওয়া, খ. ১, পৃ. ৪১২-৪১৩

ডি.এন.এ (DNA)
যৌনাঙ্গের রস, মুখের লালা ইত্যাদি টেস্ট

ডি.এন.এ (DNA) [Deoxy-Ribo Nucleic Acid] হল, যৌনাঙ্গের রস, মুখের লালা ও ঘাম ইত্যাদির নমুনা পরীক্ষা করা। অর্থাৎ এগুলো সংগ্রহ করার ছয় ঘন্টার মধ্যে পরীক্ষার মাধ্যমে নির্ণয় করা হয় যে, এগুলো কার। যেমন, কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে অপকর্ম করার পর মহিলা যার কথা বলছে সে তা অস্বীকার করছে। এখন ঐ লোকের যৌনাঙ্গের রস এবং মহিলার কাপড়ে লেগে থাকা রস নিয়ে পরীক্ষা করলে বুঝা যাবে উভয় রস একজনের কি না।

তেমনিভাবে লালা ও ঘাম পরীক্ষার মাধ্যমে নির্ণয় করা যে, এ ঘাম ও লালা কার।

ডাক্তারগণ বলেন যে, এ ধরণের পরীক্ষার উপর নির্ভর করে দৃঢ়তার সাথে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় না যে, এগুলো অমুকের (কোন কোন ডাক্তার এ ব্যপারে দ্বিমতও পোষণ করেন)। অতএব, এর উপর ভিত্তি করে কোন রায় কায়েম করা ও তা কার্যে পরিণত করা শরীআতের দৃষ্টিতে বৈধ সিদ্ধান্ত বলে গণ্য হবে না।

এর উপর ভিত্তি করে নিম্নে বর্ণিত মাসআলাগুলোর হুকুম পরিস্কার হয়ে যায়।

(১) যে সন্তানের বংশ শরীআতের নীতি অনুযায়ী প্রমাণিত তার বেলায় ডি.এন.এ (DNA) টেস্টের মাধ্যমে সন্দেহ সৃষ্টি করা বৈধ নয়।

(২) যে সমস্থ অপরাধ হদ ও কেসাস তথা ইসলামী শরীআ বিধান অনুযায়ী শাস্তি ও রক্তপণ এর কারণ হয় এ ধরণের অপরাধ প্রমাণেল ক্ষেত্রে ডি.এন.এ (DNA) টেস্ট এর কোন ধর্তব্য হবে না।

(৩) যদি কোন বাচ্চার ব্যাপারে একাধিক দাবীদার হয় এবং কারোর কাছে ইসলামী শরীআ ভিত্তিক কোন স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ না থাকে

তাহলে এমন বাচ্চার বংশ ডি.এন.এ (DNA) এর মাধ্যমে নির্ধারণ করা যাবে।[২৯৬]

বি. দ্র. ডি.এন.ও (DNO) এবং ডি.এন.এ (DNA) টেস্টদ্বয় যদিও অস্ত্রোপচারের আওতাভুক্ত নয়। তথাপিও তদন্তের প্রাসঙ্গিক হিসেবে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

(২) জীবিত মানুষের দৈহিক উপকারার্থে অস্ত্রোপচার

ডাক্তারি বিদ্যা অর্জনের লক্ষ্যে মৃতদেহ অস্ত্রোপচার

ডাক্তারিবিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যে মানুষের শারীরিক গঠন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ বা ক্রিয়া বুঝার জন্য লাশের অস্ত্রোপচার জায়েয কিনা এ ব্যাপারে দু'ধরণের অভিমত পাওয়া যায়।

প্রথম অভিমত

আরব বিশ্বের আলেমগণ ও ভারত উপমহাদেশের একদল আলেম তা জায়েয বলে মনে করেন। তাদের মধ্যে হযরত মাওলানা মুফতী মাহদী হাসান, হযরত মাওলানা মুফতী নিযামুদ্দীন [রহ.] (মুফতী, দারুল উলুম দেওবন্দ), মাওলানা মিন্নাতুল্লাহ বিহারী (আমীরে শরী'আত বিহার), মুফ্তী আযম পাকিস্তান আল্লামা রফী উসমানী [দা. বা.], শাইখুল ইসলাম আল্লামা তক্বী উসমানী [দা. বা.] ও মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ রাহমানী [দা. বা.] প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা বলেন, যখন জীবিত ব্যক্তির কারণে জীবিত ও মৃত ব্যক্তির অস্ত্রোপচার জায়েয আছে (যেমন পূর্বের অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে) তখন বহু জীবিত রোগীর উপকারার্থে মৃত ব্যক্তির অস্ত্রোপচার করা তো আরো অধিক যুক্তিসঙ্গত।

---

২৯৬ দেখুন, ক্বারারাত (সিদ্ধান্তাবলী), ইসলামী ফিক্হ একাডেমী ইন্ডিয়া, ডি.এন.এ টেস্ট.... এর শরয়ী মাসাইল, পৃ. ১৫

দ্বিতীয় অভিমত

ভারত উপমহাদেশের অপর একদল উলামায়ে কিরাম এ কাজকে নাজায়েয মনে করেন। তাদের মধ্যে মুফতী মাহমুদ হাসান গাংগুহী [রহ.] (মুফতী, দারুল উলুম দেওবন্দ), মুফতী রশীদ আহমাদ লুধিয়ানভী [রহ.], মুফতী জামীল আহমাদ খান [রহ.] (মুফতী, জামিয়া আশরাফিয়া লাহোর) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা এ দাবীর স্বপক্ষে নিম্নে বর্ণিত দলীলসমূহ পেশ করেন।

(১) আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেনঃ

ولقد كرمنا بنى آدم إلخ.[২৯৭]

অর্থ- নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি।[২৯৮]

আর লাশের অস্ত্রোপচার মানব সম্মান ও মর্যাদার পরিপন্থী, সুতরাং তা জায়েয হতে পারে না।

(২)

عن عائشة –رضي الله تعالى عنها–، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حياً.[২৯৯]

---

297 سورة بنى إسرائيل، آية: ٧٠ .

২৯৮ সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ৭০

299 أخرجه أحمد في مسنده ، ٦/١٠٠ ، رقم الحديث : ٢٤٧٨٣ ، وأبو داودفي سننه ، كتاب الجنائز ، باب فى الحفار يجد العظم هل ينتكب ذلك المكان ، ٤٥٨/٢ ، رقم الحديث : ٣٢٠٧ ، وابن ماجه في سننه ، أبواب الجنائز ، باب النهي عن كسر عظام الميت ، ١ : ١١٦ ، رقم الحديث : ١٦١٦ ، و زاد من حديث أم سلمة –رضي الله تعالى عنها– : فى الإثم ، و البيهقي فى السنن الكبرى ، ٥٨/٤ ، رقم الحديث : ٦٨٧٠ ، الدارقطني في سننه ، في باب الحدود و الديات و غيرها ، ٣: ١٨٨ ، رقم الحديث : ٣١٣ ، و ابن حبان في صحيحه ، باب المريض وما يتعلق به ، ٧ : ٤٣٧ ، رقم الحديث : ٣١٦٧ ، إسناده حسن في المتابعات والشواهد ، رجاله ثقات وصدوقون .

অর্থ- হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ মৃত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গা জীবিত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গার মতই অপরাধ।[৩০০]

অতএব, চিকিৎসা যা শরীআতের দৃষ্টিতে সর্বোচ্চ সুন্নাতে যায়িদা বা মুস্তাহাব এর পর্যায়ভুক্ত। আর মুস্তাহাবের জন্য হাদীসে বর্ণিত সুদৃঢ় অপরাধ কিভাবে বৈধ হতে পারে?[৩০১]

(৩) মৃত লাশের অস্ত্রোপচার করা مثْلة (অঙ্গ-বিকৃতি) এর অন্তর্ভুক্ত। আর শরীআতের দৃষ্টিতে مثْلة (অঙ্গ-বিকৃতি) করা মাকরূহে তাহরীমী বা হারাম।

عن سليمان بن بُريدة عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً على جيش، أو سرية، أوصاه فى خاصته بتقوى الله... ثم قال... ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا.[٣٠٢]

অর্থ- সুলাইমান ইবনে বুরাইদা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন কাউকে মুসলিম সৈন্য বাহিনীর আমীর বা কমান্ডার নিযুক্ত করে পাঠাতেন তখন তাকে খোদার ভয়-ভীতি সম্পর্কে অসিয়াত (বিশেষ উপদেশ) করতেন... ও

---

৩০০ মুসনাদু আহমাদ, খ. ৬, পৃ. ১০০, হাদীস নং ২৪৭৮৩, আবূ দাউদ, খ. ২, পৃ. ৪৫৭, হাদীস নং ৩২০৭, সুনানে ইবনে মাজাহ, খ. ১, পৃ. ১১৬, হাদীস নং ১৬১৬, আস-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, খ. 8, পৃ. ৫৮, হাদীস নং ৬৮৭০, সুনানে দারেকুতনী, খ. ৩, পৃ. ১৮৮, হাদীস নং ৩১৩, সহীহ ইবনে হিব্বান, খ. ৭, পৃ. ৪৩৭, হাদীস নং ৩১৬৭

৩০১ الشرح الناضر، مسئلة التشريح لجسم الميت، تحت القاعدة الخامسة ''الضرر يزال''، ٦: ٤٣١.

আশ শরহুন নাযির, খ. ৬, পৃ. ৪৩১

302 أخرجه مسلم فى الجهاد، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، ٢: ٨٢، رقم الحديث، ٤٢٨٥، والترمذى فى الديات،باب ماجاء عن النهى فى المثلة، ١: ٢٦٠، رقم الحديث: ١٤٠٨ .

বলতেন... কারো অঙ্গ-বিকৃত করো না এবং কোন ছোট বাচ্চাকে হত্যা করোনা।[৩০৩]

সুতরাং শুধুমাত্র মুস্তাহাব কাজের জন্য এমন হাদীসের বিরোধিতা করা যুক্তি সঙ্গত হতে পারে না।[৩০৪]

(৪) পূর্বে একথা আলোচিত হয়েছে যে, চিকিৎসা ফরয-ওয়াজিব নয়। তাই তো কেউ চিকিৎসা ছাড়া মারা গেলে সে গুনাহগার হবে না। অতএব, এ চিকিৎসা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করাও ফরয বা ওয়াজিব নয়।

لقولهم: "إن مقدم الواجب واجب، ومفهومه إن مقدم غير الواجب ليس بواجب."

অর্থ- ওয়াজিবের ভূমিকাও ওয়াজিব। তেমনিভাবে যা ওয়াজিবের ভূমিকা নয় তা ওয়াজিবও নয়। সুতরাং ডাক্তারিবিদ্যা (যা ওয়াজিব নয়) শেখার উদ্দেশ্যে লাশের অস্ত্রোপচার (যা হারাম[৩০৫] কিংবা মাকরূহে তাহরীমী) বৈধ হওয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই।

(৫) চিকিৎসাবিদ্যা আয়ত্ত্ব করার জন্য যদি মেডিকেল কলেজ গুলোতে লাশ কাটা-ছেঁড়ার অনুমতি দেয়া হয়, তাহলে অনেক অসাধু ও অর্থ লিপ্সু ব্যবসায়ী লাশ বেচা-কেনার ব্যবসায় মেতে উঠবে। এমনকি লাশের জন্য জীবিত মানুষ হত্যা করতেও তারা দ্বিধা করবে না। উপরন্তু, কিছু অসাধু ডাক্তার লা-ওয়ারিশ রোগীর ক্ষেত্রে উপরোক্ত ব্যবসায় মেতে উঠতে পারে। ফলে মানুষের লাশের অবমাননা ও অপদস্থতার পাশাপাশি তা খেলার বস্তুতেও পরিণত হবে। তাই লাশের অস্ত্রোপচার অবৈধ হওয়া সাধারণ বিবেকেরই দাবি।

---

৩০৩ মুসলিম, খ. ২, পৃ. ৮২, হাদীস নং ৪২৮৫, তিরমিযী, খ. ১, পৃ. ২৬০, হাদীস নং ১৪০৮

৩০৪ আশ শরহুন নাযির, খ. ৬, পৃ. ৪৩৩

৩০৫ লাশের উপর অস্ত্রোপচারকে হারাম বলা যুক্তিসংগত মনে হয় না। কারণ হারাম প্রমাণিত হওয়ার জন্য قطعى الثبوت مع قطعى الدلالة অর্থাৎ প্রমাণের দিক থেকে অকাট্য হওয়ার পাশাপাশি ধ্রুব অভিব্যক্তি হওয়াও আবশ্যক। আর এখানে তা অনুপস্থিত। (দিলাওয়ার হোসাইন)

(৬) চিকিৎসার জন্য মৃত ব্যক্তির অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে ডাক্তারিবিদ্যা অর্জন করা যদি জরুরত বা প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে ঐ সময় লা-ওয়ারিশ লাশের অপ্রতুলতা দেখা দিলে ওয়ারিশ আছে এমন লাশের ওয়ারিশ ও আত্মীয়-স্বজনদের উপর আবশ্যক হয়ে পড়বে যে, লাশ দাফন না করে মেডিকেল কলেজে পাঠিয়ে দেয়া। কেউ এমন করতে অস্বীকার করলে সরকার জোরপূর্বক লাশগুলোকে মেডিকেল কলেজে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করবে, যা মানব সম্মান-মর্যাদা ও ইসলামী দাফন-কাফন নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী।[৩০৬]

পক্ষান্তরে, যে সকল উলামায়ে কিরাম ডাক্তারিবিদ্যা শেখার লক্ষ্যে লাশের অস্ত্রোপচারকে জায়েয মনে করেন, তাঁরা তাঁদের দাবির স্বপক্ষে নিম্নবর্ণিত দলীলসমূহ পেশ করেনঃ

(১) **يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام.**[٣٠٧]

অর্থ- বৃহৎ ও ব্যাপক ক্ষতিকে প্রতিহত করার জন্য ব্যক্তিবিশেষ ক্ষতিকে বরণ করা যায়।[৩০৮]

এজন্যইতো আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب.[٣٠٩]

অর্থ- হে জ্ঞানী সকল! কিসাসের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য জীবন।[৩১০]

---

306 أحسن الفتاوى، كتاب الحظر والإباحة، ٨: ٣٣٤-٣٣٩، وفتاوى محمودية، بـاب الحظر والإباحة، ٦: ٣٥٥-٣٥٧ .

আহসানুল ফাতাওয়া, খ. ৮, পৃ. ৩৩৪-৩৩৯, ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া, খ. ৬, পৃ. ৩৫৫-৩৫৭

307 الأشباه والنظائر، الفن الأول، تحت القاعدة الخامسة، "الضرر يزال"، ص: ٩٦ .

৩০৮ আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ির, পৃ. ৯৬

309 سورة البقرة: ١٧٩ .

৩১০ সূরা বাকারা, আয়াত: ১৭৯

কিসাস নেয়ার লক্ষ্যে হত্যাকারীকে বধ করা ব্যক্তিবিশেষের ক্ষতি। কেননা এতে একটি লোক (ঘাতক) নিহত হয়ে গেল। আর তাকে বধ না করলে ব্যক্তিবিশেষ ক্ষতি থেকে বেঁচে গেল ঠিক, কিন্তু তার হাতে বহু লোকের জীবন নাশের আশংকা রয়েছে। অর্থাৎ সে জীবিত থাকলে বহু লোককে হত্যা করবে যা বৃহৎ ও ব্যাপক ক্ষতি। তাই উক্ত আয়াতে এ ব্যাপক ও বৃহৎ ক্ষতি থেকে বাঁচার লক্ষ্যে ব্যক্তিবিশেষের ছোট ক্ষতিকে মেনে নিয়ে (তাকে) বধ করার হুকুম দেয়া হয়েছে।

তেমনিভাবে লাশের অস্ত্রোপচার ব্যক্তিবিশেষের ক্ষতি আর হাজারো রোগীকে বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখা আর তাদের ধুঁকে ধুঁকে মারা যাওয়া ব্যাপক ক্ষতি। সুতরাং বৃহৎ ও ব্যাপক ক্ষতি থেকে রেহাই পাওয়ার লক্ষ্যে লাশের অস্ত্রোপচারের মতো সামান্য ক্ষতি মেনে নেয়া অধিক যুক্তি সঙ্গত এবং আয়াতে কেসাসের উপর আমলের নামান্তর।

(২) ”إحياء النفس أولى من صيانة ميت“ [৩১১]

অর্থ- জীবিত প্রাণ রক্ষা করা মৃতের সংরক্ষণ থেকে অধিক শ্রেয়।[৩১২]

তাই অসংখ্য রোগীর প্রাণ রক্ষার্থে কিছু সংখ্যক লাশের সংরক্ষণের পরিপন্থী কাজ তথা অস্ত্রোপচার অযৌক্তিক নয়।

(৩) ”إن حرمة الحى أعظم من حرمة الميت“ [৩১৩]

অর্থ- নিঃসন্দেহে মৃত ব্যক্তির সম্মানের তুলনায় জীবিত ব্যক্তির সম্মান অনেক বেশী।[৩১৪]

---

311 التاج والإكليل للموافق على هامش مواهب الجليل للحطاب، كتاب الجنائز، قبيل كتاب الزكاة، للمالكية، ٣: ٧٧، الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية، ٥: ٣٦٠ .

৩১২ আত তাজ্ ওয়াল ইক্লীল, খ. ৩, পৃ. ৭৭, আলমগীরী, খ. ৫, পৃ. ৩৬০

313 التاج والإكليل للموافق على هامش مواهب الجليل للحطاب، كتاب الجنائز، ٣: ٧٧
.

৩১৪ আত্তাজ ওয়াল ইকলীল, খ. ৩, পৃ. ৭৭

অতএব, অধিক সম্মানি তথা জীবিত ব্যক্তির উপকারার্থে কম সম্মানি তথা মৃত ব্যক্তির উপর অস্ত্রোপচার যুক্তি পরিপন্থী নয়।

(৪) ''الضرورات تبيح المحظورات''[৩১৫]

অর্থ- শরী'আত-স্বীকৃত প্রয়োজনসমূহ শরী'আত কর্তৃক অবৈধ কাজগুলোকে বৈধ করে দেয়।[৩১৬]

লাশের অস্ত্রোপচার তার মানহানির কারণে মূলত অবৈধ হলেও হাজারো রোগীর প্রাণ রক্ষার তাগিদে বৈধ হওয়া উচিত।

একটি প্রশ্ন ও তার নিরসন

এখানে যারা অস্ত্রোপচারের জরুরত (প্রয়োজন)কে এ বলে অস্বীকার করেন যে, জরুরত বা প্রয়োজনের তাগিদে কোন নাজায়েয ও অবৈধ কাজ বৈধ হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে। শর্তগুলো পাওয়া না গেলে অবৈধ কাজ বৈধ হয় না। আর ঐ তিনটি শর্তই এখানে অনুপস্থিত। পর্যায়ক্রমে শর্তগুলোর ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদান করা হলো। যথা-

(ক) জরুরত (প্রয়োজন)টি ضرورة قائمة অর্থাৎ বর্তমানে বিদ্যমান থাকতে হবে এবং ضرورة منتظرة তথা ভবিষ্যৎ জরুরত হতে পারবে না।

(খ) জরুরত বা প্রয়োজন দূর করার অন্য কোন বৈধ পদ্ধতি না থাকতে হবে।

(গ) এ নাজায়েয কাজ দ্বারা জরুরত ও প্রয়োজনটি পূরণ হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে।

এখানে সব কয়টি শর্তই অনুপস্থিত রয়েছে। কেননা ডাক্তারিবিদ্যা শেখার উদ্দেশ্যে লাশের উপর অস্ত্রোপচার করা ضرورة قائمة (বর্তমান প্রয়োজন) এর অন্তর্ভুক্ত নয় বরং ضرورة منتظرة (ভবিষ্যৎ প্রয়োজন) এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ এখানের অবস্থা এমন নয় যে, লাশের উপর অস্ত্রোপচার

---

315 الأشباه والنظائر، تحت القاعدة الخامسة ''الضرر يزال''، ص: ٩٤ .

৩১৬ আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ির, পৃ. ৯৪

না করলে এখনই কোন রোগী মারা যাবে বরং অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করে রাখবে, পরবর্তীতে কোন রোগী আসলে ঐ অর্জিত জ্ঞানের আলোকে তার চিকিৎসা করবে। আর ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের লক্ষ্যে এমন করা কখনো বৈধ হতে পারে না।

এখানে দ্বিতীয় শর্তটি এভাবে অনুপস্থিত যে, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন-প্রণালী বুঝা লাশের উপর অস্ত্রোপচার করার মধ্যে সীমিত নয়। কেননা এর জন্য অন্যান্য বৈধ পদ্ধতিও রয়েছে। যেমন- বানর, শিমপাঞ্জি ও ব্যাঙ ইত্যাদির উপর অস্ত্রোপচারের মাধ্যমেও এ বিদ্যা অর্জন করা যায়, কেননা এ প্রাণীগুলোর স্বভাব ও এদের ভিতর-বাহিরের অঙ্গের গঠন প্রণালী মানুষের ন্যায়। এছাড়া প্লাষ্টিক সার্জারীর মাধ্যমেও এ জ্ঞান অর্জিত হওয়া অনেকটা সম্ভব। অতএব, এ ধরণের বৈধ উপায় থাকতে অবৈধ পন্থা অবলম্বন করার কোন যৌক্তিকতা নেই।

তৃতীয় শর্তটিও এখানে অনুপস্থিত। কারণ অপারেশন বা অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে চিকিৎসার উদ্দেশ্য পূরণ হওয়া নিশ্চিত নয়। অনেক সময় অপারেশন করার পর রোগী মারাও যায়। আবার কখনও অপারেশনের কারণে রোগী অত্যন্ত দুর্বল হয়ে যায়। অনেক সময় পূর্বের চেয়ে রোগ আরো বৃদ্ধি পায়। কখনো কখনো এমনও দেখা যায় যে, অপারেশন ছাড়া বাঁচবে না এমন রোগী পরবর্তীতে অপারেশন ছাড়া ভাল হয়ে যায়। এতে বুঝা যায় যে, অপারেশন দ্বারা চিকিৎসা হওয়া সুনিশ্চিত কোন বিষয় নয়। সুতরাং চিকিৎসার দ্বারা জরুরত বা প্রয়োজন পূরণ হওয়া অনিশ্চিত হওয়ার কারণে নাজায়েয পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

মোটকথা, জরুরত বা প্রয়োজনের তাগিদে নাজায়েয কাজ বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে যে তিনটি শর্ত রয়েছে তার সব ক'টি শর্তই এখানে অনুপস্থিত। তাই ডাক্তারিবিদ্যা শেখার উদ্দেশ্যে লাশের অস্ত্রোপচার বৈধ হতে পারে না।[৩১৭]

---

317 الشرح الناضر، مسئلة التشريح لجسم الإنسان الميت، تحت القاعدة الخامسة ''الضرر يزال''، ٦: ٤٣٠–٤٣٢ .

আশ শরহুন নাযির, খ. ৬, পৃ. ৪৩০-৪৩২

উত্তরঃ তাদের এ ধারণাটি সঠিক নয়। কারণ,

(ক) এখানে জরুরত বা প্রয়োজনটিকে যে ভবিষ্যতের অন্তর্ভুক্ত বলা হয়েছে তা ঠিক নয় বরং এ প্রয়োজনটি বর্তমানেরই অন্তর্ভুক্ত। আর তা এভাবে যে, বর্তমান জরুরত বা প্রয়োজন দু'প্রকার। যথা-

(১) প্রকৃত বিদ্যমান প্রয়োজন (ضرورة قائمة حقيقية)

(২) কার্যত বিদ্যমান প্রয়োজন (ضرورة قائمة حكمية)

মেডিকেল কলেজগুলোতে লাশের অস্ত্রোপচার ضرورة قائمة حكمية বা কার্যত বিদ্যমান প্রয়োজন এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা রোগী আসার পর লাশ কাটা-ছেঁড়া করে ডাক্তারিবিদ্যা শিখে চিকিৎসা করা অসম্ভব। কারণ রোগী আসার পর এ পরিমাণ কালক্ষেপণ করলে রোগীর জীবন রক্ষা করা কঠিন হয়ে যাবে।

অতএব, রোগী আসার পূর্বে লাশ কাটা-ছেঁড়ার মাধ্যমে ডাক্তারিবিদ্যা অর্জন করা ضرورة قائمة حكمية (তথা কার্যত বিদ্যমান প্রয়োজন) এর অন্তর্ভুক্ত। তাই এ ক্ষেত্রে ضرورة قائمة বা প্রকৃত বর্তমান প্রয়োজনকে অনুপস্থিত বলা যুক্তি সঙ্গত নয়।

(খ) এ জরুরতের ২য় শর্তটি না পাওয়া যাওয়ার যে কথাটি বলা হয়েছে তাও পুরোপুরিভাবে মেনে নেয়া যায় না। কেননা বানর, শিমপাঞ্জি, ব্যাঙ বা প্লাষ্টিক সার্জারীর মাধ্যমে মানবদেহ সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায় ঠিক, কিন্তু এ জ্ঞান, আর হুবহু মানুষের লাশ কাটার মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জিত হয়, উভয় জ্ঞান কখনো এক হতে পারে না। দু'টির মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত রয়েছে। এ ব্যাপারে বানর ও ব্যাঙ কাটার মাধ্যমে কখনো পরিপূর্ণভাবে এমন জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয় যা মানব দেহ কাটার মাধ্যমে সম্ভব। আর অপারেশনের মাধ্যমে চিকিৎসা করা খুবই সূক্ষ্ম ব্যাপার যা অত্যন্ত সতর্কতার দাবি রাখে। আর তা একমাত্র মানব দেহে অস্ত্রোপচার দ্বারা শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে সম্ভব। প্লাষ্টিক সার্জারী, ব্যাঙ ও বানর ইত্যাদির মাধ্যমে আদৌ সম্ভব নয়।

সুতরাং "লাশ কাটা-ছেঁড়া ব্যতীত ব্যাঙ, বানর ও প্লাষ্টিক সার্জারীর মাধ্যমে মানব দেহ সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা যায়" কথাটি মেনে

নেয়া যায় না। বরং এ সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান একমাত্র মানুষের লাশ কাটার মাধ্যমেই সম্ভব।

(গ) আর তৃতীয় শর্ত (অর্থাৎ এ নাজায়েয কাজ দ্বারা জরুরত ও প্রয়োজনটি পূরণ হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস থাকা) কে এ বলে অনুপস্থিত বলা হয়েছে যে, "অপারেশন ও অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে চিকিৎসার উদ্দেশ্য পূরণ হওয়া নিশ্চিত নয়" এ কথাটিও পুরোপুরিভাবে মেনে নেয়া যায় না। কারণ, এখানে দৃঢ় বিশ্বাস অর্থাৎ 'يقين' শব্দটি একটি আরবী পরিভাষা, এর অর্থ দলীলের উপর ভিত্তি করে অন্তরে (جزم) দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে 'يقين' এর উপস্থিতি কঠিন বিধায় 'ظن غالب' তথা ইয়াক্বীনের কাছাকাছি অবস্থাকেই শরী'আত 'يقين' এর স্থলাভিষিক্ত করে 'يقين' ও 'ظن غالب' কে একই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত করেছে।

আল্লামা হামাভী (রহ.) আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ির এর ব্যাখ্যা গ্রন্থে (পৃ. ১০০) উল্লেখ করেনঃ

ثم اليقين: طمانينة القلب على حقيقة الشئ، يقال: "يقن الماء فى الحوض"، إذا استقر فيه. والشك لغة : مطلق التردد ، وفى اصطلاح الأصول: استواء طرفى الشئ، وهو الوقوف بين الشيئين بحيث لا يميل القلب إلى أحدهما، فإن ترجح أحدهما ولم يطرح الآخر فهو ظن، فإن طرحه فهو غالب الظن، وهو بمنـــزلة اليقين، وإن لم يترجح فهو وهم.

وأما عند الفقهاء: فهوكاللغة فى سائر الأبواب، ولا فرق بين المساوى والراجح، كما زعم النووى، ولكن هذا إنما قالوه فى الأحداث، وقد فرقوا فى مواضع كثيرة بينهما. وعند بعض متأخرى الأصوليين عبارة أخرى، أوجز مما ذكرناه مع زيادة على ذلك، وهى:

أن اليقين: جزم القلب مع الاستناد إلى الدليل القطعى،

والاعتقاد:جزم القلب من غير استناد إلى الدليل القطعى كاعتقاد العامى.

والظن: تجويز أمرين أحدهما أقوى من الآخر.

والوهم: تجويز أمرين أحدهما أضعف من الآخر.

والشك: تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.[٣١٨]

অর্থ: "ইয়াক্বীন" (يقين) বা দৃঢ় বিশ্বাস, কোন বস্তুর বাস্তবতার উপর অন্তরের নিশ্চয়তাকে বলে। যখন পানি হাউযে স্থির হয়ে যায় তখন ''يقن الماء فى الحوض'' বলা হয়। আর আভিধানিক অর্থে 'শাক্ক' (شك) সাধারণ দ্বিধা ও সিদ্ধান্তহীনতাকে বলে।

ফিক্হশাস্ত্রের নীতিমালার পরিভাষায়ঃ

"তারাদ্দুদ" কোন বস্তুর হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে অন্তর কোন এক দিকে ধাবিত না হওয়াকে বলে অর্থাৎ উভয় দিক সমান থাকাকে তারাদ্দুদ (تردد) বলা হয়।

"যান্ন" (ظن): কোন বস্তুর হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে অন্তর যদি কোন এক দিকে ধাবিত হয় অর্থাৎ ঐ দিককে প্রাধান্য দেয় এবং অন্য দিকটি প্রত্যাখ্যাত না হয়। তাহলে অন্তর যে দিকে ধাবিত হয়েছে সে প্রাধান্য দিককে "যান্ন" (ظن) বলে।

"গালিবে যান্ন" (غالب الظن): যদি ২য় দিকটি প্রত্যাখ্যাত হয় তাহলে প্রাধান্য প্রাপ্ত দিকটিকে "গালিবে যান্ন" (غالب الظن) বলে এবং এ গালিবে যান্ন (غالب الظن),ইয়াক্বীন (يقين) অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাসের স্থলাভিষিক্ত হয়। অর্থাৎ উভয়টির হুকুম এক ও অভিন্ন হয়।

"ওহাম" (وهم): যে দিককে প্রাধান্য দেয়া হয়নি, সে অপ্রাধান্য দিককে ওহাম (وهم) বলে।

ইমাম নববী রহ. এর ধারণা: ফক্বীহগণ "যান্ন" (ظن) কে ফিক্হের সকল অধ্যায়ে আভিধানিক অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। অর্থাৎ উভয় দিক সমান হোক অথবা কোন এক দিক প্রাধান্য পাক, এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু তাঁর এ ধারণাটি ঠিক নয়। কেননা ফক্বীহগণ এ কথা 'আহ্দাস্' (أحداث) তথা উযূ-গোসল ফরয হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে

---

318 شرح الأشباه للحموى، القاعدة الثالثة: اليقين لايزول بالشك، ص: ١٠٠ .

বলেছেন। নতুবা প্রাধান্য প্রাপ্ত দিক ও অপ্রাধান্য প্রাপ্ত দিকের মধ্যে বহু জায়গায় তাঁরা পার্থক্য করেছেন।

পরবর্তীকালের নীতি নির্ধারক ফকীহ্গণ থেকে এ ব্যাপারে আরেকটি উক্তি পাওয়া যায়। যার সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ:

“ইয়াক্বীন” (يقين): বলা হয়, অকাট্য দলীল সহকারে অন্তরের আস্থা ও দৃঢ়তাকে।

ই’তিক্বাদ (إعتقاد) বলে, অকাট্য দলীল ব্যতীত অন্তরের আস্থা ও দৃঢ়তাকে।

“যান্ন” (ظن): বলা হয়, কোন কিছু হওয়া না হওয়া দোলায়িত হওয়ার পর এ দু’টি দিক হতে প্রাধান্যপ্রাপ্ত দিককে।

“ওহাম” (وهم): বলা হয়, অপ্রাধান্যপ্রাপ্ত দিককে।

“শাক্ক” (شك): বলা হয়, উভয় দিক এক সমান থাকাকে, অর্থাৎ কোন দিক অপর কোন দিকের উপর প্রাধান্য না পাওয়া।[৩১৯]

ইয়াক্বীন (يقين) ও যান্ন গালিব (ظن غالب) একই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, উপরোল্লিখিত আলোচনা দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, অপারেশনের মাধ্যমে চিকিৎসা হওয়ার ইয়াক্বীন তথা নিশ্চিত না হওয়া গেলেও যান্ন গালিব (ظن غالب) তথা প্রবল ধারণা করা যায়। আর বাস্তবতাও তাই। অপারেশনের মাধ্যমে চিকিৎসা করলে প্রায় রোগীই আরোগ্য লাভ করে, দু’চার জনের বেলায় এর বিপরীত ঘটলে তা ধর্তব্য নয়।

সুতরাং চিকিৎসা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে লাশের অস্ত্রোপচার জায়েয হওয়ার জন্য ইয়াক্বীন পর্যন্ত পৌঁছা লাগবে না। যান্নে গালিব (ظن غالب) ই যথেষ্ট।

মোটকথা, জরুরত (ضرورة) দেখা দিলে নাজায়েয কাজ জায়েয হওয়ার জন্য যে তিনটি শর্ত রয়েছে, তার সবকটিই এখানে বিদ্যমান। এগুলোকে অনুপস্থিত বলা সঠিক নয়। অতএব, চিকিৎসাবিদ্যা অর্জনের লক্ষ্যে লাশের অস্ত্রোপচার, জরুরতের কারণে বৈধ প্রমাণিত হলো।

---

৩১৯ শরহুল আশবাহ লিল হামাভী, পৃ. ১০০

তথাপি, কেউ যদি মেডিকেল কলেজে লাশের অস্ত্রোপচারকে জরুরতের পর্যায়ে মেনে নিতে না চান তাহলে তিনি অন্ততপক্ষে হাজাত (حاجة)[৩২০] এর অন্তর্ভুক্ত হওয়াকে অস্বীকার করতে পারবেন না।

---

৩২০ **حاجة** (হাজাত) শব্দটি একটি ফিক্‌হী (ইসলামী আইনের) পরিভাষা, এখানে মোট পাঁচটি স্তর রয়েছে। যথা- (১) জরুরত (২) হাজাত (৩) মানফাআত (৪) যীনাত (৫) ও ফুযূল। যথাক্রমে প্রত্যেকটির সংজ্ঞা প্রদত্ত হলোঃ

১. জরুরতঃ এমন অবস্থায় উপনীত হওয়াকে বুঝায়, যে অবস্থায় হারাম গ্রহণ না করলে সে মারা যাবে অথবা মারা যাওয়ার উপক্রম হবে। এ অবস্থায় পৌঁছালে হারাম আর হারাম থাকে না। যেমন, অতিশয় ক্ষুধার্ত ব্যক্তি হারাম না খেলে মারা যাবে অথবা অঙ্গহানি হবে।
২. হাজাতঃ এমন অবস্থাকে বলা হয় যে, এ অবস্থায় হারাম না খেলে সে মারা যাবে না ঠিক, কিন্তু তাকে অনেক দুর্ভোগ ও কষ্ট সহ্য করতে হবে। এ অবস্থায় হারাম খাওয়া বৈধ হয় না। অর্থাৎ অকাট্য (**قطعی**) দলীলের বিপরীত করা যায় না। আনুমান (**ظن**) ভিত্তিক দলীলের খেলাফ করা যায়। মাঝে মধ্যে এর ব্যতিক্রমও হয়। যেমন, এ অবস্থায় রোযা ভাঙ্গার অনুমতি দেয়া হয়। অথচ রোযা ভাঙ্গা অকাট্য দলীলের পরিপন্থী।
৩. মানফাআতঃ বলা হয়, যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়। কিন্তু তা ব্যবহার না করলে মারা যাবে না এবং কোন প্রকার কষ্টও হবে না। যেমন, সুস্বাদু ও উৎকৃষ্ট মানের খাবার খাওয়া ইত্যাদি।
৪. যীনাতঃ বলা হয়, যার দ্বারা সাজ-সজ্জা করা হয় এবং এর দ্বারা আরাম পাওয়া যায়। যেমন, সুন্দর ও পাতলা-মোলায়েম কাপড় পরিধান করা ইত্যাদি।
৫. ফুযূলঃ এমন বস্তুকে বলা হয়, যার কোন প্রয়োজন হয় না। যেমন, অনর্থক বা সন্দেহযুক্ত কাজ করা ইত্যাদি।
(শরহুল হামাভী আলাল আশবাহ, কায়েদা: **ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها** মাআ ইযাফাতিম মিনাশ শরহিন নাযির [তাসকীনিল আরওয়াহি ওয়াদ্‌দমায়ির], খ. ২, পৃ. ৩৭৩-৩৭৪)

(شرح الحموی علی الأشباه، تحت القاعدة: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، مع إضافة من الشرح الناضر [تسکین الأرواح والضمائر] ، ۲: ۲۷۳-۲۷٤)

আর লাশের অস্ত্রোপচার হাজাত (حاجة) এর পর্যায়ে উন্নীত হওয়াই যথেষ্ট। জরুরতের (প্রয়োজনের) পর্যায়ে হওয়া আবশ্যক নয়। কেননা অস্ত্রোপচার নাজায়েয হওয়ার মৌলিক দলীল দু'টি:

১. পবিত্র আয়াতে কারীমা- ولقد كرمنا بنى آدم[৩২১]

২. হাদীসে আয়েশা (রাযি.)- كسر عظم الميت ككسره حياً[৩২২]

দলীলদ্বয়ের মধ্যে প্রথম দলীল অর্থাৎ আয়াতটি 'قطعى الثبوت' তথা 'প্রমানের দিক থেকে অকাট্য' ঠিক, কিন্তু 'قطعى الدلالة' তথা 'ধ্রুব অভিব্যক্তি নয়।' অর্থাৎ লাশের উপর অস্ত্রোপচার যে মানব সম্মানের পরিপন্থী তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা অঙ্গ সংযোজন অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

আর দ্বিতীয় দলীলটি অর্থাৎ হাদীসে আয়েশা (রাযি.)'قطعى الدلالة' তথা ধ্রুব অভিব্যক্তি ও 'قطعى الثبوت' তথা প্রমানের দিক থেকে অটল-অকাট্য দলীল কোনটিই নয়। অর্থাৎ উভয় দলীলই 'دليل ظنى' তথা অনুমানভিত্তিক দলীল, 'قطعى' বা অকাট্য নয়।

আর 'دليل ظنى' তথা অনুমানভিত্তিক দলীল এর উপরে ভিত্তি করেই লাশের অস্ত্রোপচার করাকে নাজায়েয বলা হয়েছিল।

---

321 سورة بنى إسرائيل، آية: ٧٠ .

322 أخرجه أحمد في مسنده ، ١٠٠/٦ ، رقم الحديث : ٢٤٧٨٣ ، وأبو داودفي سننه ، كتاب الجنائز ، باب فى الحفار يجد العظم هل ينتكب ذلك المكان ، ٤٥٨/٢ ، رقم الحديث : ٣٢٠٧ ، وابن ماجه في سننه ، أبواب الجنائز ، باب النهي عن كسر عظام الميت ، ١ : ١١٦ ، رقم الحديث : ١٦١٦ ، و زاد من حديث أم سلمة –رضي الله تعالى عنها– : فى الإثم ، و البيهقي فى السنن الكبرى ، ٥٨/٤ ، رقم الحديث : ٦٨٧٠ ، الدارقطني في سننه ، في باب الحدود و الديات و غيرها ، ٣: ١٨٨ ، رقم الحديث : ٣١٣ ، و ابن حبان في صحيحه ، باب المريض وما يتعلق به ، ٧ : ٤٣٧ ، رقم الحديث : ٣١٦٧ ، إسناده حسن في المتابعات والشواهد ، رجاله ثقات وصدوقون .

সুতরাং হাজাত (حاجة) এর সময় ‘دليل ظنى’ (অনুমানভিত্তিক দলীল) এর পরিপন্থী হওয়া সত্ত্বেও অস্ত্রোপচার বৈধ হওয়ার হুকুম দেয়া কোন অসঙ্গতির কিছু নয়। হাজত (حاجة) এর সংজ্ঞা ও হুকুমের ব্যাপারে শায়খুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী (দা. বা.) বলেনঃ

وأما الحاجة فهى الداعية التى يترتب على عدم الاستجابة لها ضيق وحرج وعسروصعوبة، وإن لم يكن ذلك الحرج يؤدى إلى تلف النفس أو المال، –وقال بعد أسطر–: إن الحاجة إنما تعتبر مؤثرة فى تغيير بعض الأحكام الشرعية فى حالتين –إلى أن قال– الحالة الثانية: أن يكون أصل الحكم محتملاً غير صريح فى الكتاب والسنة أو مجتهداً فيه، فحينئذ ترجح الإباحة فى مواضع الحاجة. [৩২৩]

অর্থ- হাজত (حاجة) বলা হয়, ঐ প্রয়োজনকে যা সময় মত মেটানো না হলে ক্ষতি, কষ্ট, সংকীর্ণতা ও জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। তবে এ কষ্ট ও ক্ষতির কারণে জান-মাল বিনষ্ট হয়না ... হাজত (حاجة) কে শরীআতের কোন হুকুম পরিবর্তনের ব্যাপারে দু’অবস্থায় কার্যকর মানা হয়। ... দ্বিতীয় অবস্থাটি হল, হুকুমটি এমন হওয়া যা কুরআন ও হাদীসে অস্পষ্টভাবে বর্ণিত। অর্থাৎ দৃঢ়তার সাথে এ কথা বলা যাবে না যে, এ আয়াত ও এ হাদীসের উদ্দেশ্য এটিই, অথবা হুকুমটি কুরআন ও হাদীস থেকে ইজতিহাদ দ্বারা উদ্ভাবন করা হয়েছে। এমতাবস্থায় প্রয়োজন দেখা দিলে নিষেধাজ্ঞার তুলনায় বৈধতাকে প্রাধান্য দেয়া হয়।[৩২৪]

তেমনি ভাবে হযরত আয়েশা (রাযি.) এর হাদীসে[৩২৫] যে, “মৃতের হাড় ভাঙ্গাকে জীবিত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গার সমপরিমাণ অপরাধ বলে গণ্য করা হয়েছে” এ হুকুম তখনই দেয়া হয় যখন কোন প্রয়োজন ছাড়াই এমন করা হয়। প্রয়োজন বোধে এমন করলে জীবিত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গার

---

323 أصول الإفتاء ، فى بيان تعريف الحاجة ، ص: ١٤٠–١٤٢ .

৩২৪ উসূলুল ইফতা, পৃ. ১৪০-১৪১

৩২৫ বুখারী, খ. ১, পৃ. ৩৬-৩৭

সমপরিমান অপরাধ হবে না। এজন্যই মুহাদ্দিসীনে কিরাম ও ফুকাহায়ে কিরাম হযরত আয়েশা (রাযি.) এর হাদীসের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেনঃ

ويحمل قول عائشة ''كسر عظام الميت ككسرها حيا[٣٢٦] '' إذا فعل ذلك عبثاً، وأما أمر هو واجب فلا، ألا ترى الحى لو أصاب أمر فى جوفه يتحقق أن حياته باستخراجه، لبقر عليه، ولم يكن إثما فى فعل ذلك بنفسه، أو بولده، أو عبده مع أن حرمة الحى أعظم من حرمة الميت ... ، وإحياء نفس أولى من صيانة ميت .[٣٢٧]

অর্থ- হযরত আয়েশার হাদীস এর অর্থ এই যে, বিনা প্রয়োজনে মৃতের হাড় ভাঙ্গা জীবিত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গার সমপরিমাণ অপরাধ। প্রয়োজনবোধে এমন করলে অপরাধ হবে না। এটাতো বলাই বাহুল্য যে, কোন জীবিত ব্যক্তির পেটে এমন কিছু পৌঁছলে, যার ফলে সে মৃত্যুমুখী হয়ে পড়ে তবে যদি ঐ বস্তু তার পেট থেকে বের করা হয় তাহলে তার প্রাণ রক্ষার আশা করা যায়। এ অবস্থায় তার দেহে অস্ত্রোপচার করা সম্পূর্ণ জায়েয, এতে কোন গুনাহ হবে না। চাই সে অস্ত্রোপচার আপন পেটে কিংবা বাচ্চা বা গোলামের পেটে হোক। অথচ জীবিত ব্যক্তির সম্মান মৃতের সম্মান থেকে অধিক... এবং মৃতের সম্মান সংরক্ষণের তুলনায় জীবিত ব্যক্তির জীবন সংরক্ষণ অধিক শ্রেয়।[৩২৮]

যেহেতু মেডিকেল কলেজগুলোতে লাশের অস্ত্রোপচার অনর্থক ও নিষ্প্রয়োজনে করা হয় না বরং বাস্তব ও অনিবার্য কারণে তথা হাজারো রোগীর চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ও জীবন বাঁচানোর লক্ষ্যে করা হয়, সেহেতু এটা উপরোক্ত হাদীসের আওতাভুক্ত হয়ে নিষেধের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

---

326 أخرجه عبدالرزاق –برقم ٦٢٥٦– هكذا بلفظ الجمع بخلاف ما أخرجه أبودؤد حيث أفرد ''العظم'' ، و قد سبق تخريجه .

327 التاج والإكليل للموافق بهامش مواهب الجليل للحطاب المالكى، كتاب الجنائز، قبيـــل كتاب الزكاة، ٣: ٧٧ .

৩২৮ আত্‌তাজ ওয়াল ইকলীল, খ. ৩, পৃ. ৭৭

এর থেকে তাদের ১ ও ২ নং দলীলের সাথে সাথে ৩ নং দলীলের উত্তরও স্পষ্ট হয়ে যায়। এ প্রশ্নে বলা হয়েছিলঃ "লাশের অস্ত্রোপচার 'مثله' (অঙ্গবিকৃতি) এর অন্তর্ভুক্ত। আর শরীআতের দৃষ্টিতে অঙ্গ বিকৃতি (مثله) করা মাকরুহে তাহরীমী বা হারাম।"

উক্ত কথাটি এ মাসআলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ, 'অঙ্গবিকৃতি' (مثله) তখনই হারাম ও নিষিদ্ধ, যখন তা বিনা প্রয়োজনে করা হয়। প্রয়োজনে করলে তা নিষেধ বা হারাম নয়। প্রয়োজনে জীবিত মানুষকে মুছলা (مثله) করাও তো নাজায়েয নয়।

কারোর হাত, পা ও কান ইত্যাদি কোন অঙ্গের যদি এমন কোন মারাত্মক রোগ দেখা দেয় যদ্দরুন তার মারা যাওয়ার আশঙ্কা হয় আর মুসলমান বিজ্ঞ ডাক্তার এ কথা বলে যে, রোগাক্রান্ত অঙ্গটি কেটে ফেলে দিলে তাকে বাঁচানো সম্ভব হবে, তাহলে ঐ অঙ্গটি কেটে ফেলে দেয়াকে কেউ নাজায়েয বলবে না। যদিও এতে মুছলা হচ্ছে।

উরানিঈনদের হাদীস এর যথেষ্ট প্রমাণ বহন করে। কেননা, তারা রাখাল হত্যা করে ছাদাকা ও যাকাতের উট নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় ধাওয়া করে তাদেরকে ধরে আনার পর "মুছলা" (مثله) করা হয়েছিল।[৩২৯]

অতএব, লাশের অস্ত্রোপচার করা মুছলা হলেও জরুরতবশত হওয়ার কারণে তা নাজায়েয হবে না।

(৫) শরীআতের দৃষ্টিতে চিকিৎসা করা যদিও ফরয-ওয়াজিব নয়। এতদ্‌সত্ত্বেও চিকিৎসার খাতিরে অনেক হারাম বস্তুর ব্যবহার বৈধ হয়ে যায়। (যেমন হারাম খাওয়া, ডাক্তারের সামনে সতর খোলা ও ডাক্তারের জন্য বেগানা রোগীর সতর দেখার অনুমতি থাকা ইত্যাদি) অথচ এগুলো স্পষ্ট হারাম ও قطعى دليل (অকাট্য দলীল) এর পরিপন্থী। অতএব, এখানেও চিকিৎসার লক্ষ্যে লাশের অস্ত্রোপচারকে বৈধতার হুকুম দেয়াই

---

৩২৯ বুখারী, খ. ১, পৃ. ৩৬-৩৭, হাদীস নং ২৩৩, ১৫৮০, ৩০১৮, ৪১৯২, ৪১৯৩

বাস্তব ও যুক্তিসঙ্গত। কেননা এর দ্বারা সর্বোচ্চ دليل ظنى এর বিরোধিতা হবে।

এখান থেকে তাদের ৪র্থ দলীলের উত্তরও বেরিয়ে আসে। আর তা এভাবে যে, যখন চিকিৎসা ফরয-ওয়াজিব না হওয়া সত্ত্বেও এর জন্য সতর খোলা, সতর দেখা ও হারাম খাওয়া জায়েয হয়ে যায়, তখন চিকিৎসাবিদ্যা অর্জন ফরয-ওয়াজিব না হওয়া সত্ত্বেও এর জন্য লাশের অস্ত্রোপচার বৈধ ও জায়েয হয়ে যাবে।

(৬) কেউ কারো মাল ভক্ষণ করে মারা গেলে শর্ত-সাপেক্ষে তার পেট কেটে মাল বের করার অনুমতি শরীআতে রয়েছে।[৩৩০] সুতরাং, যেখানে মাল উদ্ধারের লক্ষ্যে লাশের অস্ত্রোপচার বৈধ হয়, সেখানে হাজারো রোগীর প্রাণ রক্ষার্থে কিছু সংখ্যক লাশের অস্ত্রোপচার অবৈধ হওয়ার কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারে না।

একটি প্রশ্ন ও তার নিরসন

এখানে প্রথম পক্ষ তাদের তৃতীয় দলীল উল্লেখ করতে গিয়ে যে বলেছেঃ "অন্যের মাল খেয়ে মারা যাওয়া ব্যক্তি আপন হস্তক্ষেপের মাধ্যমে সীমালংঘন করেছে বিধায় তার মান ও মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়েছে। তাই তার উপর অস্ত্রোপচার বৈধ হয়েছে। পক্ষান্তরে, মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে এ ধরণের কোন সীমালংঘন হয়নি, যার উপর ভিত্তি করে অস্ত্রোপচারের বৈধতা প্রমাণ করা যাবে।"

এর উত্তর এই যে, এখানে তার থেকে সীমালংঘন পাওয়া না গেলে তার উপর অস্ত্রোপচার জায়েয হত না। তার কারণ হলঃ এখানে এক দিকে ছিল মানুষের সম্মান রক্ষা আর অপর দিকে ছিল মাল উদ্ধার। আর মালের তুলনায় মানুষের সম্মান চাই সে মৃত হউক বা জীবিত, লক্ষ-কোটি গুণ বেশি। তাই তার সম্মান বিদ্যমান থাকাবস্থায় অর্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে অস্ত্রোপচার বৈধ হয়নি। যখন সে সীমালংঘনের মাধ্যমে নিজের সম্মান

---

৩৩০ যা পূর্বের অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

নিজেই হারিয়ে ফেলেছে তখন মাল উদ্ধারের জন্য তার অস্ত্রোপচার বৈধ হয়েছে।

পক্ষান্তরে, চিকিৎসাবিদ্যা শেখার লক্ষ্যে লাশের অস্ত্রোপচার এমন নয় বরং এখানে দুই দিকেই মানুষ। এখানে মাল উদ্ধারের লক্ষ্যে অস্ত্রোপচার হচ্ছে না বরং মানুষ বাঁচানোর লক্ষ্যে হচ্ছে। আর মানুষ তো মানুষের উপকারের জন্যই। 'كنتم خير أمة أخرجت للناس' (তোমরা সর্বোত্তম উম্মত, মানুষের উপকারার্থে তোমাদেরকে পাঠানো হয়েছে) আয়াতটি উক্ত দাবির স্বপক্ষে যথেষ্ট সহায়ক। কেননা এখানে লাম (ل) দ্বারা যে উপকার বুঝানো হয়েছে তা ব্যাপক; আর্থিক, শারিরিক ও দৈহিক, এক কথায় দুনিয়া ও আখিরাতের সকল উপকারই এর মধ্যে শামিল রয়েছে। তাই এক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে সীমালংঘনের প্রয়োজন পড়বে না। অতএব, অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে মাল উদ্ধার করার উপর মেডিকেল কলেজে লাশের অস্ত্রোপচারকে তুলনা (قياس) করা ভুল নয় বরং একে উত্তম তুলনা তথা ইসতিহ্সান (استحسان) বলা হবে।

(৭)

و فى التجنيس من النوازل: امرأة حامل ماتت، واضطرب فى بطنها شيئ، وكان رأيهم أنه ولد حى، شق بطنها.[٣٣١]

لأن ذلك تسبب فى إحياء نفس محترمة بترك تعظيم الميت، فالإحياء أولى.[٣٣٢]

অর্থ- তাজনীস নামক কিতাবে উল্লেখ রয়েছেঃ গর্ভবতী মহিলা মারা গেছে এবং তার পেটে কি যেন নড়াচড়া করছে এবং তাদের ধারণা এটা জীবিত শিশু, তাহলে তার পেট কাটতে হবে ও বাচ্চা বের করতে হবে।[৩৩৩] কেননা একাজটি যদিও মৃতের সম্মানের পরিপন্থী কিন্তু এটা

---

331 فتح القدير، قبيل باب الشهيد، ٢: ١٥٠ .

332 البحرالرائق، ٨: ٣٧٦، تحت قول الكنـــز : وخصى البهائم .

৩৩৩ ফাতহুল কাদীর, খ. ২, পৃ. ১৫০

একটি সম্মানিত জীবন রক্ষার মাধ্যম হবে। অতএব জীবন বাঁচানোই উত্তম হবে।[৩৩৪]

এখানে লক্ষণীয় যে, মাত্র একটি জীবন রক্ষার্থে যদি লাশের অস্ত্রোপচার বৈধ হয়, তাহলে হাজারো রোগীর জীবন রক্ষার্থে অল্প কয়েকটি লাশের অস্ত্রোপচার জায়েয হবে না কেন?

একটি প্রশ্ন ও তার নিরসন

হযরত মুফতী রশীদ আহমাদ লুধিয়ানভী (রহ.) নিম্ন বর্ণিত কারণগুলোর উপর ভিত্তি করে এ قياس (তুলনা) কে বাতিল বলে আখ্যায়িত করেছেন। কারণগুলো হল, যথাক্রমে-

(এক) পেট কেটে বাচ্চা বের করা সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার একটি বিকল্প পদ্ধতি মাত্র, এতে মানুষের অসম্মানের কিছু নেই।

(দুই) সন্তান বের করার জন্য পেট কাটা একটি সাময়িক ব্যাপার। অতঃপর মৃত মাকে স্বসম্মানে দাফন করা হয়। পক্ষান্তরে মেডিকেল কলেজ গুলোতে লাশকে দীর্ঘ সময়ের জন্য অনুশীলনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়, যা মানুষের সম্মান ও মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করে।

(তিন) পেট কেটে বাচ্চা বের করার ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য থাকে 'বিদ্যমান জীবিত বাচ্চাকে বাঁচানো।' পক্ষান্তরে মেডিকেল কলেজগুলোতে লাশের অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে 'প্রাণ রক্ষার পদ্ধতি শিক্ষা করা' উদ্দেশ্য থাকে। বাস্তবে জীবন বাঁচানোর কার্যক্রম আর প্রাণ রক্ষার পদ্ধতি শিক্ষা এক পর্যায়ভুক্ত নয়। নিজের প্রাণ রক্ষার লক্ষ্যে আক্রমণকারীকে হত্যা করা জায়েয আছে, পক্ষান্তরে প্রাণ রক্ষার পদ্ধতি শিক্ষার লক্ষ্যে কাউকে হত্যা করা জায়েয নেই।

(চার) ইসলামের দৃষ্টিতে উপকরণ (أسباب) চার প্রকার। যথা-

১. **উন্মুক্ত উপকরণ** (السبب المطلق /General Instrument) :

---

৩৩৪ আলবাহ্‌রুর রায়িক, খ. ৮, পৃ. ৩৭৬

অর্থাৎ এমন উপকরণ, যার উপকার ও ক্ষতি কোনটিরই প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত নয়। যেমন, বিভিন্ন পানীয় বস্তু পান করলে উপকার ও ক্ষতি কোনটিই নিশ্চিত নয়।

এগুলো পান করা মুবাহ বা বৈধ।

২. সন্দেহযুক্ত উপকরণ (السبب الموهومي /Doudtful Instrument) :

অর্থাৎ এমন উপকরণ, যার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া কম বরং কখনো কখনো বিপরীত প্রতিক্রিয়ারও আশংকা রয়েছে। যেমন, দাগ বা সেঁক দেয়া। এগুলো ব্যবহার করলে উপকার হতেও পারে, নাও হতে পারে। তবে উপকারের তুলনায় অপকারের সম্ভাবনা বেশী।

এগুলো শরীআতের দৃষ্টিতে পরিত্যাজ্য।

৩. অনুমান ভিত্তিক উপকরণ (السبب الظني /Suppositive Instrument):

অর্থাৎ এমন উপকরণ যা ব্যবহার করলে ক্ষতির তুলনায় উপকারের সম্ভাবনা বেশী। যেমন- অধিকাংশ ডাক্তারী ও কবিরাজী চিকিৎসা।

এগুলো গ্রহণ করা শরীআতের দৃষ্টিতে শুধু উত্তমই নয় বরং মুস্তাহাব ও সুন্নাতও বটে।

৪. সুনিশ্চিত উপকরণ (السبب اليقيني/Certain Instrument) :

অর্থাৎ এমন উপকরণ, যার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সুনিশ্চিত। যেমন- খাবার ভক্ষণ করলে ক্ষুধা দূর হয়, পানি পান করলে পিপাসা নিবারিত হয় ইত্যাদি।

মৃত্যু মুখে পতিত হওয়ার আশংকা হলে এ ধরণের উপকরণ গ্রহণ করা ফরয আর বর্জন করা হারাম হয়ে যায়।[৩৩৫]

মৃতের পেট কেটে বাচ্চা বের করা এ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

---

৩৩৫ আদ্দুররুল মুখতার, [রদ্দুল মুহতার সংযুক্ত] খ. ৯, পৃ. ৪৮৮, জামিউল ফুসূলাইন, খ. ২, পৃ. ১৯০, ১৯১, ফাতাওয়া হিন্দিয়া, খ. ৫, পৃ. ৩৫৫, এবিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, "ইসলামের দৃষ্টিতে চিকিৎসা গ্রহণের অবস্থান" অধ্যায়ের "উপকরণের প্রকারভেদ ও তার হুকুম" পরিচ্ছেদ।

উক্ত চার প্রকার উপকরণ এক নয় বরং ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং একটিকে অপরটির সাথে قِياس বা তুলনা করা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নয়। অধিকন্তু, আলোচিত মাসআলাটির মধ্যে তো চিকিৎসা করা হচ্ছে না বরং চিকিৎসার পদ্ধতি শেখানো হচ্ছে মাত্র। আর চিকিৎসা করা ও চিকিৎসার পদ্ধতি শেখা কখনো এক নয়।

(পাঁচ) বাচ্চার প্রাণ রক্ষার জন্য মৃত মায়ের পেট কাটা ব্যতীত বিকল্প কোন পদ্ধতি নেই। পক্ষান্তরে, ডাক্তারিবিদ্যা শেখার জন্য লাশের অস্ত্রোপচার ব্যতীত একাধিক বিকল্প পদ্ধতি রয়েছে। যেমন- এক্স-রে মেশিন, বিভিন্ন প্রাণী ও জীবজন্তু, প্লাষ্টিকের তৈরী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইত্যাদি। এগুলোর মাধ্যমে মানুষের বিভিন্ন অঙ্গের গঠন-প্রণালীও কার্যবিধি জানা যায়।

কেউ কেউ লাশের অস্ত্রোপচার করাকে জীবিত ও মৃত ব্যক্তির পেট কেটে মাল বের করার সাথে قِياس (তুলনা) করে থাকে। এ قِياس (তুলনা) টিও সঠিক নয়। কেননা ফিকহের কিতাবগুলোতে উপরোক্ত কারণ এভাবে উল্লেখ করেছেঃ

لأنه وإن كان حرمة الآدمى أعلى من صيانة المال، لكنه أزال إحترامه بتعديه.[٣٣٦]

অর্থ- কেননা যদিও মালের তুলনায় মানুষের মান-সম্মান অধিক। কিন্তু সে অনর্থক ও অন্যায় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে নিজের সম্মান নিজেই বিনষ্ট করেছে।[৩৩৭]

এর দ্বারা এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, এখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সীমালংঘনের কারণেই তার সম্মান ও মর্যাদা ক্ষুন্ন করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে এ ধরণের কোন সীমালংঘন পাওয়া যায়নি। যার উপর ভিত্তি করে তার মান ও মর্যাদা ক্ষুন্ন করা হবে।

---

336 فتح القدير، كتاب الجنائز، قبيل باب الشهيد، ٢: ١٥٠، رد المحتار، كتاب الجنائز فى آخر دفن الميت، ٣: ١٤٥-١٤٦ .

৩৩৭ ফাতহুল কাদীর, খ. ২, পৃ. ১৫০, রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ১৪৫-১৪৬

উক্ত পাঁচটি কারণের উত্তর পর্যায়ক্রমে নিম্নে দেয়া হলোঃ

এক ও দুই- লাশের অস্ত্রোপচার চিকিৎসা পদ্ধতি শিক্ষা করার একটি সর্বাধুনিক ও পরিপূর্ণ পদ্ধতিমাত্র, যা অপারেশনের মাধ্যমে চিকিৎসা করার জন্য অপরিহার্য। এতে লাশের অসম্মান উদ্দেশ্য নয়। লাশের অস্ত্রোপচারকে বর্তমান সমাজে অসম্মান মনেও করা হয় না। এর বিস্তারিত আলোচনা অঙ্গ সংযোজন অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

তিন- মেডিকেল কলেজে লাশের অস্ত্রোপচার রোগীর জীবন বাঁচানোর জন্য করা হয়। জীবন বাঁচানো উদ্দেশ্য না থাকলে এ শিক্ষা মূল্যহীন হয়ে পড়ে। পূর্ব থেকে এ শিক্ষা অর্জন না করে থাকলে রোগী আসার পর তার চিকিৎসা কিভাবে করবে? রোগী আসার পর শিক্ষা শুরু করলে তো রোগী বাঁচানো যাবে না। অতএব, একে নিছক শিক্ষার উদ্দেশ্যে লাশ কাটা-ছেঁড়া করা না বলে কার্যত (حكماً) জীবন বাঁচানোর লক্ষ্যে এমন করা হয় বলাটাই অধিক যুক্তিসঙ্গত হবে। এর বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে।

চার- লাশের অস্ত্রোপচারও ১নং উপকরণ (أسباب) এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ, এর মাধ্যমে চিকিৎসাবিদ্যা অর্জন ও পরবর্তীতে এর উপর ভিত্তি করে চিকিৎসা করলে রোগ নিরাময় হওয়া 'ظن غالب' (প্রবল বিশ্বাস), যা يقين তথা নিশ্চিত বিশ্বাস এর হুকুমে। এখানে গুনাহ হওয়া না হওয়ার আলোচনা নয়, জায়েয-নাজায়েযের আলোচনা। আর এ দু'টি এক বিষয় নয়, ভিন্ন জিনিস। অর্থাৎ চিকিৎসা না করা গুনাহের কাজ নয়, চিকিৎসা করা ফরয-ওয়াজিবও নয়। তথাপিও চিকিৎসার জন্য হারাম ওষুধ ব্যবহার করা, সতর খোলা ও সতর দেখা ইত্যাদি হারাম কাজ যা অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত, তা বৈধ করা হয়েছে। সুতরাং, লাশ কাটার মত এমন নাজায়েয কাজ যা অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়, তা বৈধ হবে না কেন?

পাঁচ- এর উত্তর পূর্বে ২য় পক্ষের চার নং দলীলের "খ" এ দেয়া হয়েছে।

لو كان أحدهما أعظم ضرراً عن الآخر؛ فإن الأشد يزال بالأخف.[৩৩৮]

অর্থ- যদি দুই ক্ষতির মধ্য হতে একটি অপরটি থেকে অধিক কঠিন ও বড় হয়, তাহলে তুলনামূলক ছোট ক্ষতির মাধ্যমে বড় ক্ষতিকে প্রতিবিধাণ করা হবে।[৩৩৯]

লাশের অস্ত্রোপচার ছোট ক্ষতি, কিন্তু রোগীকে চিকিৎসা ছাড়া ফেলে রেখে ধুঁকে ধুঁকে মরতে দেওয়া বড় ক্ষতি। অতএব, ছোট ক্ষতি তথা লাশের অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে বড় ক্ষতি তথা রোগীর কষ্ট লাঘব করা বৈধ হবে। এ জন্যই তো আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أشد من القتل.[৩৪০]

অর্থ- তারা সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন? বলে দিন, এতে যুদ্ধ করা ভীষণ পাপ। আর আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা, কুফরী করা, মসজিদে হারামের পথে বাধা দেয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহিষ্কার করা আল্লাহ্র নিকট তার চেয়েও বড় পাপ। ফিতনা হত্যা অপেক্ষা ভীষণ অন্যায়।[৩৪১]

উক্ত আয়াত এ কথার স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে যে, ভবিষ্যতে হাজারো প্রাণ রক্ষার উদ্দেশ্যে বর্তমান কিছু সংখ্যক লাশের অস্ত্রোপচার বৈধ। কেননা নিষিদ্ধ ও সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করলে সম্মানিত মাসের অসম্মান হলেও এর দ্বারা আল্লাহ্র পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা, কুফরী করা, মসজিদে হারামের পথে বাধা দেয়া ও সেখানকার অধিবাসীদের বহিষ্কারের মতো মারাত্মক ও ঘৃণিত কাজ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে বিধায় নিষিদ্ধ ও সম্মানিত মাসে যুদ্ধ বৈধ করা হয়েছে।

---

338 الأشباه والنظائر، تحت القاعدة الخامسة: الضرر يزال، ص: ٩٦ .

৩৩৯ আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ির, পৃ. ৯৬

340 سورة البقرة، آية: ٢١٧ .

৩৪১ সূরা বাকারা, আয়াত: ২১৭

অতএব, লাশের উপর অস্ত্রোপচারের মতো ক্ষতিকারক একটি কাজের মাধ্যমে রোগীর কষ্ট পাওয়া ও মারা যাওয়ার মতো আরও বড় ক্ষতি থেকে পরিত্রাণ লাভ করা বৈধ ও যুক্তিসঙ্গত।

এক্ষেত্রে প্রথম পক্ষ একথা বলে দলীলটি খন্ডন করতে চেয়েছে যে, এখানে প্রাণ রক্ষার কার্যক্রম হচ্ছে না বরং প্রাণ হিফাযতের পদ্ধতি শেখানো হচ্ছে মাত্র। সেখানে চিকিৎসা করা উপকরণের ২য় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পক্ষান্তরে, এখানে তো চিকিৎসাই করা হচ্ছে না বরং চিকিৎসা শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। সুতরাং এর জন্য মানব সম্মানহানি করা যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না।[৩৪২]

এর উত্তরে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, প্রাণ রক্ষার পদ্ধতি শেখাই এ ক্ষেত্রে প্রাণ রক্ষার নামান্তর। কারণ, এ ক্ষেত্রে প্রাণ রক্ষার পদ্ধতি পূর্ব থেকে শিখে না রাখলে সময় মতো প্রাণ রক্ষার কল্পনাও করা যাবে না। তাই চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রাণ রক্ষার পদ্ধতি শেখানোই কার্যত (حكماً) প্রাণ রক্ষার স্থলাভিষিক্ত (قائم مقام) মেনে নেয়া আবশ্যক।

ক্ষুধার তাড়নায় মারা যাওয়ার উপক্রম হলে মাযহাব চতুষ্টয়ের সকলের মত অনুযায়ী মৃত মানুষের গোস্ত ভক্ষণ করে হলেও প্রাণ রক্ষা করা জায়েয আছে। অথচ এখানে মৃতের কোন অপরাধ ছিলনা তথাপি প্রাণ রক্ষা; লাশ রক্ষার তুলনায় বেশী আবশ্যক হওয়ার কারণে প্রাণ রক্ষাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। অতএব, হাজার হাজার রোগীর প্রাণ রক্ষার্থে কিছু সংখ্যক লাশের অস্ত্রোপচার বৈধ হওয়াই যুক্তির দাবি।

নিম্নে চার মাযহাবের গুরুত্বপূর্ণ কিতাবগুলো হতে কিছু ভাষ্য উল্লেখ করা হল;

আল মুগনীতে স্পষ্টভাবে হানাফী মাযহাবের কিছু আলেমের উদ্বৃতি দিয়ে উল্লেখ রয়েছেঃ

إن عند بعض الحنفية: يباح للمضطر أكل لحم الإنسان الميت ... وهو أولى، لأن حرمة الحى أعظم.[٣٤٣]

---

৩৪২ আহসানুল ফাতাওয়া, কিতাবুল হাযরি ওয়াল ইবাহা, খ. ৮, পৃ. ৩৪১-৩৪৩

343 المغنى، كتاب الذبائح، مبحث المضطر، مسئلة "ومن اضطر فأصاب الميتة" الخ، ١١: ٨١ .

অর্থ- ক্ষুধার তাড়নায় নিরুপায় হয়ে প্রাণ রক্ষার্থে মৃত মানুষের গোস্ত ভক্ষণ করা কিছু সংখ্যক হানাফী আলেমের নিকট জায়েয ... আর এ মতটি প্রণিধানযোগ্য। কেননা জীবিতের মর্যাদা ও সম্মান মৃতের তুলনায় অধিক।[৩৪৪]

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মূল নীতি গ্রন্থ 'আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ির' (পৃ. ৯৯) এ উল্লেখ আছেঃ

"الصيد أولى من لحم الإنسان".[٣٤٥] مفهومه: أنه إذا لم يجد شيئا غير لحم الإنسان الميت يباح له أكله.[٣٤٦]

অর্থ- "(ক্ষুধার্ত ইহরাম বাঁধা ব্যক্তির জন্য জীবন রক্ষার্থে) মানুষের গোস্ত খাওয়ার তুলনায় শিকারের গোস্ত খাওয়া উত্তম।"[৩৪৭] উক্ত মাসআলা থেকে একথা উদ্‌ঘাটিত হয় যে, যদি উক্ত নিরুপায় ব্যক্তি মানুষের গোস্ত ব্যতীত অন্য কিছু না পায় তাহলে এমতাবস্থায় মানুষের গোস্ত খাওয়াও বৈধ।[৩৪৮]

শাফেয়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব 'রওযাতুত্তালিবীন' এ উল্লেখ আছেঃ

ولو لم يجد إلا آدميا معصوما ميتا، فالصحيح حل أكله.[٣٤٩]

অর্থ- (ক্ষুধার্ত ইহরামবাঁধা ব্যক্তি) মৃত মানুষ ব্যতীত অন্য কিছু না পেলে এমতাবস্থায় তার জন্য ওই মৃত মানুষের গোস্ত খাওয়া বৈধ। আর এটিই সঠিক মত।[৩৫০]

---

৩৪৪ আলমুগনী, খ. ১১, পৃ. ৮১

345 الأشباه والنظائرلابن نجيم، ص: ٩٩ .

346 الشرح الناصر [تسكين الأرواح]، تحت قاعدة "الضرورات تبيح المحظـــورات"، ٦: ٣٦٦ .

৩৪৭ আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ির, পৃ. ৯৯

৩৪৮ আশ শারহুন নাযির, খ. ৬, পৃ. ৩৬৬

349 روضة الطالبين للنووى، كتاب الأطعمة، الباب الثانى فى حال الاضطرار، ٣: ٢٨٤ .

মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধতম কিতাব 'হাশিয়াতুল খুরাশী' ও 'মিনাহুল জালীল' এ উল্লেখ আছেঃ

"والنص عدم جواز أكله لمضطر، وصح أكله" يريد أن المنصوصة لأهل المذهب، أن المضطر لايأكل من ميتة الآدمى شيئا ولو كافراً، إذ لاتفد حرمة آدمى لآخر، وقيل يأكل – ابن عبد السلام – وهو الظاهر، وإليه أشار بقوله و"صح أكله". [٣٥١]

অর্থ- মাযহাব প্রবর্তকগণ থেকে বর্ণিত, ক্ষুধার্ত ব্যক্তি নিরুপায় হলেও প্রাণ রক্ষার জন্য মৃত মানুষের গোস্ত ভক্ষণ করবে না, যদিও কাফিরের লাশ হয়। কেননা এক জনের জন্য অপরের সম্মান বিনষ্ট করা যায় না। কারো কারো মতে, এমতাবস্থায় মৃত মানুষের গোস্ত খাওয়াও বৈধ। ইবনে আব্দুস্ সালাম বলেনঃ এই মতটি অধিক প্রণিধানযোগ্য। আর وصح أكله বলে খাওয়ার মতটি সঠিক হওয়ার দিকে কিতাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে।[৩৫২]

হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধতম কিতাব 'আল মুগনী'তে উল্লেখ আছেঃ

قال ابن قدامة: وإن وجد معصوماً ميتاً لم يبح أكله فى قول أصحابنا، وقال الشافعى وبعض الحنفية: يباح، وهو أولى، لأن حرمة الحى أعظم.[٣٥٣]

---

৩৫০ রওযাতুত্তালিবীন, খ. ৩, পৃ. ২৮৪

351 حاشية الخرشى على مختصر سيدى خليل، فى آخر الجنائز، ٢: ١٤٤، وفى باب المباح من الأطعمة، ٣: ٢٦، ومثله: فى منح الجليل شرح مختصر خليل، ١: ٥٩٧ .

৩৫২ হাশিয়াতুল খুরাশী আলা মুখতাছারে সায়্যিদী খলীল, খ. ২, পৃ. ১৪৪ ও খ. ৩, পৃ. ২৬, মিনাহুল জালীল শারহু মুখতাছারিল খলীল, খ. ১, পৃ. ৫৯৭

353 المغنى، مسئلة من اضطر فأصاب الميتة الخ، ٨: ٦٠٢، والشرح الكبير بهامش المغنى، ١١: ٨١ .

অর্থ- ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) বলেন, ক্ষুধার্ত ব্যক্তি ক্ষুধা নিবারণের জন্য নির্দোষ লাশ ব্যতীত অন্য কিছু না পেলেও হাম্বলী উলামাদের মতে তা খাওয়া তার জন্য বৈধ নয়। শাফিয়ী এবং কিছু সংখ্যক হানাফীর নিকট বৈধ। আর এই মতটিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। কেননা জীবিত ব্যক্তির সম্মান মৃতের তুলনায় অধিক।[৩৫৪]

মুদ্দাকথা, চিকিৎসার উদ্দেশ্যে শিক্ষা অর্জন করার জন্য লাশের উপর অস্ত্রোপচার যুক্তিসঙ্গত ও বৈধ প্রমাণিত হল।

মহিলাদেরকে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষাদান

মুসলমান মহিলা ডাক্তার পাওয়া গেলে মুসলমান মহিলাদের চিকিৎসা মুসলমান মহিলা ডাক্তার দ্বারা করানো ওয়াজিব। মুসলমান মহিলা ডাক্তার পাওয়া না গেলে অমুসলিম মহিলা ডাক্তার দিয়ে করাবে। অমুসলিম মহিলা ডাক্তার পাওয়া না গেলে মুসলমান পুরুষ ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাতে পারবে। তাও পাওয়া না গেলে অমুসলিম পুরুষ ডাক্তার দিয়ে করাতে পারবে। তবে এক্ষেত্রে পুরুষ ডাক্তার চিকিৎসার ক্ষেত্রে যতটুকু শরীর দেখার প্রয়োজন হয় কেবলমাত্র ততটুকুই দেখতে পারবে। এর অতিরিক্ত দেখতে পারবে না এবং সর্বাবস্থায় যতটুকু সম্ভব চক্ষু নিচু করে রাখবে। আর এ অবস্থায় পুরুষ ডাক্তারের সাথে মহিলা রুগীর স্বামী, পিতা, ভাই ইত্যাদি কোন মাহরাম পুরুষ থাকতে হবে। তা সম্ভব না হলে কমপক্ষে নির্ভরযোগ্য কোন মহিলা সাথে থাকতে হবে। যাতে নির্জনতা (خلوة صحيحة) না হয়।[৩৫৫]

এখান থেকে এ কথা বেরিয়ে আসে যে, পুরুষের ন্যায় মহিলাদেরকেও শরীআতের পাবন্দি সাপেক্ষে ডাক্তারী শিক্ষা দেয়া চাই। বাদায়ে ইত্যাদি কিতাবে আছে ঃ

---

৩৫৪ আল মুগনী, খ. ৮, পৃ. ৬০২, আশ্ শারহুল কাবীর [আল মুগনী সংলগ্ন], খ. ১১ পৃ. ৮১

৩৫৫ কারারাতু মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী, জেদ্দা, পৃ. ৪১

أما إذا كان المرض في سائر بدنها غير الفرج ، فإنه يجوز له النظر إليه عند الدواء ؛ لأنه موضع ضرورة ، وإن كان في موضع الفرج ، فينبغي[٣٥٦] أن يعلّم امرأة تداويها ، فإن لم توجد امرأة تداويها ، وخافوا عليها أن تهلك أو يصيبها بلاء أو وجع لا تحتمله ، ستروا منها كل شيء إلا موضع العلة ، ثم يداويها الرجل ، و يغض بصره ما استطاع إلا من موضع الجرح .[٣٥٧]

অর্থ ঃ যদি লজ্জাস্থান ব্যতীত মহিলার পুরা শরীরে রোগ থাকে তাহলে চিকিৎসার প্রয়োজনে পুরুষ ডাক্তার তার দিকে তাকাতে পারবে। আর যদি লজ্জাস্থানেই সমস্যা থাকে তাহলে কোন মহিলাকে চিকিৎসা শিখিয়ে[৩৫৮] তার দ্বারা চিকিৎসা করাবে। হ্যাঁ, যদি এমন মহিলা পাওয়া না যায় যে চিকিৎসা করতে পারে আর এদিকে রুগী মারা যাওয়ার আশংকা থাকে অথবা তার ব্যথা ও কষ্ট সহ্যের বাইরে চলে যাওয়ার আশংকা হয় তাহলে তার পুরা শরীর ঢেকে দিয়ে শুধু রোগাক্রান্ত জায়গাটি খোলা রেখে পুরুষ ডাক্তার চিকিৎসা করতে পারবে। তবে এ অবস্থায়ও ঐ রোগাক্রান্ত জায়গা ব্যতীত বাকি সকল জায়গা থেকে চক্ষু সরিয়ে রাখবে।[৩৫৯]

---

356 و في رد المحتار ، ٦: ٣٧١ : و الظاهر أن "ينبغي" هنا للوجوب .

357 الجوهرة النيرة ، كتاب الحظر و الإباحة ، ٢: ٣٨٥ ، و تبعه في رد المحتار ، ٦: ٣٧١ ، و مثله فى بدائع الصنائع ، كتاب الاستحسان ، ٥ : ١٢٤ ، و أبي السعود ، ١: ٤٢٧ .

৩৫৮ উল্লেখ্য, ফাতাওয়ায়ে শামী (খ. ৬, পৃ. ৩৭১) এ উল্লেখ আছে যে, এখানে "ينبغي" শব্দটি ওয়াজিবের অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ এ অবস্থায় মহিলাদেরকে ডাক্তারী শিখানো ওয়াজিব।

৩৫৯ আল জাওহারাহ, খ. ২, পৃ. ৩৮৫, ফাতাওয়ায়ে শামী, খ. ৬, পৃ. ৩৭১, বাদায়ে, খ. ৫, পৃ. ১২৪, আবুস সাউদ, খ. ১, পৃ. ৪২৭

(৩) জীবিত মানুষের আর্থিক উপকারার্থে অস্ত্রোপচার

যেমন কেউ কোন বস্তু খেয়ে মারা গেল। ঐ বস্তু উদ্ধারের লক্ষ্যে তার পেট কাটা যাবে কি না?

এ মাসআলাটি নিয়ে দু'ধরণের বর্ণনা পাওয়া যায়। এখানে সকল বর্ণনা উল্লেখ করে পরস্পরের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করতে গেলে আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে বিধায় ধারাবাহিকভাবে মাসআলার সকল সূরত ও তার গ্রহণযোগ্য হুকুম (مفتی بہ حکم) নিম্নে বর্ণনা করা হল। যথা-

মাসআলাটির বিবরণ এভাবে দেয়া যায় যে, হয়তো সে 'নিজের' মাল ভক্ষণ করেছে অথবা 'অপরের' মাল। প্রথম অবস্থার হুকুম হল, ভক্ষণকৃত মাল বের করার লক্ষ্যে তার পেট কাটা জায়েয নেই। কেননা মালের মূল্য থেকে মানুষের মূল্য,সম্মান ও মর্যাদা অনেক বেশি। লাশের উপর অস্ত্রোপচার করলে তার মর্যাদাহানি হয়। আর অল্প মূল্যের মাল উদ্ধারের লক্ষ্যে অধিক মূল্য ও মর্যাদাবান মানুষের পেট কেটে তার মর্যাদাহানি করা যুক্তিসংগত হতে পারে না।

আর দ্বিতীয় অবস্থাটি আবার দু'ভাগে বিভক্তঃ হয়ত ভক্ষণের পর সে ব্যক্তি 'জীবিত' আছে অথবা 'মারা' গেছে। প্রথম অবস্থার হুকুম হল, তার পেট কাটা জায়েয নেই। কেননা মালের চেয়ে জীবনের মূল্য অনেক বেশি। তবে তাকে ঐ মালের ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, এ হুকুমটি তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন ভক্ষণকৃত মাল ভক্ষণকারীর কোন ক্ষতি না করে। যদি তার মৃত্যুর আশংকা অথবা অসহনীয় ব্যাথা দেখা দেয় এবং বিজ্ঞ ডাক্তার এ মত পোষণ করে যে, অপারেশনের মাধ্যমে ভক্ষণ কৃত বস্তুটি বের করে ফেললে সে বেঁচে যাবে তাহলে তা বের করার লক্ষ্যে তার পেট কাটা জায়েয হবে। এ অবস্থায় তার পেট কাটা মাল উদ্ধারের জন্য হবে না, বরং জীবন বাঁচানোর জন্য হবে।

দ্বিতীয় অবস্থাটি (অর্থাৎ ভক্ষণের পর যদি ভক্ষক মারা যায়) সেটাও দু'ভাগে বিভক্তঃ হয়তো তার কোন প্রকার ইচ্ছা ও হস্তক্ষেপ ব্যতীত ঐ

মালটি তার পেটে গেছে, অথবা তার ইচ্ছা ও হস্তক্ষেপের কারণে পেটে গেছে। প্রথম অবস্থায় তার পেট কাটা জায়েয নেই। কারণ, মালের তুলনায় মৃত হলেও মানুষের সম্মান অধিক।

দ্বিতীয় অবস্থাটি পুনরায় দু'ভাগে বিভক্তঃ হয়তো সে এমন মাল ভক্ষণ করেছে যা পেটে পৌঁছলে নষ্ট অথবা হজম হয়ে যায়, যেমন খাদ্য বস্তু ও মুক্তা ইত্যাদি, অথবা এমন মাল ভক্ষণ করেছে যা পেটে গেলে নষ্ট হয় না, যেমন- সোনা-রূপা ইত্যাদি। প্রথম অবস্থার হুকুম হল, তার পেট কাটা জায়েয নেই, কেননা এতে কোন লাভ হবে না।

দ্বিতীয় অবস্থাটি পুনরায় দু'ভাগে বিভক্তঃ হয়তো ভক্ষকের পরিত্যক্ত সম্পদ আছে অথবা নেই। প্রথম অবস্থার হুকুম হল, পেট কাটা জায়েয নেই। কেননা সম্পদের তুলনায় মৃত হলেও মানুষের সম্মান অগ্রগণ্য। এ অবস্থায় তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে দিবে।

দ্বিতীয় অবস্থাটি পুনরায় দু'ভাগে বিভক্তঃ ভক্ষণ কৃত মালের মূল্য দশ দিরহাম (৩০.৬১৮ গ্রাম রুপা বা তার সমমূল্য) থেকে কম হবে অথবা বেশি হবে। প্রথম অবস্থার হুকুম হল, তার পেট কাটা জায়েয নেই। কারণ, দশ দিরহাম (৩০.৬১৮ গ্রাম রুপা বা তার সমমূল্য) এর থেকে কম মূল্যের মাল চুরি করলে চোরের হাত কাটা হয় না। অতএব, এত কম মালের জন্য পেট কাটাও বৈধ হবে না।

দ্বিতীয় অবস্থাটি আবার দু'ভাগে বিভক্তঃ মালের মালিক তাকে মাফ করে দিবে অথবা মাফ করে দিবে না। প্রথম অবস্থায় হুকুম হল, তার পেট কাটা জায়েয নেই। কেননা মালিক নিজেই তার হক ছেড়ে দিয়েছে।

দ্বিতীয় অবস্থায় তার পেট কেটে মাল বের করবে। কেননা যদি একথা মেনে নেয়া হয় যে, মানুষের সম্মান বজায় রাখা আল্লাহ পাকের হক। তাহলে পেট কাটা এ জন্য বৈধ হবে যে, আল্লাহ তা'আলার হকের তুলনায় বান্দার হক অগ্রাধিকার রাখে। কারণ, বান্দা মুহতাজ ও মুখাপেক্ষী, আর আল্লাহ পাক 'সামাদ' ও অমুখাপেক্ষী। আর যদি এ কথা মেনে নেয়া হয় যে, মানুষের সম্মান ও মর্যাদা মানুষেরই হক, তাহলেও

পেট কাটা এ জন্য বৈধ হবে যে, জীবিত ব্যক্তির হক মৃত ব্যক্তির হকের তুলনায় অগ্রগণ্য।

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, মানুষের সম্মান ও মর্যাদা মালের তুলনায় অনেক বেশি। অতএব, এ অবস্থায় পেট না কাটা চাই?

উত্তরঃ এখানে পেট কাটার হুকুম এ জন্য দেয়া হয় যে, যদিও মানুষের সম্মান ও মর্যাদা মালের তুলনায় বেশি, কিন্তু সে নিজেই তার হস্তক্ষেপ ও সীমালংঘনের কারণে স্বীয় মর্যাদা ক্ষুন্ন করেছে।[৩৬০]

---

360 الشرح الناصر [تسكين الأرواح والضمائر فى شرح الأشباه والنظائر]، تحت القاعدة الخامسة ''الضرر يزال''، ٦: ٤٣٥-٤٣٩ . আশ শরহুন নাযির, খ. ৬, পৃ. ৪৩৫-৪৩৯

মাসআলাটি সহজে বুঝার জন্য নিম্নে ছক আকারে পেশ করা হল

জীবিত মানুষের আর্থিক উপকারার্থে পেট কাটা

নিজের মাল ভক্ষণ করেছে
হুকুম: পেট কাটা জায়েয নেই

অন্যের মাল ভক্ষণ করেছে

ভক্ষণ করার পর জীবিত আছে
হুকুম:মাল উদ্ধারের লক্ষ্যে পেট কাটা জায়েয নেই।
বরং তাকে ঐ মালের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।
তবে তাকে বাঁচানোর জন্য পেট কাটা জায়েয।

ভক্ষণ করার পর মৃত্যু বরণ করেছে

অনিচ্ছাকৃত ভক্ষন করেছে
হুকুম: পেট কাটা জায়েয নেই

ইচ্ছাকৃত ভক্ষন করেছে

এমন বস্তু ভক্ষণ করেছে যা নষ্ট হয়ে যায়
হুকুম: পেট কাটা জায়েয নেই

এমন বস্তু ভক্ষণ করেছে যা নষ্ট হয়না

ভক্ষণকারীর সম্পদ আছে
হুকুম: পেট কাটা জায়েয নেই,
বরং তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করবে।

ভক্ষণকারীর সম্পদ নেই

ভক্ষণকৃত মালের মূল্য দশ দিরহাম (৩০.৬১৮ গ্রাম রুপার সমমূল্য) থেকে কম
হুকুম: পেট কাটা জায়েয নেই

ভক্ষণকৃত মালের মূল্য দশ দিরহাম (৩০.৬১৮ গ্রাম রুপার সমমূল্য) অথবা ততোধিক

মালিক তাকে মাফ করে দিয়েছে
হুকুম: পেট কাটা জায়েয নেই

মালিক তাকে মাফ করে দেয়নি
হুকুম: পেট কেটে মাল বের করে নিবে

هبة الدم
রক্তদান
BLOOD DONATION

একে অপরকে সাধারণত দু'ভাবে রক্ত দিয়ে থাকে।

(১) বিক্রি করে। রক্ত বিক্রি সর্বসম্মতিক্রমে হারাম।

(২) দান করে। আর তা বিক্রি ছাড়া দু'ভাবে হতে পারে। যথা-

ক) বিনা প্রয়োজনে দান করা

খ) রোগীর প্রয়োজনে দান করা

বিনা প্রয়োজনে দান করা জায়েয নেই। প্রয়োজনে দান করলেও তা দু'কারণে নাজায়েয হওয়া প্রতীয়মান হয়। যথা-

(১) রক্ত মানব দেহের অংশ। আর মানব দেহের অংশ দেহ থেকে পৃথক হওয়ার পর ব্যবহার করা জায়েয নেই।

(২) রক্ত নাপাক। আর হাদীসে আছে নাপাক বস্তুর মধ্যে কোন চিকিৎসা নেই।

প্রথম কারণ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করলে একথা বুঝে আসে যে, রক্ত যদিও মানব দেহের অংশ কিন্তু তাকে একজনের শরীর হতে অন্য জনের শরীরে পৌঁছাতে কারোর দেহে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন পড়েনা। বরং ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে এক জনের দেহ থেকে অপর জনের দেহে রক্ত প্রবেশ করানো হয়। এ হিসেবে একে মানুষের দুধের সাথে তুলনা করা যায়, যা অস্ত্রোপচার ব্যতীত এক জনের দেহ থেকে বের হয়ে অপর জনের দেহে সঞ্চালিত হয়। ইসলামী শরী'আত নবজাত শিশুর প্রয়োজনকে বিবেচনা করে মানুষের দুধকে শিশুর খাবার সাব্যস্ত করেছে। তাইতো মায়ের জন্য নবজাত শিশুকে দুধ পান করানো শুধু জায়েযই নয় বরং সাধারণ অবস্থায় ওয়াজিব ও আবশ্যকও বটে। শিশু ব্যতীত বড় মানুষদের জন্যও চিকিৎসা হিসেবে মহিলাদের দুধ ব্যবহার করা জায়েয বলা হয়েছে।

ফাতাওয়ায়ে আলমগীরিতে উল্লেখ আছেঃ

ولا بأس بأن يسعط الرجل بلبن المرأة ويشربه للدواء .[٣٦١]

অর্থ- "কোন ব্যক্তি ওষুধ হিসেবে মহিলাদের দুধ ব্যবহার করলে শরীআতের দৃষ্টিতে এতে কোন অসুবিধা নেই।"[৩৬২]

অতএব, দুধের সাথে তুলনা করে একথা বলা যায় যে, মহিলার দুধ তাদের অংশ হওয়া সত্ত্বেও রোগীর জন্য তা ব্যবহার করা জায়েয আছে।

নাজায়েয হওয়ার দ্বিতীয় কারণ রক্ত নাপাক তাই তা ব্যবহারও নাজায়েয হবে। কিন্তু পেছনে হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা (التداوي بالمحرم) অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যে, প্রয়োজনে হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা জায়েয। কারণ, চিকিৎসার প্রয়োজন দেখা দিলে তখন হারাম আর হারাম থাকে না।

সুতরাং চিকিৎসার খাতিরে রক্ত দানকে সম্পূর্ণভাবে নাজায়েয বলা যাবে না। তবে তা জায়েয হওয়ার জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তগুলো পাওয়া যাওয়া আবশ্যক।

(১) রক্তের প্রয়োজন দেখা দেয়া, অর্থাৎ রক্ত পুশ (Push) না করলে রুগী মারা যাওয়ার আশংকা থাকা;
(২) রক্ত দেয়া ব্যতীত চিকিৎসার বিকল্প কোন ব্যবস্থা না থাকা;
(৩) রক্তের মাধ্যমে চিকিৎসা হবে, একথা কোন বিজ্ঞ ডাক্তার কর্তৃক স্বীকৃত হওয়া;
(৪) জরুরতের পর্যায় না হলেও কমপক্ষে হাজাতের পর্যায় হওয়া;
(৫) যীনাত (সৌন্দর্য বর্ধন) উদ্দেশ্য না হওয়া।[৩৬৩]

❖ ❖ ❖

361 الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية، الباب الثامن عشر في التداوى والمعالجات، ٥: ٣٥٥

.

৩৬২ আলমগীরী, খ. ৫, পৃ. ৩৫৫

৩৬৩ জরুরত, হাজত, মানফাআত ও যীনাত এর সংজ্ঞা এবং পার্থক্য পূর্বে লাশের অস্ত্রোপচার অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

شراء الدم وبيعه
রক্ত ক্রয়-বিক্রয়
Blood Buy & Sell

রক্ত ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়, হারাম। রক্তের বিনিময় গ্রহণও হারাম।

لأن الآدمى مكرم (بجميع أجزائه)، قال الله تعالى: "ولقد كرمنا بنى آدم"[٣٦٤]، فلا يجوز أن يكون شئ من أجزائه مهانا ومبتذلا.[٣٦٥] وفى بيعه إهانة.[٣٦٦]

قيل: إذا كان لا يوجد (أى: نجس العين (والضرورة داعية إليها) إلا بالبيع جاز بيعه، لكن الثمن لايطيب للبائع .[٣٦٧]

অর্থ- কেননা মানুষ (তার সকল অঙ্গসহকারে) সম্মানিত। আল্লাহ পাক বলেনঃ "নিশ্চয়ই আমি আদম জাতিকে সম্মানিত করেছি।"[৩৬৮] সুতরাং একে ও এর কোন অঙ্গকে অসম্মানিত করা যাবে না।[৩৬৯] আর একে ও এর কোন অঙ্গকে বিক্রি করা মানে অসম্মান করা।[৩৭০]

বলা হয়েছে, যদি কোন নাপাক বস্তু ক্রয় করা ব্যতীত পাওয়া না যায় তাহলে (প্রয়োজনে) তা ক্রয় করা জায়েয আছে। কিন্তু বিক্রেতার জন্য এর মূল্য হালাল নয়।[৩৭১]

তবে হ্যাঁ, ক্রয় ব্যতীত রক্ত পাওয়া না গেলে প্রয়োজনে ক্রয় করা বৈধ হবে।

---

364 سورة بنى إسرائيل، آية: ٧٠ .

365 الهداية مع فتح القدير، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ٦: ٦٢ .

366 فتح القدير، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ٦: ٦٢ .

367 العناية على هامش فتح القدير، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ٦: ٦٢ .

৩৬৮ সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত-৭০

৩৬৯ আল হিদায়া [ফাতহুল কাদীর সংলগ্ন], খ. ৬, পৃ. ৬২

৩৭০ ফাতহুল কাদীর, খ. ৬, পৃ. ৬২

৩৭১ ইনায়াহ [ফাতহুল কাদীর সংলগ্ন], খ. ৬, পৃ. ৬২

أخذ الدم
রক্ত নেয়া
Blood Receive

প্রয়োজনে রক্ত গ্রহণ জায়েয আছে। যদিও দেহ থেকে পৃথক হওয়ার পর রক্ত নাপাক হয়ে যায়, তথাপি চিকিৎসার খাতিরে তার অনুমতি রয়েছে। এমতাবস্থায় ক্রয় করা ব্যতীত রক্ত পাওয়া না গেলে ক্রয় করারও অনুমতি রয়েছে। কিন্তু রক্তদাতার জন্য এর বিনিময় গ্রহণ করা নাজায়েয ও হারাম।

মুসলিমদের জন্য অমুসলিমদের রক্ত গ্রহণ

প্রয়োজন দেখা দিলে অমুসলিমদের রক্ত গ্রহণও জায়েয আছে। তবে কাফের, মুশরিক ও ফাসেক-ফাজেরের রক্তে তার কদর্যতা ও অশুভ চরিত্রের যে কুপ্রতিক্রিয়া রয়েছে, তা গ্রহীতার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করার প্রবল আশংকা রয়েছে। এজন্যই বুযুর্গানে দ্বীন ফাসেক মহিলার দুধ পান করাকে পছন্দ করেন না। অতএব, কাফের ফাসেকদের রক্ত গ্রহণ থেকে সাধ্যানুযায়ী বিরত থাকা শ্রেয়।

স্বামী-স্ত্রী একে অপরের রক্ত গ্রহণ

স্বামীর দেহে স্ত্রীর রক্ত তেমনি ভাবে স্ত্রীর দেহে স্বামীর রক্ত প্রবেশ করলে এদের বিবাহে কোন প্রকারের প্রভাব পড়বে না। এদের বিয়ে পূর্বের ন্যায় বহাল থাকবে। কেননা ইসলাম বিয়ে হারাম হওয়ার জন্য দৈহিক মেলা-মেশা, যৌন উত্তেজনার সাথে কোন পুরুষ অপর মহিলার বা কোন মহিলা অপর পুরুষের দেহ স্পর্শ করা, কোন মহিলা কোন পুরুষের যৌনাঙ্গ দেখা, কোন পুরুষ কোন মহিলার যৌনাঙ্গের ভিতরাংশ দেখা, বংশ এবং বৈবাহিক সূত্রের আত্মীয়তার বন্ধন ও দুধ পান করাকেই কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে। দুধ পানের দ্বারা বিবাহ হারাম হওয়ার জন্যও পানকারীর বয়স দুই বছর ও তার চেয়ে কম হওয়া শর্ত। এর বেশি বয়সে

পান করলে তার দ্বারা বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হবে না। একজনের রক্ত অপর জনের শরীরে প্রবেশ করানো এ সমস্ত কারণের অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব, রক্ত দেয়া-নেয়ার দ্বারাও একে অপরের জন্য হারাম হবে না।

بنك الدم
ব্লাড ব্যাংক
Blood Bank

ব্লাড ব্যাংক বৈধ। কেউ হয়ত বলতে পারে যে, রক্তদান শিরোনামে রক্ত দেয়া-নেয়া জায়েয হওয়ার জন্য যে শর্তাবলী উল্লেখ করা হয়েছে তন্মধ্য হতে এখানে দু'টি শর্ত অনুপস্থিত।

একটি হল: রক্তের প্রয়োজন দেখা দেয়া। অর্থাৎ রক্ত পুশ (Push) না করলে রুগী মারা যাওয়ার আশংকা থাকা।

অপরটি হল: জরুরতের পর্যায় না হলেও কমপক্ষে হাজতের পর্যায় হওয়া।

রক্তের প্রয়োজনতো তখন দেখা দিবে যখন এমন রুগী আসবে। আর ব্লাড ব্যাংকেতো আগ থেকেই রক্ত স্টক করে রাখা হয়। অর্থাৎ প্রয়োজনের পূর্বেই রক্ত জমা করে রেখে দেয়া হয়। আর রক্ত দেয়া-নেয়া তো তখন বৈধ হয় যখন এ প্রয়োজনটি বর্তমানে বিদ্যমান থাকে। অথচ এভানে প্রয়োজনটি ভবিষ্যতে সম্ভাব্য, বর্তমানে বিদ্যমান নয়। অতএব, ব্লাড ব্যাংক নাজায়েয হওয়া চাই।

উত্তর: লাশের উপর অস্ত্রোপচার অধ্যায়ে এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রয়োজন বা জরুরত দুই প্রকার:

১. প্রকৃত বর্তমান প্রয়োজন (ضرورة قائمة حقيقية)

২. বর্তমানের অন্তর্ভূক্ত বা কার্যত বর্তমান প্রয়োজন (ضرورة قائمة حكمية)

ব্লাড ব্যাংকে রক্ত জমা রাখা কার্যত বর্তমান প্রয়োজন (ضرورة قائمة حكمية) এর অন্তর্ভূক্ত। কেননা রুগী আসার পর রক্ত তালাশে বের হলে

অনেক সময় রক্ত জোগাড় করতে এ পরিমাণ সময়ও লাগতে পারে যে পরিমাণ সময়ে রুগীর জীবন রক্ষা কঠিন হয়ে পড়বে। এ পরিমাণ সময়ে জীবন হারিয়েও যেতে পারে।

অতএব, পূর্ব থেকেই রক্ত জোগাড় করে তা ব্লাড ব্যাংকে সংরক্ষণ করে রাখা কার্যত বর্তমান প্রয়োজন (ضرورة قائمة حكمية) এর অন্ত র্ভূক্ত হওয়ায় তা বৈধ ও জায়েয। এ ক্ষেত্রে প্রকৃত বর্তমান প্রয়োজন (ضرورة قائمة حقيقية) কে অনুপস্থিত বলে নাজায়েয বলা যুক্তি সংগত হবে না।[৩৭২]

خطّة هبة الدم التطوّعيّة
স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচী
Voluntarily Blood Donation Programme

ব্লাড ব্যাংক আলোচনা থেকে এ কথাও পরিস্কার হয়ে যায় যে, স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচী বৈধ ও জায়েয এবং এতে অংশ গ্রহণ করাও বৈধ ও জায়েয।

هبة الكُلْية
কিডনী দান
Kidney Donation

নিম্নে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে কিডনী দান বৈধ:

১. দাতার স্বেচ্ছায় অনুমতি প্রদান।
২. দাতার বড় ধরণের কোন ক্ষতি না হওয়া।
৩. রুগীর প্রাণ রক্ষা উদ্দেশ্য হওয়া।

---

৩৭২ বিস্তারিত দলীল-প্রমাণের জন্য অস্ত্রোপচার অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৪. কোন বিজ্ঞ ডাক্তারের এ কথা বলা যে, এমন করলে সুস্থতা ফিরে পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
৫. মৃত্যুর পর দিতে চাইলে তার ওয়ারিশদেরও অনুমতি থাকা।[৩৭৩]

هبة العين
মরনোত্তর চক্ষুদান
Eye Donation

নিম্নে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে মরনোত্তর চক্ষুদান বৈধ:

১. দাতার জীবদ্দশায় অনুমতি প্রদানর পাশাপাশি মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশদেরও অনুমতি থাকা। কেননা মৃত্যুর পর ওয়ারিশগণ তার লাশের অভিভাবক।
২. তার চক্ষু জীবিত ব্যক্তির চোখে স্থাপন করলে দৃষ্টি শক্তি ফিরে আসার প্রবল ধারণা থাকা।
৩. বিজ্ঞ ডাক্তারে এ কথা বলা যে, এমন করলে তার দৃষ্টি শক্তি ফিরে আসবে।[৩৭৪]

بنك الحليب
দুধ ব্যাংক
Milk Bank

পশ্চিমা বিশ্বে দুধের শিশুদের জন্য মহিলাদের দুধ সংরক্ষণ শুরু হয়েছে। যদিও তাদের দৃষ্টিতে কাজটি অতি প্রশংসনীয়। কিন্তু বাস্তবে তা তেমন কোন প্রয়োজনীয় কাজ নয়। কেননা বাচ্চার দুধের কোন সমস্যা দেখা দিলে তার জন্য তাৎক্ষণিক অন্য কোন মহিলার ব্যবস্থা হতে পারে।

---

৩৭৩ বিস্তারিত দলীল-প্রমাণের জন্য অস্ত্রোপচার অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৩৭৪ বিস্তারিত দলীল-প্রমাণের জন্য অস্ত্রোপচার অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

তেমনিভাবে অন্য কোন প্রাণীর দুধ বা কৌটার দুধ কিংবা বাচ্চার উপযোগী অন্য খাবারেরও ব্যবস্থা হতে পারে।

দ্বিতীয়ত: ইসলামে দুধের সম্পর্ক ও আত্মীয়তা রক্তের সর্ম্পক ও আত্মীয়তার ন্যায় ধর্তব্য হয়। শরীআতের দৃষ্টিতে বংশের হিফাযত অতীব জরুরী। আর দুধ ব্যাংক এ আত্মীয়তা ও বংশের বন্ধনের মধ্যে সংমিশ্রণ ও সন্দেহ সৃষ্টি করে। কেননা কোন্ মহিলার দুধ কোন্ বাচ্চাকে পান করানো হয়েছে, তা নির্দিষ্ট থাকে না। তেমনিভাবে কয়েক জনের দুধ এক সাথে সংমিশ্রণ করে রাখলে তো এ বন্ধনে আরো অনেক সন্দেহ ও সমস্যার সৃষ্টি হবে। তাই এমন না করা চাই।

তথাপিও যদি কেহ এখান থেকে দুধ পান করে তাহলে হুরমাতে রেদাআত তথা দুধের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যাবে।[৩৭৫]

---

৩৭৫ কারারাতু মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী, পৃ. ২, ৩।

تحديد النسل
জন্ম নিয়ন্ত্রণ
Birth Control

জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। যথা-

(ক) স্থায়ী জন্ম নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা

এমন পদ্ধতি গ্রহণ করা যা স্থায়ী ভাবে পুরুষ বা নারীর প্রজনন ক্ষমতা তথা সন্তান দেয়া ও নেয়ার শক্তি চিরতরে নষ্ট করে দেয়। সাধারণত এর জন্য নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

(১) Vasectomy (ভ্যাসেক্‌টমি) [অন্ডকোষের নিঃসরণ নালীর ছেদন] অর্থাৎ পুরুষের বন্ধ্যকরণের জন্য সহজ অস্ত্রোপচারবিশেষ। এতে শুক্রকীটবাহী নালীকা অংশত বা সম্পূর্ণ কেটে ফেলা হয়।

(২) Tuval Ligation (টিউভেল লাইগেশন) অর্থাৎ মহিলার শুক্র নালী কেটে ফেলা অথবা কাটা ব্যতীত এমন ভাবে বেঁধে দেয়া, যাতে ধাতুর প্রবেশ বন্ধ হয়ে যায়। তবে পরবর্তীতে যদি বাঁধ খুলে দিলে পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে তাহলে তা স্থায়ী পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত না হয়ে অস্থায়ী পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

(৩) Hysterectomy (হিসটারেক্‌টমি) [জরায়ুচ্ছেদ] অর্থাৎ মহিলাদের জরায়ু কেটে ফেলে দেয়া যাতে সন্তান গর্ভজাত বন্ধ হয়ে যায়।

(৪) কোন ওষুধ সেবন অথবা ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে কিংবা অন্য কোন পন্থায় প্রজনন ক্ষমতা চিরতরে বন্ধ করে দেয়া।

উপরোক্ত পদ্ধতিগুলোর হুকুম

উপরোল্লেখিত কোন পন্থাই শরীআতের দৃষ্টিতে জায়েয নেই, বরং হারাম।

عن قيس، قال: قال عبد الله: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شئ فقلنا، ألا نستخصى، فنهانا عن ذلك ... ثم قرأ علينا: ''ياايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لايحب المعتدين.'' [سورة المائدة، آية: ٨٧] .[৩৭৬]

অর্থ- হযরত কায়েস থেকে বর্ণিত, হযরত ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলেন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সাথে যুদ্ধাভিযানে যেতাম আর আমাদের কাছে জৈবিক চাহিদা পূরণের কিছু ছিলনা। (এতে আমরা যৌন পীড়নে ভুগতাম) তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে যৌন শক্তি চিরতরে নিঃশেষ করে দেয়ার অনুমতি চাইলে তিনি তা নিষেধ করলেন এবং এটি খারাপ হওয়ার ব্যাপারে উল্লিখিত আয়াতটি পাঠ করেনঃ "হে মুমিনগণ! তোমরা ঐ সব সুস্বাদু বস্তু হারাম করোনা যেগুলো আল্লাহ্ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন এবং সীমালংঘন করো না, নিশ্চয় আল্লাহ সীমালংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।" [সূরা মায়িদা, আয়াত: ৮৭][৩৭৭]

উক্ত হাদীস থেকে এ কথা বুঝে আসে যে, উল্লিখিত আয়াত দ্বারাই স্থায়ীভাবে প্রজনন বন্ধ করা হারাম প্রমাণিত হয় এবং এ কাজ সীমালংঘনের নামান্তর।

أن عثمان بن مظعون، وعليا، وأباذر، هموا أن يختصوا ويتبتلوا، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.[৩৭৮]

অর্থ- হযরত উসমান ইবনে মাযয়ূন, হযরত আলী ও হযরত আবূ যর (রাযি.) প্রমূখ সাহাবীগণ নপুংসক হয়ে যৌন শক্তি নিঃশেষ করতে

---

376 رواه البخارى فى النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء، ٢: ٧٥٩، رقم الحديث: ٥٠٧٥ .

৩৭৭ বুখারী, খ. ২, পৃ. ৭৫৯, হাদীস নং ৫০৭৫

378 ذكره ابن عبد البر فى الاستيعاب،كذا فى عمدة القارى، كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء، ٢٠: ٩٥ .

চাইলে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে এ কাজ করতে নিষেধ করলেন।[৩৭৯]

উল্লিখিত হাদীসদ্বয় দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, স্থায়ীভাবে প্রজনন ক্ষমতা নিঃশেষ করা শরী'আত কর্তৃক সম্পূর্ণ হারাম।

ইমাম বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) বলেনঃ

وهو –أى الخصاء– محرم بالاتفاق .[٣٨٠]

অর্থ- খোজা-খাসি হওয়া সর্বসম্মতিক্রমে হারাম।[৩৮১]

তবে যদি জরায়ুতে এমন রোগ দেখা দেয় যা অপারেশনের মাধ্যমে জরায়ু কেটে ফেলা ব্যতীত আরোগ্য লাভ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তাহলে এমতাবস্থায় ঐ মহিলার জন্য জরায়ু কেটে ফেলা জায়েয আছে, যদিও এতে স্থায়ীভাবে তার প্রজনন ক্ষমতা বন্ধ হয়ে যায়।

(খ) জন্ম নিয়ন্ত্রণের অস্থায়ী ব্যবস্থা

এর জন্য সাধারনত নিম্ন বর্ণিত আট (৮)টি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। যথা-

(১) সহবাস নিয়ন্ত্রণ (বিশেষ কিছু দিন সহবাস থেকে বিরত থাকা)। অর্থাৎ ঋতুর শুরু থেকে পবিত্র কালের (Purification after menses) মধ্যবর্তী সময় (যা সাধারনত চৌদ্দতম দিন হয়) এবং তার পূর্বাপর কয়েক দিন সহবাস থেকে বিরত থাকা। আর তা হল, ঋতুর শুরু থেকে ৯ম দিন হতে ১৯তম দিন পর্যন্ত। কারণ এ সময় সাধারনত বাচ্চা জন্ম নিয়ে থাকে [গর্ভ সঞ্চার হয়]। এর মধ্যে ১৩, ১৪ ও ১৫তম দিনগুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ (এ সময়ে বাচ্চা জন্ম গ্রহণের সম্ভাবনা বেশি থাকে)। যেমন, কোন মহিলার ঋতু শুরু হয় মাসের ১ম তারিখে, তার জন্য মাসের ৯ তারিখ হতে ১৯ তারিখ পর্যন্ত সহবাস থেকে বিরত থাকা। উল্লিখিত

---

৩৭৯ উমদাতুল ক্বারী, খ. ২০, পৃ. ৯৫

380 عمدة القارى، ٢٠: ٩٥، تحت الحديث: ٥٠٧٣ .

৩৮১ উমদাতুল ক্বারী, খ. ২০, পৃ. ৯৫, হাদীস নং ৫০৭৩ এর ব্যাখ্যা

দিনগুলোর পরে মহিলাদের ডিম্বাণুর বাচ্চা জন্মদানের যোগ্যতা নিঃশেষ হয়ে যায়। কারণ এ সময় তাদের ডিম্বাণু দুর্বল হয়ে পড়ে। এ পন্থা অবলম্বন নিঃসন্দেহে জায়েয। কেননা প্রত্যেক স্বামীর এ অধিকার রয়েছে যে, সে যখন ইচ্ছা স্ত্রী সহবাস করবে আর যখন ইচ্ছা বিরত থাকবে। অতএব, সে যদি কিছু দিনের জন্য তার অধিকার অর্থাৎ স্ত্রী মিলন থেকে বিরত থাকে এতে স্ত্রীর অধিকার লংঘন না হলে তার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে।

(২) আযল করা (যৌন মিলনে বীর্য প্রত্যাহার করা)

আযল সম্পর্কে হাদীসের কিতাব সমূহে বিভিন্ন ধরণের বর্ণনা পাওয়া যায়। আযল সম্পর্কীয় এ হাদীসগুলোকে সামনে রাখলে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে বিনা কারণে আযল করা নাজায়েয না হলেও তা মাকরূহ ও গর্হিত কাজ।

عن أبى سعيد الخدرى، قال: أصبنا سبيا فكنا نعزل، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أو إنكم لتفعلون؟ – قالها ثلاثا – ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هى كائنة.[৩৮২]

অর্থ- হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) বলেন, আমরা আমাদের দাসীদের থেকে আযল করার মনস্থ করে এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করি। উত্তরে তিনি এ কথা বলেনঃ তোমরা এমন করে থাক? (এ কথাটি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তিনবার বললেন) জেনে রেখ, কেয়ামত পর্যন্ত যে কোন প্রাণীর অবধারিত আগমন অবশ্যম্ভাবী।[৩৮৩]

---

382 رواه البخارى فى النكاح، باب العزل، ٢: ٧٨٤، رقم الحديث: ٥٢١٠، واللفظ له، ومسلم فى النكاح، باب حكم العزل، ١: ٤٦٤، رقم الحديث: ٣٥٣١ .

৩৮৩ বুখারী, খ. ২, পৃ. ৭৮৪, হাদীস নং ৫২১০, মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৪৬৪, হাদীস নং ৩৫৩১

عن عائشة، عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة، قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أناس، ... ثم سألوه عن العزل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفى –زاد عبيد الله فى حديثه عن المقرى– ''وإذا الموءودة سئلت''. [৩৮৪]

অর্থ- হযরত আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, উকাশার বোন হযরত জুদামাহ বিনতে ওহাব বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম, সেখানে আরো লোকজন ছিল ... তারা আযল সম্পর্কে জানতে চাইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন, এটাতো ''الوأد الخفى'' তথা শিশুদের জীবন্ত দাফনের নামান্তর ... (এবং ইহা আয়াতে কারীমা ''وإذا الموءودة سئلت'' এর অন্তর্ভুক্ত)।[৩৮৫]

عن أبى سعيد الخدرى، قال: سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن العزل، فقال: لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم، فإنما هو القدر، قال محمد: وقوله :''لا عليكم'' أقرب إلى النهى. [٣٨٦]

অর্থ- হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে আযল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বললেন, এমন করার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা তাকদীরে যা আছে তা তো হবেই। মুহাম্মদ বলেন, রাসূলের বাণী 'لا عليكم' নিষেধাজ্ঞার অধিক নিকটবর্তী।[৩৮৭]

---

384 رواه مسلم فى النكاح، باب جوازالغيلة وهى وطئ الغيلة، وكراهة العزل، ١: ٤٦٦، رقم الحديث: ٣٥٥٠ .

৩৮৫ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৪৬৬, হাদীস নং ৩৫৫০

386 رواه مسلم فى النكاح، باب حكم العزل، ١: ٤٦٥، رقم الحديث: ٣٥٣٤ .

৩৮৭ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৪৬৫, হাদীস নং ৩৫৩৪

উল্লিখিত বর্ণনাগুলোর দ্বারা আযল করা হারাম অথবা কমপক্ষে মাকরূহে তানযিহী মনে হয়। কিন্তু কিছু হাদীস থেকে এর অনুমতির কথাও বুঝা যায়, তাই উভয় ধরণের হাদীস গুলোকে সামনে রাখলে একথা প্রমাণিত হয় যে, বিনা প্রয়োজনে আযল করা মাকরূহে তানযিহী। ইমাম নববী (রহ.) বলেন,

ثم هذه الأحاديث مع غيرها يجمع بينهما بأن ما ورد فى النهى محمول على كراهة التنــــزيه، وما ورد فى الإذن فى ذلك محمول على أنه ليس بحرام، وليس معناه نفى الكراهة .[৩৮৮]

অর্থ- উভয় ধরণের হাদীসগুলোর মধ্যে এভাবে সমন্বয় সাধন করা যায় যে, নিষেধাজ্ঞার হাদীসগুলোর অর্থ মাকরূহে তানযিহী আর অনুমতির হাদীসগুলোর অর্থ হারাম নয়। তবে এর অর্থ মাকরূহকে অস্বীকার করা নয়।[৩৮৯]

(৩) কনডম (Condom) ব্যবহার।

(৪) Jelly, Cream, Foam ব্যবহার (এগুলো Spermicidal বা শুক্রাণুকে অক্ষম করে দেয়ার কাজ করে)।

(৫) ঢুস্ (Douche) ব্যবহার অর্থাৎ পানির পিচকারী দিয়ে জরায়ু ধুয়ে ফেলা।

(৬) জরায়ুর মুখ বন্ধ করে দেয়া।

উপরোল্লেখিত ৩, ৪, ৫ ও ৬ এ চারটি পদ্ধতি অবলম্বন করার হুকুম 'আযলের' ন্যায়। কেননা এগুলো আযলের সাথে সাদৃশ্য রাখে। সুতরাং বিনা প্রয়োজনে এ পদ্ধতি গুলো গ্রহণ করা মাকরূহ তানযিহী।

(৭) পিল (Pill) খাওয়া।

(৮) ইঞ্জেকশন নেয়া।

---

388 المنهاج شرح الصحيح لمسلم بن الحجاج للنووي ، ١: ٤٦٤ .

৩৮৯ আল মিনহাজ শরহে সহীহ মুসলিম, ইমাম নববী রহ., খ. ১, পৃ. ৪৬৪

উল্লিখিত ৭ ও ৮ এ দু'টি পদ্ধতি অনেক সময় স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয়, যাকে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া (side effect) বলা হয়। আর যে সমস্ত কাজ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, তার ব্যবহার শরীআতের দৃষ্টিতে মাকরূহে তানযীহী। যেমন, মাটি খাওয়া মাকরূহ। কেননা মাটি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।[৩৯০]

অতএব, উক্ত পদ্ধতিদ্বয় আযলের সাদৃশ্য হওয়ার সাথে সাথে দেহের জন্য ক্ষতিকারক হওয়ার কারণে মাকরূহ এর মাঝে আরো কঠোরতা আরোপিত হবে।

যে সব অবস্থায় অস্থায়ী পদ্ধতি বৈধ

নিম্নবর্ণিত উযর সমূহের কারণে অস্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করা জায়েয।

১. মহিলা এত দূর্বল যে,বাচ্চা ধারণের ক্ষমতা নেই।

২. গর্ভধারণের কারণে দুধ শুকিয়ে গেলে পূর্বের বাচ্চার স্বাস্থ্য হানির আশংকা দেখা দেয়া ও দুধের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণে অক্ষম হওয়া।

৩. ফেতনা-ফাসাদের যমানার কারণে বাচ্চা অসৎ চরিত্র হওয়ার আশংকা থাকা।

৪. মহিলার নিজের বাসস্থান থেকে দূরবর্তী এমন কোন এলাকায় থাকা, যেখানে স্থায়ীভাবে অবস্থান করার ইচ্ছা নেই এবং সেখান থেকে গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে কয়েক মাসের প্রয়োজন।

৫. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অমিল হওয়ার কারণে পৃথক হওয়ার ইচ্ছা থাকা।

৬. মুসলমান বিজ্ঞ ডাক্তারদের মতানুযায়ী বাচ্চা নিলে মায়ের জীবননাশের আশংকা থাকা।

৭. মা বংশগত কোন মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হওয়া, যা বাচ্চার মধ্যে সংক্রমিত হওয়ার সমূহ আশংকা থাকে।

---

৩৯০ আলমগীরী, খ. ৫, পৃ. ৩৪০

যে সব কারণে জন্ম নিয়ন্ত্রণ বৈধ নয়

নিম্নবর্ণিত কারণগুলো জন্ম নিয়ন্ত্রণ বৈধ হওয়ার উযর হিসেবে ধর্তব্য ও গ্রহণযোগ্য নয়।

১. পুরুষ ও মহিলা নিজেদের সৌন্দর্যকে দীর্ঘায়িত করার লক্ষ্যে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা।

২. কন্যা সন্তান জন্ম নেয়ার ভয়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা। যাতে পরবর্তীতে এদের বিয়ে-শাদির ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

৩. গর্ভধারণ কষ্ট, প্রসব বেদনা, নিফাস (সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পরবর্তী স্রাব), দুধ পান করানো এবং এর সেবা-যত্ন ইত্যাদির কষ্ট থেকে বেঁচে থাকার জন্য।

৪. গর্ভধারণ থেকে নিয়ে বাচ্চা বড় হওয়া পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে এর সেবা-যত্নের পেছনে কল্পনাতীত শ্রম দেয়ার কারণে সৃষ্ট সম্ভাব্য খিট খিটে মেজাজ থেকে বাঁচার জন্য।

৫. অধিক সন্তান নেয়াকে লজ্জার বিষয় মনে করা।

৬. অধিক সন্তান হলে আর্থিক অভাব-অনটন দেখা দিবে, এ ভয়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা।

উল্লিখিত কারণসমূহ সামনে রেখে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ সম্পূর্ণভাবে নাজায়েয। বিশেষ করে ষষ্ঠ কারণটি ইসলামী আকীদা ও বিশ্বাসের সাথে প্রকাশ্য সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে এর ভয়াবহতা অনেক বেশী। আফসোস! এই কারণকে সামনে রেখেই অধিকাংশ মানুষ জন্ম নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

অথচ আর্থিক দুর্বলতা ও সচ্ছলতা এবং রিযিকের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ আল্লাহ তা'আলার হাতে নিয়ন্ত্রিত। আল্লাহ পাক বলেনঃ

وما من دآبة فى الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل فى كتاب مبين.[391]

---

391 سورة هود، آية: ٦ .

অর্থ- আর পৃথিবীতে কোন বিচরণশীল নেই, তবে সবার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ নিয়েছেন। তিনি তাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত। সুস্পষ্ট কিতাবে সব কিছুই আছে।[৩৯২]

ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم.[393]

অর্থ- স্বীয় সন্তানদেরকে দারিদ্রের কারণে হত্যা করো না, আমি তোমাদেরকে ও তাদেরকে রিয্ক দেই।[৩৯৪]

ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا.[٣٩٥]

অর্থ- দারিদ্রের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না, তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই রিয্ক দিয়ে থাকি। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।[৩৯৬]

যখন উল্লিখিত আয়াতগুলো দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হলো যে, সমষ্টিগত ভাবে প্রত্যেক বিচরণশীলের জীবিকার ব্যবস্থা আল্লাহ তা‘আলা নিজ দায়িত্বে রেখেছেন, তখন মানুষের জন্য তার এ দায়িত্বে হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার নেই। কেননা এ দায়িত্ব পালন ক্ষমতা আল্লাহ তা‘আলা ব্যতীত আর কারোর নেই।

একটি ভুল ধারণা ও তার নিরসন

কেউ কেউ ‘‘لا تقتلوا أولادكم الخ’’ আয়াতকে সামনে রেখে সন্তান হত্যা ও জন্ম নিয়ন্ত্রণের মাঝে পার্থক্য করতে চায়। তাদের দাবি হলো, উক্ত আয়াতে সন্তান হত্যাকে নিষেধ করা হয়েছে, জন্ম নিয়ন্ত্রণকে

---

৩৯২ সূরা হূদ, আয়াত: ৬

393 سورة الأنعام، آية: ١٥١ .

৩৯৪ সূরা আনআম, আয়াত: ১৫১

395 سورة بني اسرائيل، آية: ٣١ .

৩৯৬ সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ৩১

নয়। একটি ছোট কীট বিনষ্ট কারীর উপর গোটা বৃক্ষের জরিমানা চাপিয়ে দেয়া যায় না।

তাদের এ দাবি ও যুক্তি সম্পূর্ণ ভুল। কেননা কুরআনের আয়াত শুধু ''لا تقتلوا أولادكم'' পর্যন্ত বলে ক্ষান্ত হয়নি বরং সামনে 'خشية إملاق' ও 'نحن نرزقكم وإياهم' বলে একটি মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, সন্তান সীমিত রাখার ব্যাপারে ঐ সকল কাজকে অবৈধ ও নাজায়েয বলে ঘোষণা করা হয়েছে যা দরিদ্রতার ভয়ে করা হয়। এর বিশ্লেষণ এই যে, সন্তান হত্যা তো সর্বাবস্থায় নাজায়েয। চাই তা দরিদ্র্যতার ভয়ে হোক কিংবা অন্য কোন কারণে।

''خشية إملاق'' ও ''نحن نرزقكم وإياهم'' যোগ করার অর্থ কস্মিনকালেও এ হতে পারেনা যে, দারিদ্রের ভয়ে সন্তান হত্যা নাজায়েয আর অন্য উদ্দেশ্য হলে জায়েয।

সুতরাং উক্ত বাক্য দু'টি সংযোজনের মাধ্যমে সূক্ষ্মভাবে এ ভুল ধারণার মূলোৎপাটন করা হয়েছে যে, রিযিকের ব্যবস্থা মানুষের নিজ দায়িত্বে ন্যস্ত। বরং এ দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলার, তাই তিনি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিলেন এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভুল যে, অধিক সন্তান দরিদ্রতার কারণ হয়। অতএব, দরিদ্রতার ভয়ে সন্তান সীমিত রাখা সর্বাবস্থায় নাজায়েয। চাই তা সন্তান হত্যার মাধ্যমে হোক অথবা শুক্রকীট বিনষ্টের মাধ্যমে হোক।

জন্ম নিয়ন্ত্রণ বৈধ মনে করার দলীল ও তার উত্তর

কিছু সংখ্যক মানুষ জন্ম নিয়ন্ত্রণকে কোন প্রকার শর্ত ব্যতীত নিরংকুশভাবে বৈধ মনে করে, তারা তাদের এ দাবির স্বপক্ষে ঐ সমস্ত হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করে থাকে যেগুলো দ্বারা আযল জায়েয হওয়া বুঝে আসে। যেমনঃ

١- عن جابر-رضي الله تعالى عنه-، قال: كنا نعزل، والقرآن ينـــزل، زاد إسحاق، قال سفيان: لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، وعنه يقول:

لقد كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك نبى الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه.[৩৯৭]

১. অর্থ- হযরত জাবির (রাযি.) বলেন, কুরআন অবতরণযুগে আমরা আযল করতাম। হযরত সুফিয়ান (রহ.) বলেন, যদি আযল করা নিষেধাজ্ঞার বিষয় হতো, তাহলে কুরআন আমাদেরকে তা নিষেধ করতো। হযরত জাবির আরো বলেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর যামানায় আযল করতাম। এ সংবাদ তার নিকট পৌঁছা সত্ত্বেও তিনি আমাদেরকে তা থেকে নিষেধ করেননি।[৩৯৮]

উত্তরঃ যারা দলীল হিসেবে এ হাদীসগুলো পেশ করেন, তারা এ কথা চিন্তা করেন না যে, এ হাদীসগুলো আযল সম্পর্কীয়, জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কীয় নয়। না জেনে শুনে যদি এমন করে থাকেন তবে তো তারা মা'যূর। আর যদি জেনে শুনেই এমন করে থাকেন তাহলে তা ধোকার নামান্তর।

দ্বিতীয়তঃ তারা নিষেধাজ্ঞার হাদীসগুলোকে উপেক্ষা করে যান। অথচ শরীআতের কোন হুকুম জানার জন্য সব ধরণের হাদীসকে সামনে রেখে বিবেচনা করতে হয়। শুধু এক-দুটি হাদীস দেখেই কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া নিতান্ত বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের গভীরতা সম্পর্কে অনুমান করা নিছক নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। সমুদ্রের গভীরতা ও প্রশস্ততা তাদের থেকে জানতে হবে, যারা জীবন বাজি রেখে পাহাড় সম উত্তাল তরঙ্গমালার সাথে মোকাবেলা করে কাঙ্খিত মুক্তা আহরণ করে থাকে।

যে আলেমগণ কুরআন ও হাদীস চর্চায় নিজের পূর্ণ জীবন ও শ্রম ব্যয় করেছেন, তারা উভয় ধরণের হাদীসগুলোকে সামনে রেখে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তাদের সিদ্ধান্তই গ্রহণযোগ্য হবে। পক্ষান্তরে

---

397 رواه مسلم فى النكاح، باب العزل، ١: ٤٦٥، رقم الحديث: ٣٥٤٦ .

৩৯৮ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৪৬৫, হাদীস নং ৩৫৪৬

যারা এক-দু'হাদীসের মামুলী অধ্যয়নের পর আযলের বৈধতার স্বীকৃতি দেয় তাদের কথা কখনো গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

এক্ষেত্রে বিজ্ঞ আলেমগণ হাদীসের ভান্ডার চর্চা করার পর আলোচিত মাসআলায় যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা হলো, বিনা প্রয়োজনে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ মাকরূহ ও নাজায়েয। যে সমস্ত হাদীস দ্বারা জায়েয হওয়া বুঝে আসে তা কোন না কোন উযর ও সমস্যার কারণে ছিল। তাইতো আযল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি প্রশ্নকারীর নিকট তার উদ্দেশ্য জানতে চাইলেন । অতঃপর তার উদ্দেশ্য সামনে আসলে, তিনি বাস্তব কথাটি বলে দিলেন যে, তাক্বদীরে যা আছে তা ঘটবেই। অতএব তোমরা আযল করো না। কেননা বাচ্চা হওয়ার থাকলে আযল করলেও তা হবেই।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত উক্ত হাদীসটি শুনার পর হযরত হাসান বসরী (রহ.) বললেনঃ ''والله لكان هذا زجر'' অর্থ- আল্লাহর শপথ, ইহা তো ধমক ছাড়া আর কিছুই নয়।[৩৯৯]

আযল সম্পর্কীয় হাদীস ব্যতীত তারা নিজেদের স্বপক্ষে নিম্নবর্ণিত হাদীসটিও পেশ করে থাকেন। যথা-

٢– عن أبي هريرة–رضي الله تعالى عنه–، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء.[٤٠٠]

২. অর্থ- হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার নিকট 'جهد البلاء' তথা কম সম্পদ ও অধিক সন্তানাদি থেকে মুক্তি কামনা করতেন।[৪০১]

---

৩৯৯ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৪৬৫

400 رواه البخارى فى الدعاء، باب التعوذ من جهد البلاء، ٢: ٩٣٩، رقم الحديث: ٦٣٤٧

৪০১ বুখারী, খ. ২, পৃ. ৯৩৯, হাদীস নং ৬৩৪৭

উত্তরঃ

হযরত আহমাদ আলী সাহারানপুরী (রহ.) বুখারী শরীফের টিকায় উল্লেখ করেন,

’جهد البلاء‘ – بفتح الجيم – الحالة التى يختار عليها الموت، وقيل (القائل هو ابن عمر): هو قلة المال وكثرة العيال، والجهد بالفتح الطاقة، وبالضم المشقة.[402]

অর্থ-‘جهد البلاء’ ঐ অবস্থাকে বলা হয়, যে অবস্থায় মৃত্যুকে প্রাধান্য দেয়া যায়। আবার কেউ (আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি.) বলেন, এর অর্থ হলোঃ সম্পদ কম হওয়া ও সন্তানাদি বেশী হওয়া। ‘جَهد’ এর ‘জীমের’ উপর ‘যবর’ হলে তার অর্থ হয়- শক্তি, আর ‘পেশ’ হলে তার অর্থ হয়- কষ্ট।[৪০৩]

এখানে ইবনে উমর (রাযি.) এর মতটি নিয়ে উক্ত হাদীস দ্বারা জন্ম নিয়ন্ত্রণ বৈধ হওয়ার দলীল পেশ করা হয়েছে। বাস্তবে এ দলীলটি পেশ করা যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ, ‘جهد البلاء’ শব্দটির আরো একাধিক অর্থ রয়েছে। দৃঢ়তার সাথে একথা বলা যায় না যে, এখানে ‘جهد البلاء’ এর অর্থ ‘স্বল্প সম্পদ ও অধিক সন্তান’। মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ আল মিনহাজ[৪০৪] এ উল্লেখ আছে যে, ‘جهد البلاء’ শব্দের অর্থ সম্পদ কম হওয়া ও সন্তান বেশি হওয়ার মতটি শুধুমাত্র হযরত ইবনে উমর রাযি.ই পেশ করেন। আর বাকী সকলের মত হলো ‘جهد البلاء’ ‘কঠিন অবস্থা’কে বলা হয়।”

দ্বিতীয়তঃ হযরত ইবনে উমর (রাযি.) এর মতটি গ্রহণ করা হলেও এর দ্বারা জন্ম নিয়ন্ত্রণের বৈধতা প্রমাণিত হয় না। যেমন, দুর্ঘটনায় আহত

---

402 حاشية الشيخ أحمد علي السهارنفوري على صحيح البخاري ، ٢: ٩٣٩ .

৪০৩ হাশিয়াতুশ শাইখ আহমাদ আলী আস সাহারনফূরী আলা সহীহিল বুখারী, খ. ২, পৃ. ৯৩৯

৪০৪ খ. ২, পৃ. ২৪৭

ও নিহত হওয়া নিঃসন্দেহে একটি বিপদ, তার থেকে মুক্তি লাভের আশা করা চাই। কিন্তু এর ভয়ে বাইরে চলাচল বন্ধ করে দেয়া নিরেট বোকামি ছাড়া কিছুই নয়। স্বল্প সম্পদ ও অধিক সন্তানাদি একটি বড় পরীক্ষা। এ পরীক্ষা থেকে মুক্তি লাভের আশা করা চাই কিন্তু এ ভয়ে বিবাহ না করা অথবা জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করা নিরেট বোকামি ও নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

অনেক সময় অধিক সন্তান দরিদ্রতার কারণ হয় না বরং আর্থিক সচ্ছলতার পুঁজি হয়ে দাঁড়ায়। তাইতো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর দশ বছর সংশ্রবধন্য খাদেম হযরত আনাস (রাযি.) এর মা আপন ছেলের জন্য রাসূলের নিকট দু'আ চাইলে তিনি আর্থিক সচ্ছলতার পাশাপাশি অধিক সন্তান দানের দু'আ করেন।

عن أنس–رضي الله تعالى عنه–، قال: قالت أمي: يارسول الله! خادمك أدع الله له، قال: اللهم أكثر ماله وولده و بارك له فيما أعطيته.[٤٠٥]

অর্থ- হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, আমার মা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে আরজ করলেন যে, আনাস আপনার খাদেম। আপনি তার জন্য আল্লাহ পাকের নিকট দু'আ করুন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! তার মাল ও সন্তানাদি বাড়িয়ে দিন এবং তাকে যা কিছু দান করেন তার মধ্যে বরকত দিন।[৪০৬]

قال الشيخ أحمد على السهارنفورى فى تعليقه على صحيح البخارى عن القسطلانى: فكثرماله، وكان له بالبصرة بستان يثمر فى السنة مرتين، فكان فيه الريحان ريحه ريح المسك، وكان له مأة وعشرون ولدا وقيل: إنه كان يطوف

---

405 رواه البخاري فى الدعوات، باب دعوة النبى لخادمه بطول العمر وكثـــرة المـــال، ٢: ٩٣٨–٩٣٩، رقم الحديث: ٦٣٤٤ .

৪০৬ বুখারী, খ. ২, পৃ. ৯৩৮-৯৩৯, হাদীস নং ৬৩৪৪

بالكعبة ومعه من ذريته أكثر من سبعين نفسا وطال عمره، فقيل عاش تسعة و تسعين سنة، وقيل: مأة وثلاثون سنة، وقيل مأة وعشرون، وقيل مأة وسبع.[٤٠٧]

অর্থ- শায়খ আহমাদ আলী সাহারনপূরী (রহ.) উক্ত হাদীসের টীকায় আল্লামা কাছতলানী থেকে উল্লেখ করেন যে, উক্ত দু'আর বরকতে তার সম্পদ এমন বৃদ্ধি পায় যে, বসরায় তার একটি বাগান ছিল তাতে বছরে দু'বার ফল দিত। ঐ বাগানে ফুল ছিল, যার ঘ্রাণ ছিল মেশকের ন্যায়। তাঁর সন্তান ছিল ১২০ জন। কথিত আছে, তিনি কা'বা শরীফ তওয়াফ কালে তাঁর সাথে তাঁর ৭০ জনেরও অধিক সন্তান তওয়াফ করত। তিনি দীর্ঘ হায়াত পেয়েছিলেন। কোন কোন বর্ণনায়, তিনি ৯৯ বছর জীবিত ছিলেন। কোন বর্ণনা মতে, ১৩০ বছর আবার কোন বর্ণনা মতে, ১২০ বছর, অন্য বর্ণনা মতে, ১০৭ বছর হায়াত পেয়েছিলেন।[৪০৮]

যদি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর দৃষ্টিতে جهد البلاء এর অর্থ অধিক সন্তান হত আর এর থেকে নিজে পানাহ কামনা করতেন, তাহলে হযরত আনাসের জন্য অধিক সন্তানের দু'আ করলেন কিভাবে? তাই جهد البلاء এর অর্থ "অধিক সন্তান" না করাই শ্রেয়। অতএব, এ হাদীস দ্বারা জন্ম নিয়ন্ত্রণের সপক্ষে দলীল দেয়া অযৌক্তিক।

জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আলোচনার সার সংক্ষেপ

(১) স্থায়ী ভাবে প্রজনন বন্ধকরণ হারাম। তবে যদি জরায়ুতে এমন রোগ দেখা দেয় যার থেকে অপারেশন ব্যতীত পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে জরায়ু কেটে ফেলা জায়েয আছে।

(২) অস্থায়ী জন্ম বিরতি মাকরূহ। তবে উযর বশত জায়েয।

(৩) দরিদ্রতা ও লজ্জার ভয়ে অস্থায়ী ও সাময়িক জন্ম বিরতি মাকরূহে তাহরীমী।[৪০৯]

407حاشية الشيخ أحمد علي السهارنفوري على صحيح البخاري ، ٢: ٩٣٨ .

৪০৮ হাশিয়াতুশ শায়খ আহমাদ আলী সাহারনফূরী আলা সহীহিল বুখারী, খ. ২, পৃ. ৭৩৮

৪০৯ দেখুন, ক্বারারাতু মাজমায়িল ফিকহিল ইসলামী, জেদ্দা, পৃ. ১৮-১৯

إسقاط الحمل
গর্ভপাত করা
Abortion

গর্ভস্থ ভ্রূণের বয়সের ভিন্নতা হিসেবে গর্ভপাতের হুকুমও ভিন্ন হবে। বয়সের ভিন্নতা হিসেবে ভ্রূণকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

(১) ভ্রূণের বয়স ৬ (ছয়) মাসের ঊর্ধ্বে হওয়া। এসূরতে কোন অবস্থাতেই গর্ভপাত করা ও বাচ্চাকে মেরে ফেলা জায়েয নেই, বরং হারাম। কারণ বাচ্চার বয়স ছয় মাস হয়ে গেলে তাকে সিজারের মাধ্যমে বের করে আনলে সে জীবিত থাকে। অতএব এ ক্ষেত্রে তাকে মেরে ফেলার কোন যুক্তিকতা নেই।

আল্লাহ পাক বলেনঃ

ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق.[٤١٠]

অর্থ- আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করোনা।[৪১১]

এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য এ কিতাবেরই ‘সিজারের হুকুম’ শিরোনাম **১১৩** নং পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(২) ভ্রূণের বয়স ছয় মাসের কম ও ৪ (চার) মাসের উর্ধ্বে হওয়া। এ সূরতে গর্ভপাত জায়েয নেই, হারাম।

فالتسبب فى إسقاطه بعد نفخ الروح فيه محرم إجماعاً، وهو من قتل النفس.[٤١٢]

---

410 سورة بنى اسرائيل، آية: ٣٢ .

৪১১ সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ৩২

412 فتح العلى المالك، ١: ٣٩٩ .

অর্থ- ভ্রূণে রূহ আসার পর গর্ভপাত সর্ব সম্মতিক্রমে হারাম। এ অবস্থায় গর্ভপাত হত্যাতুল্য।[৪১৩]

তবে যদি অবস্থা এমন হয় যে, বাচ্চাকে বাঁচানোর যথাযথ চেষ্টা করার পর একাধিক অভিজ্ঞ ডাক্তার এ কথা বলেন যে, বাচ্চাকে পেটে রাখাটা মায়ের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তাহলে মাকে বাঁচানোর লক্ষ্যে বাচ্চাকে মেরে ফেলার অবকাশ রয়েছে। কেননা ছয় মাসের কম বয়সের বাচ্চা সিজারের মাধ্যমে বের করলেও জীবিত থাকে না। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে বাচ্চার জীবন অনিশ্চিত আর মায়ের জীবন নিশ্চিত। তাই নিশ্চিত জীবন রক্ষার্থে অনিশ্চিত জীবনকে হত্যা করা যুক্তিসঙ্গত।[৪১৪]

(৩) ভ্রূণের বয়স ১২০ দিনের কম হওয়া কিন্তু তার অঙ্গ প্রতঙ্গ হাত, পা, আঙ্গুল ও চুল ইত্যাদি সৃষ্টি হয়ে যাওয়া যা ৪২ দিন মতান্তরে ৫২ দিনের মধ্যে শুরু হয়ে যায়। এমতাবস্থায় গর্ভপাত মাকরূহ তাহরীমী।

عن عبدالله بن بريدة عن أبيه ... قال: فجاءت الغامدية فقالت: يارسول الله! إنى قد زنيت فطهرنى، وإنه ردها، فلما كان الغد، قالت: يا رسول الله !لم تردنى؟ لعلك أن تردنى كما ردت ماعزا، فوالله إنى لحبلى، قال: إما لا، فاذهبى حتى تلدى، قال فلما ولدت أتته بالصبى فى خرقة، قالت: هذا قد ولدته، قال: اذهبى، فارضعيه، حتى تفطميه، فلما فطمته أتته بالصبى فى يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبى الله! قد فطمته، وقد أكل الطعام، فدفع الصبى إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها، فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها إلخ.[٤١٥]

---

৪১৩ ফাতহুল আলিয়্যিল মালিক, খ. ১, পৃ. ৩৯৯

৪১৪ দেখুন, আল ফাতাওয়াল মুতাআল্লিকা বিত তিব্বি ওয়া আহকামিল মারযা, খ. ১, পৃ. ২৮১। আরও বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, এ কিতাবেরই 'সিজারের হুকুম' পরিচ্ছেদ।

415 رواه مسلم فى الحدود، باب من اعترف فى نفسه بالزنـــا، ٢: ٦٨، رقـــم الحـــديث: ٤٢٩٥ .

অর্থ- হযরত বুরাইদা বলেনঃ গামেদিয়্যা গোত্রের একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! 'আমি যিনা করেছি' অতএব, আমাকে পবিত্র করুন। তিনি তাকে ফিরিয়ে দিলেন। মহিলাটি পরদিন এসে বলল, আমাকে কেন ফিরিয়ে দিলেন? মনে হয় 'মায়েযে'র ন্যায় আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন। আল্লাহর শপথ, আমি অন্তঃসত্ত্বা। এ শুনে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি যখন অপরাধ লুকাচ্ছ না ও নিজের কথা থেকে ফিরছ না, এখন যাও, বাচ্চা প্রসব করার পর এস। বাচ্চা জন্মের পর মহিলাটি নবজাতককে একটি কাপড়ে পেঁচিয়ে নিয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলল, এই দেখুন! আমি বাচ্চা প্রসব করেছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন, এখন যাও, বাচ্চার দুধ পান শেষ হলে এসো। বাচ্চার দুধ পান শেষ হলে মহিলাটি বাচ্চার হাতে রুটির টুকরা দিয়ে তাকে নিয়ে পুনরায় উপস্থিত হয়ে বললঃ দেখুন, হে আল্লাহর নবী! আমি তার দুধ ছাড়িয়েছি। এখন সে খাবার খেতে পারে। অতঃপর তিনি ছেলেটিকে একজন মুসলমানের হাতে অর্পণ করেন ও তার জন্য একটি গর্ত খনন করতে বললেন। লোকেরা তার বুক পর্যন্ত গর্ত খনন করল। অতঃপর লোক সকলকে 'রজম' তথা পাথর মেরে তাকে হত্যা করার আদেশ দেন। এরপর লোকেরা তাকে রজম করল।[৪১৬]

উক্ত হাদীসে যদিও একথার উল্লেখ নেই যে, মহিলাটি যিনা করার কতদিন পর পবিত্র হওয়ার জন্য নবীর দরবারে উপস্থিত হয়েছিল। তথাপি মহিলার পবিত্র হওয়ার লক্ষ্যে বার বার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হওয়া একথার প্রমাণ বহন করে যে, ১২০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে হাজির হয়েছিল। কেননা যিনা এমন চারিত্রিক ও ধর্মীয় মহা অপরাধ যা সংগঠিত হওয়ার পর লজ্জা বোধ ও অপরাধের অনুভূতি যিনাকারীকে অতি তাড়াতাড়ি এ পাপ থেকে নিস্কৃতি

---

৪১৬ মুসলিম, খ. ২, পৃ. ৬৮, হাদীস নং ৪২৯৫

পাওয়ার জন্য অস্থিরতা সৃষ্টি করে। আর সাহাবায়ে কিরাম তো এ ব্যাপারে খুবই সচেতন ছিলেন। সুতরাং একথা বলা সঠিক হবে না যে, উক্ত মহিলাটি এক শত বিশ দিন পর তার অপরাধ অনুভব করেছে।

এখানে দেখার বিষয় এই যে, গামেদিয়্যা মহিলাটি একাধিকবার যিনা স্বীকার করার পরও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাকে পাথর মেরে হত্যার আদেশ দেননি। একমাত্র গর্ভকে সামনে রেখেই যিনার হদ কায়েম করতে এত বিলম্ব করছেন। এ হাদীস স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, বিনা কারণে ১২০ দিনের পূর্বেও গর্ভপাত বৈধ নয়।

'আদ্দুর্‌রুল মুখতার' নামক কিতাবে উল্লেখ রয়েছেঃ

وما استبان بعض خلقه كظفر وشعر، كتمام فيما ذكر من الأحكام وعدة ونفاس.[٤١٧]

অর্থ- নখ, চুল ইত্যাদি কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকাশ পাওয়া, বিভিন্ন হুকুম- আহকাম, ইদ্দত, নেফাস ইত্যাদির ব্যাপারে সকল অঙ্গ প্রকাশ পাওয়ার ন্যায়।[৪১৮]

এসূরতটি যেহেতু রূহ আসার সূরত ও কোন অঙ্গ প্রকাশ না পাওয়ার সূরতের মধ্যবর্তী সূরত, তাই তার হুকুমও উক্ত সূরতদ্বয়ের মধ্যবর্তী হুকুম হবে। রূহ আসার পর গর্ভপাত হারাম আর অঙ্গ প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে মাকরূহে তানযিহী। অতএব, অঙ্গ প্রকাশ পাওয়ার পর; রূহ আসার পূর্বে গর্ভপাতের হুকুম উল্লিখিত দুই হুকুমের মধ্যবর্তী অর্থাৎ মাকরূহে তাহরীমী হওয়া চাই। তবে কোন শরয়ী উযর বশত হলে মাকরূহ হবে না। যেমন, গর্ভপাত না করলে দুধ শুকিয়ে পূর্বের বাচ্চার স্বাস্থ্যহানির আশংকা দেখা দেয়া ও দুধের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণে অক্ষম হওয়া কিংবা গর্ভধারিণীর জীবননাশের আশংকা থাকা, ইত্যাদি।

---

417 الدر المختار مع رد المحتار ، كتاب الديات ، فصل في الجنين ، ١٠: ٢٥٤ .

৪১৮ আদ্দুররুল মুখতার [রদ্দুল মুহতার সংলগ্ন], খ. ১০, পৃ. ২৫৪

(৪) ভ্রূণের বয়স ৪ মাসের কম হওয়া এবং কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি না হওয়া। এমতাবস্থায় গর্ভপাত করা মাকরূহ তানযিহী। তবে শরয়ী কোন উযরের কারণে হলে মাকরূহ নয়।

আদ্দুর মুখতার কিতাবে আছে,

ويكره أن تسقى لإسقاط حملها، وجاز لعذر حيث لايتصور.[٤١٩]

অর্থ- গর্ভপাতের জন্য কোন কিছু পান করা মাকরূহ তবে কোন অঙ্গ প্রকাশ না পেলে উযর বশত মাকরূহ নয়।[৪২০]

ফাতাওয়ায়ে কাযীখান এ আছে,

المرضعة إذا ظهر بها الحبل وانقطع لبنها، وليس لأبى الصغير ما يستأجربه الظئر، ويخاف هلاك الولد، قالوا: يباح لها أن تعالج فى استنزال الدم ما دام الحمل نطفة أو علقة أو مضغة لم يخلق له عضو.[٤٢١]

অর্থ- স্তন্যদানকারিনী গর্ভবতী হওয়ার কারণে যদি তার দুধ বন্ধ হয়ে যায় ও শিশুর পিতার অন্য কোন স্তন্যদানকারিণী ভাড়া নেয়ার সামর্থ না থাকে এবং বাচ্চা মারা যাওয়ার আশংকা থাকে, ফকীহ্গণ বলেন- গর্ভ বীর্য, জমাট রক্ত কিংবা গোস্তের টুকরাকারে থাকলে এবং কোন অঙ্গ প্রকাশ না পেলে তখন চিকিৎসার মাধ্যমে গর্ভপাত করানো জায়েয আছে।[৪২২]

---

419 الدر المختار مع رد المحتار ، كتاب الحظر والإباحة ، باب الاستبراء وغيره ، ٩: ٦١٥ .

৪২০ আদ্দুররুল মুখতার [রদ্দুল মুহতার সংলগ্ন], খ. ৯, পৃ. ৬১৫

421 الفتاوى الخانية المعروف بفتاوى قاضيخان على هامش الهندية، كتاب الحظروالإباحة، فصل الختان، ٣: ٤١٠، ومثله فى البحر الرائق، ٨: ٣٧٩، وتبعه فى الهندية، ٥: ٣٥٦، ورد المحتار، ٩: ٦١٥ .

৪২২ ফাতাওয়ায়ে কাযীখান [আলমগিরী সংলগ্ন], খ. ৩, পৃ. ৪১০, আল-বাহরুর রায়িক, খ. ৮, পৃ. ৩৭৯, আলমগীরী, খ. ৫, পৃ. ৩৫৬, রদ্দুল মুহতার, খ. ৯, পৃ. ৬১৫

আলোচনার সার সংক্ষেপ

ভ্রূণের বয়স হিসেবে তাকে চার ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা-

১. ভ্রূণের বয়স ছয় মাসের অধিক। এ সূরতে কোন অবস্থাতেই বাচ্চা নষ্ট করা বৈধ নয়, হারাম।

২. ভ্রূণের বয়স ছয় মাসের কম, চার মাসের অধিক। এ সূরতেও বাচ্চা নষ্ট করা হারাম। তবে মাকে বাঁচানোর জন্য যদি তাকে মেরে ফেলতে হয় তাহলে পূর্বে উল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষে তাকে মেরে ফেলা বৈধ হবে।

৩. ভ্রূণের বয়স চার মাসের কম, কিন্তু বাচ্চার কোন অঙ্গ প্রকাশ পেয়ে গেছে। এ সূরতে বিনা কারণে গর্ভপাত করা মাকরূহে তাহরীমী। তবে কোন উযর বশত হলে মাকরূহ নয়।

৪. ভ্রূণের বয়স এ পরিমাণ যে, এখনও তার কোন অঙ্গ প্রকাশ পায়নি। এ সূরতে গর্ভপাত মাকরূহে তানযীহী। তবে শরয়ী উযর বশত হলে মাকরূহ নয়।

❖ ❖ ❖

أطفال الأنابيب
টেস্ট টিউব বেবি
Test Tube Baby

মৌলিক ভাবে টেস্ট টিউবের মাধ্যমে বাচ্চা জন্ম দুই ধরণের হয়ে থাকে।

(১) স্বামী-স্ত্রীর বীর্য সংমিশ্রণ

স্বামী-স্ত্রীর বীর্য সংমিশ্রণের মাধ্যমে। এ পদ্ধতিটি তিন ধরণের হতে পারে। যথা-

(ক) স্বামী-স্ত্রীর বীর্য সংমিশ্রণ করে উক্ত স্বামীর দ্বিতীয় স্ত্রীর অথবা অন্য কোন মহিলার জরায়ুতে স্থানান্তর করা।

(খ) স্বামীর বীর্য ইঞ্জেকশন ইত্যাদির মাধ্যমে স্ত্রীর জরায়ুতে পৌঁছে দেয়া।

(গ) স্বামী-স্ত্রীর বীর্য সংগ্রহ করে টিউবের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তার প্রতিপালন করে ঐ স্ত্রীর জরায়ুতেই স্থানান্তর করা।

কারো কারো মতে, উক্ত সব কয়টি পদ্ধতিই নিম্নবর্ণিত দলীল সমূহের কারণে নাজায়েয।

১) এক্ষেত্রে পুরুষকে মৈথুনের মাধ্যমে বীর্য বের করতে হবে। আর শরীআতের দৃষ্টিতে মৈথুন নাজায়েয।

২) পুরুষ এবং নারী অথবা কমপক্ষে নারীকে সতর খুলতে হবে। অথচ ভীষণ অপারগতা ছাড়া ডাক্তারদের সামনেও সতর খোলা জায়েয নেই।

৩) পদ্ধতিগুলো অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম। আর শরীআতের স্বভাব হলো অস্বাভাবিক কাজ সমূহ থেকে বিরত রাখা।

৪) শরী'আত যে সমস্ত অপারগতার কারণে বেপর্দা হওয়া ও সতর খোলার অনুমতি দিয়েছে, সে অপারগতা গুলো دفع مضرت তথা ক্ষতি দূর করার আওতাভুক্ত। পক্ষান্তরে উপরোক্ত সন্তান জন্মদানের পদ্ধতিগুলো গ্রহণ করা جلب منفعت তথা উপকার

অর্জনের আওতাভুক্ত। আর শরীআতের দৃষ্টিতে دفع مضرت তথা ক্ষতি দূরীকরণ ও جلب منفعت তথা উপকার অর্জন এক নয়। অতএব, ক্ষতি দূর করার সাথে তুলনা করে উপকার অর্জনের হুকুম দেয়া বৈধ হবে না।

আবার কারো কারো মতে, নিম্নবর্ণিত দলীল সমূহের কারণে উল্লিখিত তিনটি পদ্ধতিই গ্রহণ করা জায়েয।

(১)

'الأصل فى الأشياء الإباحة' عند بعض الحنفية، ومنهم الكرخى والمرغينانى صاحب الهداية.[٤٢٣]

অর্থ- কুরআন ও হাদীসে কোন বস্তু সম্পর্কে জায়েয-নাজায়েয কোন কিছু বর্ণিত না থাকলে কোন কোন হানাফী আলেমের নিকট তা মৌলিকভাবে জায়েয ও বৈধ হিসেবে স্বীকৃত হয়। তাকে নাজায়েয বলা যাবে না। ইমাম কারখী ও হিদায়ার লেখক ইমাম মারগিনানী প্রমুখ এদের অন্তর্ভুক্ত।[৪২৪]

উল্লিখিত পদ্ধতি সমূহ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের কোথাও স্পষ্টভাবে নাজায়েয বলা হয়নি। সুতরাং উক্ত পদ্ধতি গুলোকে নাজায়েয বলা যাবে না।

(২)

عن معقل بن يسار –رضي الله تعالى عنه– ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ... فقال: تزوَّجوا الودود الولود ، فإني مكاثر بكم الأمم .[٤٢٥]

---

423 الأشباه والنظائر، تحت القاعدة السادسة: اليقين لايـزول بالـشك، ص: ٧٣–٧٤، وانظر: الهداية، كتاب الطلاق، فصل فى الحداد، ٢: ٤٢٨ .

৪২৪ আল আশ্বাহ ওয়ান নাযায়ির, ৭৩-৭৪, আরও দেখুন: আল হিদায়া, তালাক অধ্যায়, খ. ২, পৃ. ৪২৮

425 أخرجه أبوداؤد فى النكاح، باب فى تزويج الأبكار، ١: ٢٨٠، رقم الحديث: ٢٠٤٩، والنسائى فى النكاح، باب كراهة تزويج العقيم، وإسناده حسن، وله شاهد عند أحمد من

অর্থ- হযরত মা'কাল বিন ইয়াসার (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ তোমরা এমন মহিলা বিবাহ করো যে খুব ভালবাসে ও অধিক বাচ্চা জন্ম দেয়। কেননা আমি (কেয়ামতের দিন) অধিক উম্মত নিয়ে আধিক্যের গর্ব করব।[৪২৬]

উক্ত হাদীস দ্বারা অধিক সন্তান জন্ম দানের জন্য উম্মতকে উৎসাহিত করা হয়েছে। তাই উল্লিখিত পদ্ধতিতে হলেও যেহেতু এতে সন্তানের সংখ্যা বাড়ে, তাই উল্লিখিত পদ্ধতিতে সন্তান জন্ম দেয়া উক্ত হাদীসের আওতাভুক্ত হয়ে বৈধ হওয়া চাই।

নাজায়েযের প্রবক্তাগণের দলীল সমূহের জবাব

প্রথম দলীলের জবাব

হস্তমৈথুন (যার উপর ভিত্তি করে স্বামী-স্ত্রীর বীর্য সংমিশ্রণের মাধ্যমে বাচ্চা জন্ম দানকে নাজায়েয বলা হয়েছে) সর্বাবস্থায় নাজায়েয নয়। ضرورت ও حاجت দেখা দিলে এর অনুমতিও দেয়া হয়। বরং কোন কোন সময় হস্তমৈথুন ওয়াজিবও হয়ে যায়।

وكذا الاستمناء بالكف، وإن كره تحريما، كما فى الدر المختار مع رد المحتار، فى باب ما يفسد الصوم الخ، (٣: ٣٧١): ... بل لو تعين الخلاص من الزنا به وجب، لأنه أخف، وعبارة الفتح: فإن غلبته الشهوة ففعل إرادة تسكينها به، فالرجاء أن لا يعاقب اهـــ. ...، وفي السراج: إن أراد بذلك تسكين الشهوة

حديث أنس، كذا فى موارد الظمأن ، رقم الحديث: ١٢٢٨ ، و البيهقي في السنن الكبرى ، كتاب النكاح ، باب استحباب التزوج بالودود الولـــود ، ١٠ : ٢٤٣ ، رقـــم الحـــديث : ١٣٧٦٠ .

৪২৬ সুনানে আবী দাঊদ, খ. ১, পৃ. ২৮০, হাদীস নং ২০৪৯, আস সুনানল কুবরা লিল বায়হাকী, খ. ১০, পৃ. ২৪৩, হাদীস নং ১৩৭৬০, মাওয়ারিদুয যম'আন, হাদীস নং ১২২৮

المفرطة الشاغلة للقلب وكان عزبا لا زوجة له ولا أمة، أو كان إلا أنه لا يقدر على الوصول إليها لعذر، (كبعده عنها) قال أبوالليث: أرجو أن لا وبال عليه، أما إذا فعله لاستجلاب الشهوة، فهو آثم.

অর্থ- হস্তমৈথুন মাকরূহে তাহরীমী। তবে যদি যিনা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার এটাই একমাত্র পন্থা হয়ে থাকে তাহলে এ পন্থা অবলম্বন করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কেননা ইহা যিনা থেকে অনেক লঘু। 'ফাতহুল কাদীর' এ আছেঃ যৌন উত্তেজনা অনেক বেড়ে গেলে তা শান্ত করার লক্ষ্যে হস্তমৈথুন করলে আশা করা যায় যে, এতে কোন শাস্তি হবে না। 'সিরাজুল ওয়াহ্হাজ' নামক কিতাবে আছেঃ যদি খুব বেশি যৌন উত্তেজনার কারণে হস্তমৈথুন করে থাকে যে উত্তেজনা অন্তরকে ব্যস্ত করে রাখে ও সে অবিবাহিত তথা তার কোন স্ত্রী বা দাসী না থাকে অথবা তার স্ত্রী কিংবা দাসী আছে কিন্তু অনেক দূরত্বের কারণে তাদের কাছে পৌঁছা সম্ভব না হয়; ফকীহ আবুল লাইছ বলেন, আশা করি তার হস্তমৈথুনে কোন গুনাহ হবে না। হ্যাঁ, যৌনসম্ভোগের স্বাদ উপভোগ করার লক্ষ্যে করলে সে গুনাহ্গার হবে।[৪২৭]

সন্তান লাভ করার আগ্রহ অনেক সময় এমন তীব্র আকার ধারণ করে যে, সতীত্ব ও পবিত্রতার দৃষ্টিকোণ থেকে ضرورت ও حاجت এর পর্যায় পৌঁছে যায়। অতএব, এ ضرورت পূরণ করার লক্ষ্যে হস্তমৈথুন জায়েযের আওতাভুক্ত হয়ে যায়।

দ্বিতীয়তঃ হস্তমৈথুন নাজায়েয হওয়ার একমাত্র রহস্য এই যে, এর মাধ্যমে বীর্যকে মানব বংশ বৃদ্ধির পরিবর্তে অনর্থক নষ্ট করা হয়। পক্ষান্তরে, আমাদের আলোচিত মাসআলায় হস্তমৈথুন বীর্য নষ্ট করার জন্য নয় বরং কার্যকরী ও ফলদায়ক হওয়ার জন্য। এতে হস্তমৈথুনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পাল্টে যায়। অতএব, তার হুকুমও পাল্টে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত।

---

৪২৭ রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৭১

দ্বিতীয় দলীলের জবাব

তাদের দ্বিতীয় দলীলে সতর খোলাকে সামনে রেখে উল্লিখিত পদ্ধতিগুলোকে নাজায়েয বলা হয়েছিল। কিন্তু সতর খোলা হারাম হওয়া সত্ত্বেও সুন্নাতের উপর আমল করার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে সতর খোলা মেনে নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ জায়েয করা হয়েছে।

يحل للرجل أن ينظر من الرجل الأجنبى إلى سائر جسده إلا ما بين السرة والركبة إلا عند الضرورة، فلا بأس أن ينظر الرجل من الرجل إلى موضع الختان ليختنه ويداويه بعد الختن.[٤٢٨]

অর্থ- এক পুরুষের জন্য অপর পুরুষের নাভি এবং হাটুর মধ্যবর্তী স্থান ব্যতীত পূর্ণ শরীর দেখা জায়েয আছে। তবে খৎনা করানো ও পরবর্তীতে ওষুধ লাগানোর লক্ষ্যে খতনার স্থান (যা সতরের অন্তর্ভুক্ত) দেখা জায়েয আছে।[৪২৯]

তেমনিভাবে দুর্বলতা দূর করার লক্ষ্যে (যা জরুরতের অন্তর্ভুক্ত নয়) ঢুস দেয়ার জন্য সতর খোলা জায়েয আছে।

আল্লামা সারাখসী (রহ.) লিখেনঃ

وقد روى عن أبى يوسف: أنه إذا كان به هزال فاحش وقيل له: إن الحقنة تزيل مابك من الهزال. ولابأس بأن يبدئ ذلك الموضع للمحتقن، وهذا صحيح فإن الهزال الفاحش نوع مرض يكون أخره الدق والسل.[٤٣٠]

অর্থ- ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) থেকে বর্ণিত, যার খুব বেশী দুর্বলতা দেখা দেয় এবং তাকে এ ধারণা দেয়া হয় যে, ঢুস ব্যবহার করলে তার দুর্বলতা দূর হয়ে যাবে, তখন তার জন্য ঢুস প্রয়োগকারীর সামনে সতর (মলদ্বার) খোলা অবৈধ নয়। আর এটিই বিশুদ্ধতম মত।

---

428 بدائع الصنائع، كتاب الاستحسان، ٤: ٢٩٧-٢٩٨ .

৪২৯ বাদায়েউস্‌সনায়ে, খ. ৪, পৃ. ২৯৭-২৯৮

430 المبسوط، كتاب الاستحسان، ١٠: ١٥٦ .

কারণ অধিক দুর্বলতা একটি রোগ যার পরিণতি ক্ষয়রোগ ও ক্ষত।[৪৩১]

তেমনিভাবে কেউ মোটা হতে চাইলে (যার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই) তার জন্যও ডুসের অনুমতি রয়েছে।

আল্লামা ত্বাহের আল বুখারী লিখেনঃ

لا بأس بالحقنة لأجل السمن، هكذا روى عن أبي يوسف.[٤٣٢]

অর্থ- মোটা হওয়ার জন্য ঢুস ব্যবহার করতে কোন ক্ষতি নেই। ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[৪৩৩]

তেমনিভাবে অনেক মুবাহ ও শুধু বৈধ কাজের জন্যও ইসলামী শরীআতে বেপর্দা হওয়ার অনুমতি রয়েছে। যেমন মহিলাদের খৎনা করা মুবাহ ও বৈধমাত্র। এতদসত্ত্বেও এর জন্য সতর খোলা ও বেপর্দা হওয়া জায়েয আছে।

আল্লামা আলাউদ্দীন সমরকান্দী লিখেনঃ

ولا يباح النظر والمس إلى ما بين السرة والركبة إلا فى حالة الضرورة بأن كانت المرأة ختانة تختن النساء.[٤٣٤]

অর্থ- নাভি এবং হাটুর মধ্যবর্তী জায়গা দেখা ও স্পর্শ করা বৈধ নয়। তবে প্রয়োজন বোধে এর ব্যতিক্রম করা যাবে। যেমন- খৎনাকারিণী, যে মহিলাদের খৎনা করায়।[৪৩৫]

গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝে আসে যে, সন্তানের অধিকারী হওয়ার আগ্রহ একটি অসাধারণ বাসনা। বিশেষ করে সন্তান থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে মহিলারা বিভিন্ন রকমের মেয়েলি স্নায়ুবিক, হৃদগত এবং আরও বিভিন্ন রকমের দৈহিক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এ বিষয়টি দাম্পত্য জীবনে টানাপোড়েন, ঘৃণা ও মনোমালিন্যের কারণও হয়ে দাঁড়ায়।

---

৪৩১ আল মাবসূত, খ. ১০, পৃ. ১৫৬

432 خلاصة الفتاوى، كتاب الكراهية، الفصل الخامس فى الأكل، ٤: ٣٦٣ .

৪৩৩ খুলাসাতুল ফাতাওয়া, খ. 8, পৃ. ৩৬৩

434 تحفة الفقهاء، كتاب الحظروالإباحة، ٣: ٣٣٤ .

৪৩৫ তুহফাতুল ফুকাহা, খ. ৩, পৃ. ৩৩৪

এমনকি কোন কোন সময় সতীত্ব ও পবিত্রতার জন্যেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে সকল মহিলার জন্য সন্তান লাভ জরুরতের পর্যায় না পৌঁছলেও অনেকের ক্ষেত্রে 'হাজতে'র স্তরে তো পৌঁছবেই।

যখন সুন্নাতে যায়েদাহ এমনকি শুধুমাত্র মুবাহ ও বৈধ কাজকে সামনে রেখে সতর খোলার অনুমতি রয়েছে, যা পূর্বে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তখন সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে সতর খুলতে আপত্তি থাকার কথা নয়।

তৃতীয় দলীলের জবাব

'টেস্ট টিউব'কে একটি অস্বাভাবিক পদ্ধতি বলে নাজায়েয বলা হয়েছিল। উক্ত কথাটি কোন শক্তিশালী দলীল বা প্রমাণ নয়। কেননা টেস্ট টিউব মূলত নিঃসন্তান দম্পতিদের জন্য একটি চিকিৎসা। আর চিকিৎসা জায়েয-নাজায়েয হওয়ার ব্যাপারে স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক দেখা হয় না। বরং যেভাবে চিকিৎসা করলে অধিক ফলপ্রসূ হবে শরী'আত সে পদ্ধতিই গ্রহণ করার অনুমতি দিয়ে থাকে। যেমন- দেহের অভ্যন্তরে ওষুধ পৌঁছানোর মূলপথ হল মুখ ও গলা, এতদসত্ত্বেও বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা হিসেবে ঢুস করানোর অনুমতির কথা পেছনে উল্লেখ হয়েছে। তেমনিভাবে বাচ্চা জন্মের মূল পথ হল যোনিদ্বার কিন্তু প্রয়োজনে সিজারের অনুমতি রয়েছে। যা একটি অস্বাভাবিক পদ্ধতি। অতএব, নিঃসন্তান দম্পতির জন্য টেস্ট টিউব পদ্ধতি অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম হলেও তাকে নাজায়েয বলা যাবে না।

চতুর্থ দলীলের জবাব

৪র্থ দলীলে বলা হয়েছিলঃ টেস্ট টিউবের মাধ্যমে সন্তান লাভ করা جلب منفعت তথা উপকার অর্জন আর শরী'আত যেক্ষেত্রে সতর খোলার অনুমতি দিয়েছে সে ক্ষেত্রগুলো دفع مضرت তথা ক্ষতি দূরীকরণ। আর ক্ষতি দূরীকরণ (دفع مضرت) টা উপকার অর্জন (جلب منفعت) এর

উপর প্রাধান্য পায়। সুতরাং সন্তান লাভ তথা جلب منفعت কে دفع مضرت এর সাথে তুলনা করে উক্ত পদ্ধতি গ্রহণ করা জায়েয হবেনা।

উক্ত দলীলটি সঠিক নয়। কারণ, শরীআত শুধু ক্ষতি দূরীকরণের ক্ষেত্রেই সতর খোলার অনুমতি দেয়নি বরং جلب منفعت তথা উপকার অর্জনের জন্যও সতর খোলার স্পষ্ট অনুমতি দিয়েছে। যেমন- খতনার জন্য সতর খোলা। যার বিস্তারিত আলোচনা দ্বিতীয় দলীলের জবাবে করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ এ নীতিটি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বরং ঐ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে ক্ষেত্রে উপকার অর্জন (جلب منفعت) ও ক্ষতি দূরীকরণ (دفع مضرت) সমান স্তরের হয়ে থাকে। শুধু এ ক্ষেত্রে ক্ষতি দূরীকরণ (دفع مضرت) কে উপকার অর্জন (جلب منفعت) এর উপর প্রাধান্য দেয়া হয়। আর যে ক্ষেত্রে ক্ষতি দূরীকরণের তুলনায় উপকার অর্জন (جلب منفعت) এর পাল্লা ভারী হয় সে ক্ষেত্রে ক্ষতি দূরীকরণ (دفع مضرت) কে প্রাধান্য দেয়া হয় না, বরং উপকার অর্জন (جلب منفعت) কেই প্রাধান্য দেয়া হয়।

ফিকাহ শাস্ত্রে একটি প্রসিদ্ধ 'কায়দা' আছেঃ

قد تراعى المصلحة لغلبتها على المفسدة: منه الكذب مفسدة محرمة، وهى متى تضمن جلب المصلحة تربو عليه جاز، كالكذب للإصلاح بين الناس، وعلى الزوجة لإصلاحها.[٤٣٦]

অর্থ- কখনো কখনো ক্ষতির তুলনায় লাভ বেশি দেখা দিলে লাভকেই প্রাধান্য দেয়া হয়। এ জন্যইতো মিথ্যা বলা ক্ষতিকর ও হারাম হওয়া সত্ত্বেও যখন তা উক্ত ক্ষতি থেকে বড় উপকার বয়ে আনে তখন মিথ্যা বলা নাজায়েয থাকে না। যেমন দুজনের মধ্যে বিরোধ মীমাংসার স্বার্থে ও স্ত্রীর সংশোধনের জন্য মিথ্যা বলা।[৪৩৭]

---

436 الأشباه والنظائر، تحت القاعدة الخامسة، ص: ١٤٨-١٤٩ .

৪৩৭ আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ির, পৃ. ১৪৮-১৪৯

টেস্ট টিউবের মাধ্যমে সন্তান লাভ উপকার অর্জন (جلب منفعت) এর আওতাভুক্ত ঠিক কিন্তু এর পাল্লা উল্লিখিত ক্ষতি দূরীকরণ (دفع مضرت) এর তুলনায় অনেক ভারী। অতএব এক্ষেত্রে উপকার অর্জন (جلب منفعت) তথা টেস্ট টিউবের মাধ্যমে উল্লিখিত পদ্ধতিতে সন্তান জন্ম দেয়াকে প্রাধান্য দেয়া ও জায়েয বলাই যুক্তিসঙ্গত।

তবে অধমের নিকট, উল্লিখিত তিনটি পদ্ধতির ১ম পদ্ধতিটি নিম্নবর্ণিত দলীল সমূহের কারণে নাজায়েয ও হারাম।

(১) এর মধ্যেও বেগানা মহিলা ও পুরুষের বীর্য সংমিশ্রণের ন্যায় নাজায়েয হওয়ার কারণগুলো বিদ্যমান। কেননা এখানে এক মহিলার মাধ্যমে অপর মহিলা। (অর্থাৎ যার বীর্য নেয়া হয়েছে) সন্তানকে সেচন করা হয়, যা হারাম হওয়া হাদীস[৪৩৮] দ্বারা প্রমাণিত।

(২) এতে বংশ পরিচয় নির্ধারণে একটি কঠিন সমস্যা দেখা দেয়।

(৩) পর পুরুষের বীর্য পর নারীর জরায়ুতে প্রবেশ করানো যিনার সাদৃশ্য হওয়ায় নাজায়েয বলা হয়েছে। তেমনি ভাবে এক মহিলার বীর্য অপর মহিলার জরায়ুতে প্রবেশ করানোও দুই মহিলা একে অপরের মাধ্যমে যৌন ক্ষুধা মিটানোর সাদৃশ্য হওয়ার কারণে নাজায়েয হওয়া উচিত।

---

438 عن رويفع بن ثابت الأنصارى... سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره. (رواه أبو داؤد فى النكاح، باب فى وطى السبايا، ١: ٢٩٣، والترمذى فى النكاح، باب ما جاء فى الرجل يشترى الجارية وهى حامل، ١: ٢١٤، رقم الحديث: ١١٣١، وقال: هذا حديث حسن)

অর্থ- হযরত রুয়াইফে' বিন ছাবেত আনসারী থেকে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং কেয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে তার জন্য নিজের পানি দিয়ে অপরের ক্ষেতে সেচের কাজ করা হারাম। (আবূ দাউদ, খ. ১, পৃ. ২৯৩, তিরমিযী, খ. ১, পৃ. ২১৪, হাদীস নং ১১৩১)

وعن واثلة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سحاق النساء بينهن زنا. [٤٣٩]

অর্থ- হযরত ওয়াসেলাহ (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, দুই মহিলা একে অপরের সাথে মেলামেশার মাধ্যমে যৌন ক্ষুধা মেটানো যিনা।[৪৪০]

আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদ্ধতিদ্বয় জায়েয। ফাতাওয়ায়ে শামীতে আছেঃ

إذا عالج الرجل جاريته فيما دون الفرج، فأنزل، فأخذت الجارية ماءه فى شئ، فاستدخلته فرجها فى حدثان ذلك، فعلقت الجارية، وولدت، فالولد ولده، والجارية أم ولد له. (رد المحتار، كتاب الطلاق، باب العدة، ٥: ٢١٣، نقلا عن البحر)

অর্থ- যদি কোন ব্যক্তি তার দাসীর সাথে লজ্জাস্থান ব্যতীত অন্যত্র সহবাস করে ও বীর্যপাত ঘটায়। এরপর দাসী সেই বীর্য কোন পাত্রে সংরক্ষণ করে রেখে পরবর্তিতে তার যোনিদ্বারে প্রবেশ করাল। ফলে সে গর্ভবতী হয়ে পড়ল এবং সন্তান প্রসব করল। এমতাবস্থায় শিশুটি ঐ পুরুষেরই হবে ও উক্ত দাসী তার উম্মে ওয়ালাদ হিসেবে সাব্যস্ত হবে।[৪৪১]

(২) পর পুরুষ ও পর স্ত্রীর বীর্য সংমিশ্রণ

বেগানা মহিলার অথবা বেগানা পুরুষের শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু একসাথে মিলিয়ে সন্তান জন্ম দেয়া। উক্ত পদ্ধতিটি ৩ ধরণের হতে পারে।

---

439 أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد، كتاب الحدودوالديات، باب زنا الجوارح، ٦: ٣٩١–٣٩٢، رقم الحديث: ١٠٥٤٨، عن أبي يعلى، وقال: ورجاله ثقات .

৪৪০ মাজমাউয যাওয়ায়িদ, খ. ৬, পৃ. ৩৯১-৩৯২, হাদীস নং ১০৫৪৮

৪৪১ শামী, খ. ৫, পৃ. ২১৩, ক্বারারাতু মাজমায়িল ফিকহিল ইসলামী, পৃ. ৬-৭, ক্বারার নং (৪)/১৩/৭/৮৬

(ক) আজনবী অর্থাৎ বেগানা পুরুষের ও বেগানা মহিলার বীর্য কোন টিউবে একত্রিত করা।

(খ) মহিলার ডিম্বাণু নিয়ে বেগানা পুরুষের বীর্যের সাথে মিশিয়ে তারই জরায়ুতে প্রবেশ করানো।

(গ) বেগানা পুরুষের শুক্রাণু ও বেগানা মহিলার ডিম্বাণু সংগ্রহ করে তৃতীয় কোন মহিলার জরায়ুতে প্রবেশ করানো। যাকে সারোগেট মাদার (Surrogate Mother) অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী মা বলা হয়।

উল্লিখিত সব কয়টি পদ্ধতিই নিম্নবর্ণিত দলীল সমূহের কারণে নাজায়েয ও হারাম।

(ক)

عن رويفع بن ثابت الأنصارى... سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره. [٤٤٢]

অর্থ- হযরত রুয়াইফে' বিন ছাবেত আনসারী থেকে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং কেয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে তার জন্য নিজের পানি দিয়ে অপরের ক্ষেতে সেচ করা হারাম।[৪৪৩] (অর্থাৎ নিজের বীর্য পরনারীর জরায়ুতে প্রবেশ করানো হারাম।)

(খ) এতে বংশ পরিক্রমায় বিশৃঙ্খলা ও জগাখিচুড়ী অবস্থা সৃষ্টি হয়। যিনা হারাম হওয়ার হেকমত ও রহস্য সমূহের মধ্যে এটা অন্যতম। বংশকে এ বিশৃংখলা থেকে রক্ষা করার জন্য একজনের পানি গ্রহণ ছেড়ে অর্থাৎ তার স্ত্রীত্ব থেকে বের হয়ে, অপর জনের স্ত্রীত্ব গ্রহণ করতে হলে ইদ্দত পালন আবশ্যক ও জরুরী সাব্যস্ত করা হয়েছে।

---

442 رواه أبو داؤد فى النكاح، باب فى وطى السبايا، ١: ٢٩٣، والترمذى فى النكاح، باب ما جاء فى الرجل يشترى الجارية وهى حامل، ١: ٢١٤، رقم الحديث: ١١٣١، وقال: هذا حديث حسن .

৪৪৩ সুনানে আবী দাউদ, খ. ১, পৃ. ২৯৩, সুনানে তিরমিযী, খ. ১, পৃ. ২১৪, হাদীস নং ১১৩১

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহ্লভী (রহ.) বলেনঃ

منها معرفة براءة رحمها من مائه، لأن لا تختلط الأنساب، فإن النسب أحدما يتشاح به ويطلبه العقلاء، وهو من خواص نوع الإنسان، ومما امتاز به من سائر الحيوان، وهو المصلحة المرعية فى باب الاستبراء.[٤٤٤]

অর্থ- ইদ্দতের উপকারিতা সমূহের মধ্যে একটি এই যে, এর মাধ্যমে পূর্বের স্বামীর বীর্য থেকে মহিলার জরায়ু পবিত্র হওয়া সম্পর্কে জানা যায়। যাতে বংশ পরিক্রমার কোন রূপ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয়। কারণ, বংশ একটি আকর্ষণীয় ও শ্লাঘনীয় বিষয়, জ্ঞানী-গুণীদের চাহিদাও তাই। এটা মানব জাতির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য, এই বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে মানুষ অন্যান্য জীব-জানোয়ার থেকে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্রমন্ডিত। আর 'ইস্তেব্রা' অধ্যায়ে লক্ষণীয় মাসলাহাত এটাই।[৪৪৫]

নাজায়েয টেস্ট টিউব বেবি ও হুরমাতে মুছাহারাত

টেস্ট টিউব বেবির উক্ত চারটি পদ্ধতি নাজায়েয হলেও এর দ্বারা 'হুরমাতে মুছাহারাত' সাব্যস্ত (ثابت) হয়ে যাবে। কারণ 'হুরমাত' মানে– 'ইজ্জত ও সম্মান'। আর 'মুছাহারাত' মানে– 'একে অপরের নিকটতম হওয়া'। এ হিসেবে 'হুরমাতে মুছাহারাত' এর অর্থ দাড়ায়: 'নিকটতম সম্পর্কের ইজ্জত-সম্মান ও ইহতেরাম করা'।

এবার বুঝার বিষয় হল, নিকটতম সম্পর্ক হয় কিসের মাধ্যমে? অর্থাৎ 'হুরমাতে মুছাহারাত' এর আসল 'কারণ' (سبب أصلى) কী? 'হুরমাতে মুছাহারাত' এর আয়াত (آية مصاهرة) ও বিভিন্ন কিতাবাদি অধ্যয়ন করলে এ কথা পরিস্কার হয়ে যায় যে, 'হুরমাতে মুছাহারাত' এর আসল কারণ (سبب أصلى) হলো 'বাচ্চা' অর্থাৎ কোন পুরুষ ও মহিলার

---

444 حجة الله البالغة، مبحث الطلاق، مسئلة العدة من أبواب تدبير المنـــزل، ٢: ١٤٢ .

৪৪৫ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, খ. ২, পৃ. ১৪২, আরো দেখুন, ক্বারারাতু মাজমায়িল ফিকহিল ইসলামী, জিদ্দা, পৃ. ৬-৭।

মিলনে যে বাচ্চা জন্ম নেয় সে বাচ্চা উক্ত পুরুষ ও মহিলার অংশ (جزء) (কেননা সে উভয়ের বীর্য থেকে সৃষ্ট) আর এ বাচ্চা উভয়জনের অংশ হওয়ার কারণেই তাদের মধ্যে جزئيت وبعضيت বা পারস্পরিক অংশাঅংশীর সম্পর্ক হয়ে এরা একে অপরের নিকটতম হয়ে গেছে। এ নৈকট্যের সম্মানার্থেই উক্ত পুরুষের জন্য এ মহিলার মা, দাদী ও নানী ইত্যাদি ও তার সন্তানাদির (اصول وفروع) সাথে বিবাহ-শাদী অবৈধ হয়ে যায়। তেমনিভাবে এ মহিলার জন্যও উক্ত পুরুষের পিতা, দাদা ও নানা ইত্যাদি ও তার সন্তানাদির (اصول وفرو) সাথে বিবাহ-শাদী অবৈধ হয়ে যায়।

কেননা এদের মধ্যে বিবাহ-শাদী বৈধ থাকা ইজ্জত-সম্মান ও ইহতেরামেরও পরিপন্থী। কারণ যে পুরুষ ঐ মহিলার সাথে মেলা-মেশা করেছে সে আবার ঐ মহিলার কোন অংশ যেমন সন্তানাদি কিংবা সে যাদের অংশ যেমনঃ মা, দাদী ও নানী ইত্যাদির সাথে মেলা-মেশা করবে কোন লজ্জায়? অতএব এদের সম্মান রক্ষার্থেই তাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ হারাম করা হয়েছে। অন্যথায় এ দু'খান্দানের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া ও হিংসা-বিবাদ ইত্যাদি জন্ম নেয়ার প্রবল আশংকা রয়েছে। আর এ ইজ্জত ও ইহতেরামের নামই 'হুরমাতে মুছাহারাত'।

উল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যে পুরুষ ও মহিলার ধাতু একত্রিত করে বাচ্চা জন্ম দেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে 'হুরমাতে মুছাহারাত' সাব্যস্ত (ثابت) হয়ে যাবে। অর্থাৎ এদের জন্য একে অপরের পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী ও সন্তানাদির সাথে বিবাহ করা হারাম হয়ে যাবে।

একটি প্রশ্ন ও তার নিরসন

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, 'হুরমাতে মুছাহারাত' প্রমাণ হতে তো বাচ্চা হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। বরং একে অপরকে شهوة তথা কাম-ভাব ও যৌন উত্তেজনার সাথে স্পর্শ করলেই 'হুরমাতে মুছাহারাত' সাব্যস্ত হয়ে যায়। 'হুরমাতে মুছাহারাত' এর কারণ (سبب) বাচ্চা নয়,

বরং বৈধ বিবাহ, যিনা কিংবা কামভাব নিয়ে একে অপরকে স্পর্শ করা, কোন মহিলা পর পুরুষের যৌনাঙ্গ দেখা ও কোন পুরুষ পর মহিলার যৌনাঙ্গের ভিতরাংশ দেখা ইত্যাদি। অথচ এখানে 'হুরমাতে মুছাহারাত' এর আসল কারণ (سبب) বাচ্চাকে বলা হয়েছে।

উত্তরঃ এর উত্তর হলো এই যে, 'হুরমাতে মুছাহারাত' এর আসল কারণ (سبب) 'বাচ্চা'ই। তবে যেহেতু বাচ্চা মেলা-মেশার সাথে সাথেই জন্ম নিবে না। বাচ্চা জন্ম নিতে নয় মাসের মত সময় লাগবে। এতদিন অপেক্ষা করাতো সমীচীন হবে না। আর সহবাসের সাথে সাথে বাচ্চা জন্ম নিল কি না? তা বুঝাও সর্বক্ষেত্রে সম্ভব নয়, যাকে শরীআতের পরিভাষায় السبب الخفى তথা সুপ্ত কারণ বলে। এ সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে শরী'আত سبب তথা কারণ হিসেবে সহবাস (جماع) কে সাব্যস্ত করেছে। কেননা সহবাস 'বাচ্চা' হওয়ার কারণ। চাই এ সহবাস বিবাহের মাধ্যমে হালাল পন্থায় হোক কিংবা যিনার মাধ্যমে হারাম পন্থায়।

তেমনিভাবে বিভিন্ন হাদীস ও আছার এর কারণে এবং সতর্কতা (احتياط) এর উপর ভিত্তি করে دعاوى جماع তথা সহবাসের নিকটতম ভুমিকাগুলোকেও শরী'আত সহবাস (جماع) এর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে গণ্য করেছে। অনুরূপভাবে বিবাহ বন্ধনও (عقد نكاح) যেহেতু সহবাসের কারণ হয় তাই তাকেও 'হুরমাতে মুছাহারাত' এর سبب বা কারণ হিসেবে ধর্তব্য করেছে। কিন্তু এগুলো 'হুরমাতে মুছাহারাত' এর আসল سبب বা কারণ নয়। আসল কারণ বা سبب হল 'বাচ্চা'।

অতএব বাচ্চা জন্ম নিলে অধিক যুক্তিসঙ্গতভাবে (بطريق أولى) 'হুরমাতে মুছাহারাত' সাব্যস্ত হবে।

বিবাহ ব্যতীত সহবাস হলে যেভাবে 'হুরমাতে মুছাহারাত' সাব্যস্ত হয়ে যায়। অথচ সহবাসটি নাজায়েয ছিল। তেমনিভাবে সহবাস ব্যতীত যে কোন পন্থায় বাচ্চা হলেও 'হুরমাতে মুছাহারাত' সাব্যস্ত হয়ে যাবে। যদিও তা নাজায়েয পন্থায় হয়।

নাজায়েয পন্থায় টেস্ট টিউব বেবির মাধ্যমে ‘হুরমাতে মুছাহারাত’ সাব্যস্ত হওয়ার একটি দৃষ্টান্ত

যেমন, উযূ ভাঙ্গার মূল কারণ (سبب) ‘নাপাকী বের হওয়া’ অথবা ‘মলদ্বার দিয়ে বায়ু নির্গত হওয়া’ (خروج نجاسة وخروج ريح) আর ‘নাপাকী’ ও ‘বায়ু নির্গত হওয়ার’ কারণ হলো ‘অঙ্গ ঢিলা হওয়া’ (استرخاء أعضاء), আর ‘অঙ্গ ঢিলা হওয়ার’ একটি কারণ হলো ‘নিদ্রা’। অতএব ‘নিদ্রা’কে শরী‘আত উযূ ভাঙ্গার سبب বা কারণ সাব্যস্ত করেছে। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, শুধু ‘নিদ্রা’ গেলেই উযূ ভাঙ্গবে خروج نجاسة وخروج ريح তথা ‘নাপাকী’ বের হলে কিংবা ‘মলদ্বার দিয়ে বায়ু নির্গত হলে’ উযূ ভাঙ্গবে না। বরং ‘নিদ্রা’ ব্যতীতও যদি (استرخاء أعضاء) ‘অঙ্গ ঢিলা’ হয় যেমন, বেহুশ হলে অথবা কোন প্রকার استرخاء) (أعضاء ‘অঙ্গ ঢিলা হওয়া’ ব্যতীত ‘নাপাকী’ বের হলে কিংবা ‘মলদ্বার দিয়ে বায়ু নির্গত’ হলে আরও অধিক যুক্তিসঙ্গতভাবে (بطريق أولى) উযূ ভেঙ্গে যাবে।

তেমনিভাবে বিবাহ কিংবা সহবাস ব্যতীত যদি ‘হুরমাতে মুছাহারাত’ এর আসল কারণ (سبب) ‘বাচ্চার জন্ম’ পাওয়া যায়, তাহলে অধিক যুক্তিসঙ্গতভাবে (بطريق أولى) ‘হুরমাতে মুছাহারাত’ সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আর টেস্ট টিউব বেবিও অনুরূপ।

জায়েয টেস্ট টিউব বেবির মীরাছ নীতি

টেস্ট টিউব বেবির জায়েয কোন পন্থায় বাচ্চা জন্ম নিলে তার মীরাছের ব্যাপারে তো কোন সংশয় থাকার কথা নয়। যে পুরুষ আর যে মহিলা থেকে বীর্য নেয়া হয়েছে তারাই ঐ বাচ্চার পিতা-মাতা সাব্যস্ত হবে এবং তাদের মীরাছ নীতিও পিতা-মাতা হিসেবে সাব্যস্ত হবে।

নাজায়েয টেস্ট টিউব বেবির মীরাছ নীতি

টেস্ট টিউব বেবির নাজায়েয কোন পন্থায় বাচ্চা জন্ম নিলে তার মীরাছের সম্পর্ক পুরুষ ও মহিলা উভয়জনের সাথে হবে না, বরং তার

মীরাছের সম্পর্ক শুধু ঐ মহিলার সাথে হবে যার জরায়ুতে বীর্য রেখে বাচ্চা জন্ম দেয়া হয়েছে। আল্লাহ পাক বলেনঃ

إن امهاتهم إلا اللائى ولدنهم .[٤٤٦]

অর্থ- ওদের মা তারাই যারা ওদেরকে প্রসব করেছে।[৪৪৭]

উক্ত আয়াতের ভাষ্যানুযায়ী প্রসবকারিণী তার মা সাব্যস্ত হয়। বিধায় মীরাছ ও বিবাহ-শাদী ইত্যাদি সম্পর্কিত সকল মাসআলার সম্পর্ক তার সাথে হওয়াটা স্পষ্ট।

পক্ষান্তরে, যে পুরুষ থেকে বীর্য গ্রহণ করা হয়েছে, তার সাথে হুরমাতে মুছাহারাত সাব্যস্ত হলেও মীরাছের সম্পর্ক হবে না। যেমন, যিনার মাধ্যমে কোন বাচ্চা জন্ম নিলে ঐ বাচ্চার মীরাছের সম্পর্ক যিনাকারিণী মহিলার সাথে হয়, যিনাকারি পুরুষের সাথে হয় না।

হাদীস শরীফে আছেঃ

عن عائشة–رضي الله تعالى عنها–، أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص عبد بن زمعة فى غلام، فقال سعد: هذا، يارسول الله! ابن أخى عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخى، يارسول الله! ولد على فراش أبي من وليدته[٤٤٨]، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه، فرآى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك، ياعبد! الولد للفراش، وللعاهر الحجر.[٤٤٩]

অর্থ- হযরত আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করেন, সা‘আদ বিন আবী ওয়াক্কাস ও আবদ বিন যাম‘আ একটি বাচ্চা নিয়ে বিবাদ করেন। সা‘আদ বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! ছেলেটি আমার ভাতিজা, কেননা আমার

---

446 سورة المجادلة، آية: ٢ .

৪৪৭ সূরা মুজাদালা, আয়াত: ২

৪৪৮ আল মুসান্নাফ লি আবদির রায্যাক (খ. ৭, পৃ. ৩৫৪) এ وليدته এর পরিবর্তে جاريته শব্দ আছে।

449 أخرجه مسلم فى الرضاع، باب الولد للفراش، ١: ٤٧١، رقم الحديث: ٣٥٩٢ .

ভাই আতাবা বিন আবী ওয়াক্কাস আমাকে বলে গেছে যে, ছেলেটি তার। আপনি তার চেহারার দিকে দেখুন, তার ও আমার ভাই আতাবার চেহারা একেবারে এক রকম। আর আবদ বিন যাম'আ বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! ছেলেটি আমার ভাই। সে আমার পিতার দাসীর ঘরে জন্ম নিয়েছে। অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ছেলেটির দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে, তার চেহারা একেবারে আতাবার ন্যায়। এতদসত্ত্বেও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সিদ্ধান্ত দিলেন যে, হে আবদ! ছেলেটি তোমার (ভাই)। কেননা যার ঘরে জন্ম নেয় সন্তান তারই হয়। যিনাকারির হয় না। সে বঞ্চিত থাকে, তার জন্য তো পাথর।[৪৫০]

আসল ঘটনাটি এই যে, জাহেলিয়্যাতের যুগে আতাবা যাম'আর দাসীর সাথে যিনা করে। আর ঐ যিনার দ্বারা একটি সন্তান জন্ম নেয় এবং তার চেহারা যিনাকারী আতাবার স্পষ্ট সাদৃশ্যও ছিল। এরপরও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ছেলেটি যাম'আরই বলে সিদ্ধান্ত দিলেন। কেননা যিনাকারিণী মহিলা ঐ সময় যাম'আর দাসী ছিল।

অতএব, এখানেও সন্তান অবৈধ পন্থায় হওয়ার পরেও সে শুধু ঐ মহিলারই হবে যার জরায়ুতে বীর্য রাখা হয়েছে। অর্থাৎ যে প্রসব করেছে সন্তান তারই হবে। যার বীর্য নেয়া হয়েছে তার হবে না। তাই তার সাথে মীরাছের সম্পর্কও হবে না।

ঘটনাটির অপর আরেকটি রেওয়ায়েতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এ ছেলেটির মীরাছের সম্পর্কও যাম'আর সাথে হওয়ার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। যিনাকারি আতাবার সাথে দেননি।

عن ابن الزبير: أن زمعة كانت له جارية، وكان يطئها، وكانوا يتهموها، فولدت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسودة: أما الميراث فله، وأما أنت فاحتجبي منه ياسودة، فإنه ليس لك بأخ.[٤٥١]

---

৪৫০ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৪৭১, হাদীস নং ৫৮৯২

451 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب الرجلان يدعيان الولد، ٧: ٤٤٣/٣٥٤، رقم الحديث: ١٣٨٩٥، وأحمد في مسنده، ٤: ٥، رقم الحديث: ١٦٢٢٦ .

অর্থ- ইবনে যুবায়ের বর্ণনা করেন, যাম'আর একজন দাসী ছিল, সে তার সাথে মেলা-মেশা করত, লোকেরা তাকে যিনার অপবাদ দেয় এবং এর দ্বারা তার একটি বাচ্চাও হয়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম (যাম'আর মেয়ে উম্মুল মুমিনীন) হযরত সাওদা (রাযি.) কে বললেনঃ সে যাম'আর মীরাছ পাবে, কেননা সে যাম'আর দাসীর ঘরে জন্ম নিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে যেহেতু সে তোমার ভাই নয় তাই তুমি তার থেকে পর্দা করবে।[৪৫২]

উক্ত হাদীসে ঐ বাচ্চাটি আতাবার বীর্য থেকে জন্ম নেয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তার সাথে মীরাছের সম্পর্ক না হওয়ার সিদ্ধান্ত দিলেন। অতএব, টেস্ট টিউব বেবির ব্যাপারেও একই হুকুম হবে।

তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিমে উল্লেখ আছেঃ

ثم أنه صلى الله عليه وسلم ألحق الولد بالفراش فى هذه الصورة التى يشهد فيها الظاهر لغير الفراش، فثبت أن النسب لايبتنى على حقيقة العلوق، وإنما يدور مع الفراش، ولوكان ظاهر الحال يشهد أن الولد من الزنا، وليس فى الصورة المبحوث عنها الاشتباه الظاهر بخلاف الفراش، وقد نص الحديث على ترك اعتباره.[٤٥٣]

অর্থ- প্রকাশ্য ঘটনায় বাচ্চা ফেরাশের বিপক্ষে হওয়া সত্ত্বেও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বাচ্চাকে ফেরাশের (অর্থাৎ প্রসাবকারিণী যার স্ত্রী কিংবা দাসী তার) সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সিদ্ধান্তই প্রদান করলেন। ফলে সাব্যস্ত হলো নসব (ও মীরাছ) এর ভিত্তি বাস্তব বীর্যের উপর নির্ভর করে না। এর সম্পর্ক ফেরাশের (অর্থাৎ প্রসাবকারিণী যার স্ত্রী কিংবা দাসী তার) সাথে হয়। যদিও এ কথা স্পষ্ট যে, বাচ্চা যিনার

---

৪৫২ আল মুসান্নাফ লি আবদির রায্যাক, খ. ৭, পৃ. ৩৫৪/৪৪৩, হাদীস নং ১৩৮৯৫, মুসনাদু আহমাদ, খ. ৪, পৃ. ৫, হাদীস নং ১৬২২৬

453 تكملة فتح الملهم، ١: ٨٠ .

মাধ্যমে যিনাকারীর বীর্য থেকেই জন্ম নিয়েছে। এতদসত্ত্বেও হাদীস তা প্রত্যাখ্যান করল।[৪৫৪]

এখান থেকে এ কথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পর পুরুষের বীর্য যে মহিলার গর্ভে রাখা হয়েছে যদি এর সংমিশ্রণ এ মহিলার বীর্যের সাথে না হয়ে অন্য কোন মহিলার বীর্যের সাথে হয়। তথাপিও বাচ্চার মীরাছের সম্পর্ক গর্ভে ধারণকারিণী মহিলার সাথেই হবে। যে মহিলার বীর্যের সাথে সংমিশ্রণ করা হয়েছে তার সাথে হবে না। কারণ বংশ ও মীরাছের সম্পর্ক বীর্যের সাথে হয় না বরং ফেরাশের সাথে হয়। অর্থাৎ যে প্রসব করে তার সাথে হয় এবং এ মহিলা যার স্ত্রী কিংবা দাসী তার সাথে হয়।

---

৪৫৪ তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, খ. ১. পৃ. ৮০

الاستنساخ
ক্লোনিং
Cloning

ইউনানী ভাষায় Alol একটি শব্দ আছে, যার অর্থ হলোঃ সদ্য স্ফুটিত ডাল, এর থেকে Cloning শব্দটি গৃহীত। এ শব্দটি ইংরেজীতে বর্তমানে সাদৃশ্য, অনুরূপ সৃষ্টি ও নকল তৈরী করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। যাকে আমরা ফটোকপিও বলতে পারি।

ক্লোনিং বলতে কি বুঝায়

পুরুষের শুক্রাণু ও নারীর ডিম্বাণুর সংমিশ্রণ ছাড়া যে কোন একজনের Cell তথা প্রাণীকোষ থেকে নিউক্লিয়াস (Nucleus) সংগ্রহ করতঃ তা নারীর ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াস (Nucleus) এর সাথে মিশিয়ে ইলেকট্রিক শর্টের মাধ্যমে বিশেষ নিয়মে পরিচর্যা করে শিশু জন্ম দেয়াকে ক্লোনিং বলে। এ পদ্ধতিতে যার কোষের নিউক্লিয়াস (Nucleus) পরিচর্যা করা হয় শিশু তার অবিকল আকৃতি ধারণ করে। এ কারণেই তাকে ক্লোনিং অর্থাৎ সাদৃশ্য বা ফটোস্ট্যাট বলা হয়।

এর তফসীল এই যে, মানবদেহ অসংখ্য প্রাণীকোষ (Cell) দ্বারা গঠিত। এ Cell তথা প্রাণীকোষগুলো এত ছোট যে, সেগুলো অনুবিক্ষণযন্ত্র ব্যতীত খালি চোখে দেখা যায় না। এগুলোর দুই মাথা মোটা ও মধ্যখান খুবই সরু থাকে। কোষগুলো মধ্যখান দিয়ে ভেঙ্গে এর প্রত্যেকটি অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ কোষে পরিণত হয়। পুনরায় এ দুটির মধ্যখান সরু হয়ে ভেঙ্গে চারটি কোষে পরিনত হয়। এভাবে চার থেকে আট, আট থেকে ষোল ধারাবাহিকভাবে মিনিটের মধ্যে হাজার হাজার কোষের জন্ম হয়। তেমনিভাবে দ্রুত গতিতে মারাও যায়। প্রত্যেকটি কোষে নিউক্লিয়াস (Nucleus) বা প্রাণকেন্দ্র থাকে। আর প্রতিটি নিউক্লিয়াস (Nucleus) বা প্রাণকেন্দ্রে ৪৬টি ক্রোমোসোম (Chromosome) থাকে। যা নিউক্লিয়াস এর মধ্যে কতকগুলো লম্বা সুতার মত দেখা যায়। এগুলো

সুতার বাণ্ডিলের মত পেঁচিয়ে থাকে যাতে করে ছিড়ে না যায়। এগুলোকে খুলে লম্বা করলে আটাশ শত কিলোমিটারের মত হবে। এর দ্বারাই জীবের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য ও বংশ পরম্পরা সঞ্চারিত হয়। নরের বীর্যে ২৩টি ও নারীর ডিম্বে ২৩টি করে ক্রোমোসোম থাকে। এভাবে নর-নারীর বীর্য মিলে ৪৬ এর সংখ্যা পরিপূর্ণ হয়। তাই শিশু মাতা-পিতা উভয়ের বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্ম নেয়। فتبارك الله أحسن الخالقين

ক্লোনিং এর কাজ হলো নারীর ডিম্বের কোন Cell থেকে নিউক্লিয়াস (Nucleus) ও শরীরের অন্য কোন অংশের সেল থেকে নিউক্লিয়াস (Nucleus) বের করে সংমিশ্রণ করা। এ নিউক্লিয়াস পুরুষের শরীর থেকেও নেয়া যায়, মহিলার শরীর থেকেও নেয়া যায়। শরীরের অন্যান্য অংশেও একেকটি নিউক্লিয়াস (Nucleus) ৪৬টি ক্রোমোসোম বহন করে। এভাবে নর-নারী মিলে ক্রোমোসোমের যে সংখ্যা পূর্ণ হয় ক্লোনিং দ্বারাও শুধু পুরুষ অথবা শুধু নারীর ক্রোমোসোমের এ সংখ্যা পরিপূর্ণ হয়। এ কারণে গর্ভস্থিত একটি সন্তানের অস্তিত্ব লাভের জন্য তা যথেষ্ট হয়ে যায়।

যখন কোন নারীর ডিম্বের নিউক্লিয়াস (Nucleus) এর সাথে তারই শরীর থেকে অর্জিত নিউক্লিয়াস (Nucleus) সংমিশ্রণ করে পরিচর্যা করা হয়, তখন পুরুষের সংস্পর্শ ব্যতীত একটি শিশু জন্ম নিতে পারে। এতে যেহেতু শুধু নারীর নিউক্লিয়াস (Nucleus) এ অবস্থিত ক্রোমোসোমই ব্যবহৃত হয়েছে তাই শিশুটি আকৃতি ও রূপের দিক দিয়ে হুবহু সে নারীর মতই হবে। পক্ষান্তরে, যদি নারীর পরিবর্তে কোন পুরুষের নিউক্লিয়াস (Nucleus) রেখে দেয়া হয়, তাহলে শিশুর দেহ শুধু সে পুরুষের নিউক্লিয়াস (Nucleus) এ থাকা ক্রোমোসোম দ্বারা তৈরী হবে বিধায় তার আকৃতি ও রূপ সম্পূর্ণভাবে সে পুরুষের মতই হবে। এভাবে গর্ভের স্তর পেরিয়ে গেলে শিশুটির বৃদ্ধির জন্য তাকে নারীর জরায়ুতে স্থাপন করতে হবে। অতঃপর স্বাভাবিক সৃষ্টি ব্যবস্থানুযায়ী নারী তাকে জন্ম দিবে। চাই তাকে ঐ নারীর জরায়ুতেই রাখা হোক যার থেকে নিউক্লিয়াস (Nucleus) নেয়া হয়েছে অথবা অন্য কোন নারীর জরায়ুতে।

উল্লেখ্য যে, ক্লোনিং এর মাধ্যমে যার ক্রোমোসোম ব্যবহার হয়ে থাকে তার সাথে দৈহিক সামঞ্জস্য সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু এতে চিন্তা-চেতনা স্বভাব-চরিত্র, সবলতা ও দুর্বলতার দিক দিয়ে এক রকম হওয়া আবশ্যক নয়। কেননা এগুলোর সম্পর্ক শুধু সৃষ্টির উপকরণের সাথে নয় বরং শিক্ষা-দীক্ষা পরিবেশ ও ভাল-মন্দের সংশ্রব এগুলোতে অধিক ক্রিয়াশীল হয়।

উক্ত তফসীল থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ক্লোনিং এর মাধ্যমে সন্তান জন্ম দিতে হলে যদিও এতে নরের প্রয়োজন হয় না কিন্তু এতেও আল্লাহ পাকের তৈরী ডিম্বের নিউক্লিয়াস (Nucleus) ও স্বাভাবিক সৃষ্টি ব্যবস্থানুযায়ী ৪৬টি ক্রোমোসোমের অস্তিত্বও আবশ্যক।

উদ্ভিদ জগতে ক্লোনিং এর প্রচলন দীর্ঘ কাল থেকে চলে আসছে। জীব জগতে এর অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতা বহু দিন থেকে চালু রয়েছে। ১৯৫২ খৃষ্ট অব্দে রবার্ট বার্গাস ও স্যার থম্‌স কিং দু'জন আমেরিকান বিজ্ঞানী ক্লোনিং এর মাধ্যমে ব্যাঙ জন্ম দেয়া সম্ভব প্রমাণিত করেছেন। ১৯৯৩ সালে মানব ক্লোনিং এর চেষ্টা শুরু হয়, কিন্তু তা সফলতা অর্জন করতে পারেনি। ১৯৯৭ সালে ভেড়ার ব্যাপারে স্কটল্যান্ডে এ অভিজ্ঞতা সফলতা অর্জন করেছে, ডলি নামক একটি ভেড়া ও আমেরিকায় দু'টি বানরের বাস্তব রূপ লাভের মাধ্যমে। বানরের দৈহিক গঠন মানুষের দৈহিক গঠনের অনেকটা নিকটবর্তী। তাই বানরের ক্লোনিং এ সফলতা অর্জনের পর মানুষের ব্যাপারেও এ ধরণের সাফল্য সম্ভব বলে মনে করা হচ্ছে। একে কেন্দ্র করে অনেকগুলো প্রশ্নের সৃষ্টি হয়।

(১) ক্লোনিংকারীকে সৃষ্টিকর্তা বলা যাবে কি?

ক্লোনিং পদ্ধতিতে জীব-জন্তু ইত্যাদি তৈরী করা সৃষ্টি ব্যবস্থা গণ্ডিতে ঢুকার ও আল্লাহ তা'আলার সাথে সৃষ্টি কাজে শরীক হওয়ার কি শামিল? যেখানে আল্লাহ তা'আলা পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন,

لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له.[৪৫৫]

455 سورة الحج، آية: ٧٣ .

অর্থ- সমগ্র সৃষ্টি জগত মিলেও একটি মাছি তৈরী করতে পারবে না।[৪৫৬]

অপর আয়াতে বলা হয়েছে,

الله خالق كل شيئ .[٤٥٧]

অর্থ- আল্লাহই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা।[৪৫৮]

আরেক আয়াতে উল্লেখ আছে,

الا له الخلق.[٤٥٩]

অর্থ- জেনে রেখো! সৃষ্টি একমাত্র তাঁরই।[৪৬০]

উত্তরঃ বলাবাহুল্য, ক্লোনিং এর মাধ্যমে সন্তান জন্মদান উক্ত আয়াত গুলোর পরিপন্থী নয়। না এটা আল্লাহ পাকের সাথে সৃষ্টি কাজে শরীক হওয়ার অন্তর্ভুক্ত; না এ কারণে মানুষকে সৃষ্টিকর্তা বলা যাবে। কারণ, ক্লোনিং সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আল্লাহর সৃষ্টি ডিম্বাণু, ক্রোমোসোম ও তাঁরই সৃষ্টি জরায়ু ব্যাবহারের মাধ্যমে উক্ত পদ্ধতিতে সন্তান জন্ম দেয়া হয়। মানুষ ডিম্বাণু, নিউক্লিয়াস ও ক্রোমোসোম সৃষ্টি করতে পারে না। অতএব মানুষ সৃষ্টিকর্তা হয় কিভাবে? যেমনঃ কেউ আল্লাহ প্রদত্ত ময়দা ও চিনির সংমিশ্রণে পিঠা তৈরী করলে তাকে এর সৃষ্টিকর্তা বলা হয় না। আল্লাহর সৃষ্ট ক্রোমোসোম ও ডিম্বাণু এবং তাঁরই সৃষ্ট জরায়ু ব্যবহার করে তথা ক্লোনিং এর মাধ্যমে সন্তান জন্ম দিলে ক্লোনিংকারীকে সৃষ্টি কর্তা বলা হবে কেন? যদি ক্লোনিং এর মাধ্যমে শিশু জন্ম দিলে মানুষ সৃষ্টিকর্তায় পরিণত হয় তাহলে ডলি জন্ম দিতে গিয়ে ২৭৮ বার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছে কেন? এর থেকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, সৃষ্টির প্রত্যেকটি চেষ্টা আল্লাহ পাকের হুকুমের আওতাধীন। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর হুকুম না হবে ততক্ষণ কোন চেষ্টাই ফলপ্রসু হবে না।

---

৪৫৬ সূরা হজ্ব, আয়াতঃ ৭৩

457 سورة الزمر، آية: ٦٢ .

৪৫৮ সূরা যুমার, আয়াতঃ ৬২

459 سورة الأعراف، آية: ٥٤.

৪৬০ সূরা আরাফ, আয়াতঃ ৫৪

(২) ক্লোনিং পদ্ধতি কি ইসলামী সৃষ্টি ধারণার পরিপন্থী?

উত্তরঃ না, ক্লোনিং পদ্ধতি ইসলামের সৃষ্টি ধারণার পরিপন্থী নয়। বরং তা হবে আল্লাহ পাকের কুদরতের বহির্প্রকাশ।

হযরত ঈসা (আ.) কে পিতা ছাড়া শুধু মা থেকে সৃষ্টি করার ঘটনা কুরআন পাকে বর্ণিত হয়েছে। ক্লোনিং এর মাধ্যমে শুধু মহিলা দ্বারা যদি কোন শিশু জন্ম দেয়া হয় তাহলে এটা কুরআনেরই সত্যায়ন হবে। ইসলামের সৃষ্টি-ধারণার পরিপন্থী হবে না।

(৩) ক্লোনিং পদ্ধতি কি জায়েয?

শিশু জন্ম দেয়ার লক্ষ্যে এমন পদ্ধতি গ্রহণ করা জায়েয হবে কিনা? এর জবাবের জন্য টেস্ট টিউব পদ্ধতি থেকে অনেকটা সাহায্য নেয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছিল যে এক মহিলার বীর্য সংগ্রহ করে তার স্বামীর বীর্যের সাথে মিশিয়ে অন্য নারীর জরায়ুতে রাখা জায়েয নেই। ক্লোনিং এর ক্ষেত্রেও একথা বলা যায় যে, কোন পুরুষ কিংবা নারীর কোষ (Cell) থেকে নিউক্লিয়াস (Nucleus) গ্রহণ করে অপর নারীর জরায়ুতে রাখাও জায়েয হবে না।

পক্ষান্তরে, যে পুরুষের শরীরের কোষ (Cell) থেকে নিউক্লিয়াস (Nucleus) গ্রহণ করা হয়েছে। তা যদি তারই স্ত্রীর জরায়ুতে স্থাপন করা হয় কিংবা যে নারীর কোষ (Cell) থেকে নিউক্লিয়াস (Nucleus) গ্রহণ করা হয়েছে তা যদি তারই জরায়ুতে স্থাপন করা হয় তাহলে তা জায়েযের আওতাভুক্ত হতে পারে।

ফাতাওয়ায়ে শামীতে আছেঃ

إذا عالج الرجل جاريته فيما دون الفرج، فأنزل، فأخذت الجارية ماءه فى شئ، فاستدخلته فرجها فى حدثان ذلك، فعلقت الجارية، وولدت، فالولد ولده، والجارية أم ولد له.[461]

---

461 رد المحتار، كتاب الطلاق، باب العدة، ٥: ٢١٣، نقلا عن البحر .

অর্থ- যদি কোন ব্যক্তি তার দাসীর সাথে লজ্জাস্থান ব্যতীত অন্যত্র সহবাস করে ও বীর্যপাত ঘটায়। এরপর দাসী সেই বীর্য কোন পাত্রে সংরক্ষণ করে রেখে পরবর্তিতে তার যোনিদ্বারে প্রবেশ করালো। ফলে সে গর্ভবতী হয়ে পড়লো এবং সন্তান প্রসব করল। এমতাবস্থায় শিশুটি ঐ পুরুষেরই হবে এবং উক্ত দাসী তার উম্মে ওয়ালাদ হিসেবে সাব্যস্ত হবে। (শামী, খ. ৫, পৃ. ২১৩)

দ্বিতীয়তঃ উক্ত পদ্ধতিটি চিকিৎসার পর্যায়ে পড়ে। নিঃসন্তান দম্পত্তির সন্তান লাভের জন্য এটি একটি অত্যাধুনিক চিকিৎসাও বটে। এর দ্বারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর বাণীর সত্যায়নও হবে। যাতে তিনি বলেছেনঃ لكل داء دواء . إلخ .[৪৬২]

অর্থ- প্রত্যেক রোগের জন্যই আল্লাহ পাক চিকিৎসা রেখেছেন।[৪৬৩]

সতর্কতা

ক্লোনিং এর ন্যায় অতি আশ্চর্য একটি আবিষ্কার মানুষের যোগ্যতা, জ্ঞান-অভিজ্ঞতার পরিচয় বহন করে। এর সাথে সাথে জ্ঞান, অনুসন্ধান ও আবিষ্কারের যোগ্যতা (যার সাথে এলমে ইলাহী তথা কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা না থাকে) একটি দু'ধারমুখী তলোয়ারের ন্যায়। এর যথার্থ ব্যবহার যেমন উপকারী, ভ্রান্ত ব্যবহার সেই পরিমাণ ধ্বংসাত্মক ও ক্ষতিকর। ইসলাম সেই গবেষণারই সহযোগিতা করে, যা সৃষ্টিজগতের জন্য উপকারী আর ঐ সমস্ত গবেষণা থেকে বারণ করে যা বিধ্বংসী ও আত্মঘাতী। বিচক্ষণতার সাথে চিন্তা করলে নিম্নে বর্ণিত কথাগুলো সামনে আসে:

---

462 أخرجه مسلم فى الطب، باب لكل داء دواء، ٢: ٢٢٥، رقم الحديث: ٥٧٠٥، عن جابر، وأحمد فى مسنده، ٣: ٣٣٥، والحاكم فى المستدرك، ٤: ١٩٩، والبيهقى فى السنن الكبرى، ٩: ٣٤٣ .

৪৬৩ সহীহ মুসলিম, খ. ২, পৃ. ২২৫, হাদীস নং ৫৭০৫, মুসনাদু আহমাদ, খ. ৩, পৃ. ৩৩৫, আল মুস্তাদরাক লিল হাকেম, খ. ৪. পৃ. ১৯৯, আস সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী, খ. ৯, পৃ. ৩৪৩

এক. মানুষের ব্যাপারে ক্লোনিং হবে একটি ভয়ানক ক্ষতিকর অভিজ্ঞতা। এর ফলে সন্তানের জন্য বিবাহের প্রয়োজন হ্রাস পাবে। ফলে সামাজিক বহু সমস্যার সৃষ্টি হবে। ক্লোনিং এর মাধ্যমে যারা জন্ম নিবে, তারা নিজ পরিবার থেকে বঞ্চিত হবে। এতে পারিবারিক ব্যবস্থায় অনেক বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। ইসলামে বিবাহকে অপরিসীম গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং যিনাকে করা হয়েছে হারাম। এতে বংশের হিফাযত ও পারিবারিক ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ হয়। ক্লোনিং পদ্ধতি চালু হলে এই নিয়ম-নীতিতে ধস নেমে আসবে।

দুই. অপরাধপ্রবণ এবং পেশাদার অপরাধীরা তাদের ন্যায় শিশু তৈরী'র চেষ্টা করবে যাতে অতি সহজে অন্যকে ধোঁকা দেয়া যায়। এর মাধ্যমে যে সব শিশুর জন্ম হবে, সেসব শিশুর প্রাকৃতিক-স্বাভাবিক অনেক যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত হওয়ার প্রবল আশংকা রয়েছে। অতএব, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সৃষ্টির যে সাধারণ পদ্ধতি রেখেছেন তা বাদ দিয়ে অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম কোন পথ অন্বেষণ করা হবে বোকামি ও মানবতার প্রতি চরম জুলুম। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সর্বক্ষেত্রে ও সর্বাবস্থায় আমাদের সহায় হোন। আমীন!

তিন. এর দ্বারা যিনার পথ খোলার প্রবল আশংকা রয়েছে, কোন নারী যিনার মাধ্যমে বাচ্চা গ্রহণ করে দাবি করতে পারবে যে, আমি এ বাচ্চা ক্লোনিং এর মাধ্যমে গ্রহণ করেছি। যদিও তার এ মিথ্যা দাবি সন্তান জন্ম গ্রহণের পর ধরা পড়ে যাবে। কারণ ক্লোনিং এর মাধ্যমে সন্তান হলে হুবহু ঐ মহিলার সূরতের ও আকৃতির হবে। পক্ষান্তরে যিনার হলে তার আকৃতির হবে না। তথাপিও কিছু দিনের জন্য হলেও সে বাহানা দেয়ার সুযোগ পেয়ে যাবে। অতএব, যার নিউক্লিয়াস (Nucleus) নেয়া হয়েছে, তারই জরায়ুতে স্থাপন করার সূরতে ক্লোনিংকে ফাতওয়ার দৃষ্টিতে জায়েয বলা হলেও سدا للذرائع ও طردا للباب তথা গুনাহ ও বাহানার পথ বন্ধ করার লক্ষ্যে ব্যাপক হারে এ পদ্ধতি জায়েয হওয়ার ফাতাওয়া না দেয়া

চাই। বরং নিষেধ করাই শ্রেয়। মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী জেদ্দা থেকেও হারাম হওয়ার ফাতওয়া প্রদান করা হয়েছে।[৪৬৪]

(৪) ক্লোনিংকৃত বাচ্চার বংশ, মীরাছনীতি ও হুরমাতে মুছাহারাত

যদি কেউ ক্লোনিং পদ্ধতিতে জন্ম দেয় তাহলে এ সন্তানের বংশ, মীরাছনীতি ও হুরমাতে মুছাহারাত এর বিধান কী হবে?

উত্তরঃ মাসআলাটিকে আট ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা-

১. স্বামীর শরীরের কোষ (Cell) থেকে নিউক্লিয়াস (Nucleus) গ্রহণ করে স্ত্রীর ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াস (Nucleus) এর সাথে সংমিশ্রণ করা হয়েছে এবং তার স্ত্রীর জরায়ুতেই স্থাপন করা হয়েছে।

এ সূরতের হুকুম হল, ঐ স্বামী-স্ত্রী থেকেই উক্ত ক্লোনিংকৃত বাচ্চার বংশ ও মীরাছনীতি ধরা হবে এবং তারা উভয়ই ঐ বাচ্চার পিতা-মাতা হিসেবে ধর্তব্য হবে। অতএব, তাদের বিবাহ-শাদী ও মীরাছনীতিতে কোন পরিবর্তন আসবে না।

২. স্বামীর শরীরের কোষ (Cell) থেকে নিউক্লিয়াস (Nucleus) গ্রহণ করে তারই স্ত্রীর ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াস (Nucleus) এর সাথে সংমিশ্রণ করে অন্য নারীর জরায়ুতে স্থাপন করা হয়েছে।

এ সূরতের হুকুম হল, যার জরায়ুতে স্থাপন করা হয়েছে ক্লোনিংকৃত বাচ্চার বংশ ও মীরাছনীতি তার থেকেই ধরা হবে। আর তার স্বামী থাকলে তার থেকেও ধরা হবে। অতএব, মীরাছের সম্পর্ক তাদের সাথে হবে। তবে যাদের কোষ (Cell) ও ডিম্বাণু থেকে নিউক্লিয়াস (Nucleus) গ্রহণ করা হয়েছে তাদের সাথে বংশ ও মীরাছনীতি সাব্যস্ত হবে না। তবে হুরমাতে মুছাহারাত সাব্যস্ত হবে।

---

৪৬৪ দেখুন, ক্বারারাতু মাজাল্লাতি মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী, জেদ্দা, পৃ. ৫৫, সংখ্যা. ১০, খ. ৩, পৃ. ৪১৫, কারার নং ১০০/২/১১০

قرارات مجمع الفقه الإسلامي ، ص: ٥٥ ، العدد: ١٠، الجزء : ١٠ ، رقم القرار : ١١٠/٢/١٠٠ .

৩. পর পুরুষের শরীরের কোষ (Cell) থেকে নিউক্লিয়াস (Nucleus) গ্রহণ করার পর কোন নারীর ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াস (Nucleus) এর সাথে সংমিশ্রণ করে তারই জরায়ুতে স্থাপন করা হয়েছে।

এ সূরতের হুকুম হল, ক্লোনিংকৃত বাচ্চার বংশ ও মীরাছনীতি এ নারী থেকে ধরা হবে। পুরুষ থেকে হবে না। আর যে পুরুষের শরীরের কোষ (Cell) থেকে নিউক্লিয়াস (Nucleus) গ্রহণ করা হয়েছে তার সাথে বংশ ও মীরাছনীতি সাব্যস্ত হবে না। তবে হুরমাতে মুছাহারাত সাব্যস্ত হবে।

৪. এক পুরুষের শরীরের কোষ (Cell) থেকে নিউক্লিয়াস (Nucleus) গ্রহণ করে আরেক নারীর ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াস (Nucleus) এর সাথে সংমিশ্রণ করে। তৃতীয় এক নারীর জরায়ুতে স্থাপন করা হয়েছে।

এ সূরতের হুকুম হল, ক্লোনিংকৃত বাচ্চার বংশ ও মীরাছনীতি শুধু ঐ মহিলা থেকেই ধরা হবে যার জরায়ুতে স্থাপন করা হয়েছে। যাদের থেকে কোষ (Cell) ও ডিম্বাণু থেকে নিউক্লিয়াস (Nucleus) গ্রহণ করা হয়েছে তাদের থেকে ধরা হবে না। তবে তাদের সাথে হুরমাতে মুছাহারাত সাব্যস্ত হবে।

৫. যে নারীর শরীরের কোষ (Cell) থেকে নিউক্লিয়াস (Nucleus) গ্রহণ করা হয়েছে তা তারই ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াস (Nucleus) এর সাথে সংমিশ্রণ করে অন্য নারীর জরায়ুতে স্থাপন করা হয়েছে।

এ সূরতের হুকুম হল, ক্লোনিংকৃত বাচ্চার বংশ ও মীরাছনীতি ঐ মহিলা থেকে ধরা হবে যার জরায়ুতে স্থাপন করা হয়েছে। আর তার স্বামী থাকলে তার স্বামী থেকেই বংশ ও মীরাছনীতি ধরা হবে। যে মহিলার নিউক্লিয়াস (Nucleus) ও ডিম্বাণু গ্রহণ করা হয়েছে তার থেকে হবে না। তেমনি ভাবে তার স্বামী থেকেও হবে না। তবে তাদের সাথে হুরমাতে মুছাহারাত সাব্যস্ত হবে।

৬. এক নারীর শরীরের কোষ (Cell) থেকে নিউক্লিয়াস (Nucleus) গ্রহণ করে অন্য নারীর ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াস (Nucleus) এর সাথে সংমিশ্রণ করে প্রথম নারীর জরায়ুতে স্থাপন করা হয়েছে।

এ সূরতের হুকুম হল, যার জরায়ুতে রাখা হয়েছে ক্লোনিংকৃত বাচ্চার বংশ ও মীরাছনীতি তার থেকে সাব্যস্ত হবে। দ্বিতীয় নারীর থেকে হবে না। তবে তার সাথে হুরমাতে মুছাহারাত সাব্যস্ত হবে।

৭. এক নারীর শরীরের কোষ (Cell) থেকে নিউক্লিয়াস (Nucleus) গ্রহণ করে আরেক নারীর ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াস (Nucleus) এর সাথে সংমিশ্রণ করে দ্বিতীয় নারীর জরায়ুতে স্থাপন করা হয়েছে।

এ সূরতের হুকুম হল, দ্বিতীয় নারীর সাথেই ক্লোনিংকৃত বাচ্চার বংশ ও মীরাছনীতি সাব্যস্ত হবে। প্রথম নারীর সাথে হবে না। তবে তার সাথে হুরমাতে মুছাহারাত সাব্যস্ত হবে।

৮. এক নারীর শরীরের কোষ (Cell) থেকে নিউক্লিয়াস (Nucleus) গ্রহণ করে আরেক নারীর ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াস (Nucleus) এর সাথে সংমিশ্রণ করে তৃতীয় অপর এক নারীর জরায়ুতে স্থাপন করা হয়েছে।

এ সূরতের হুকুম হল, তৃতীয় নারীর সাথেই ক্লোনিংকৃত বাচ্চার বংশ ও মীরাছনীতি সাব্যস্ত হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় নারীর সাথে হবে না। তবে এ দু'জনের সাথে হুরমাতে মুছাহারাত সাব্যস্ত হবে।

উপরোক্ত আটটি সূরতের হুকুমের দলীল নিম্নরূপঃ

আল্লাহ পাক বলেনঃ

ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم.[465]

অর্থ- ওদের মা তারাই যারা ওদেরকে প্রসব করেছে।[৪৬৬]

---

465 سورة المجادلة، آية: ٢ .

৪৬৬ সূরা মুজাদালা, আয়াত: ২

উক্ত আয়াতের ভাষ্যানুযায়ী প্রসবকারিণী তার মা সাব্যস্ত হয় বিধায় মীরাছ ও বিবাহ-শাদী ইত্যাদি সম্পর্কিত সকল মাসআলার সম্পর্ক তার সাথে হওয়াটা পরিস্কার।

পক্ষান্তরে, যাদের শরীরের কোষ (Cell) থেকে নিউক্লিয়াস (Nucleus) গ্রহণ করার পরেও বংশ ও মীরাছনীতি সাব্যস্ত হয়নি এর কারণ হাদীস শরীফে আছেঃ

عن عائشة–رضي الله تعالى عنها–، أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص عبد بن زمعة فى غلام، فقال سعد: هذا، يارسول الله! ابن أخى عتبة بن أبى وقاص عهد إليَّ أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخى، يارسول الله! ولد على فراش أبى من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه، فرآى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك، ياعبد! الولد للفراش، وللعاهر الحجر.[٤٦٧]

অর্থ- হযরত আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করেন, সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাস ও আবদ বিন যাম'আ একটি বাচ্চা নিয়ে বিবাদ করে। সা'আদ বলছেঃ হে আল্লাহর রাসূল! ছেলেটি আমার ভাতিজা, কেননা আমার ভাই আতাবা বিন আবী ওয়াক্কাস আমাকে বলে গেছে যে, ছেলেটি তার। আপনি তার চেহারার দিকে দেখুন, তার ও আমার ভাই আতাবার চেহারা একেবারে এক রকম। আর আবদ বিন যাম'আ বলছেঃ হে আল্লাহর রাসূল! ছেলেটি আমার ভাই। সে আমার পিতার দাসীর ঘরে জন্ম নিয়েছে। অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ছেলেটির দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে, সে একেবারে আতাবার মত। এতদসত্ত্বেও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সিদ্ধান্ত দিলেন যে, হে আবদ! ছেলেটি তোমার (ভাই)। কেননা যার ঘরে জন্ম নেয় সন্তান তারই হয়। যিনাকারির হয় না। সে বঞ্চিত থাকে, তার জন্য তো পাথর।[৪৬৮]

---

467 أخرجه مسلم فى الرضاع، باب الولد للفراش، ١: ٤٧١، رقم الحديث: ٣٥٩٢ .

৪৬৮ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৪৭১, হাদীস নং ৫৮৯২

আসল ঘটনাটি এই যে, জাহেলিয়্যাতের যুগে আতাবা যাম'আর দাসীর সাথে যিনা করে। আর ঐ যিনার দ্বারা একটি সন্তান জন্ম নেয় এবং সে যিনাকারী আতাবার স্পষ্ট সাদৃশ্যও ছিল। এরপরও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ছেলেটি যাম'আরই বলে সিদ্ধান্ত দিলেন। কেননা যিনাকারিণী মহিলা ঐ সময় যাম'আর দাসী ছিল।

অতএব, এখানেও অবৈধ পন্থায় হওয়ার কারণে বাচ্চা শুধু ঐ মহিলারই হবে যার জরায়ুতে রাখা হয়েছে। যার নিউক্লিয়াস (Nucleus) নেয়া হয়েছে তার হবে না। তাই তার সাথে মীরাছের সম্পর্কও হবে না।

ঘটনার অপর আরেকটি রেওয়ায়েতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, এ ছেলেটির মীরাছের সম্পর্কও যাম'আর সাথে হবে। যিনাকারী আতাবার সাথে হবে না।

عن ابن الزبير: أن زمعة كانت له جارية، وكان يطئها، وكانوا يتهموها، فولدت، فقال النبى صلى الله عليه وسلم لسودة: أما الميراث فله، وأما أنت فاحتجبى منه ياسودة، فإنه ليس لك بأخ.[٤٦٩]

অর্থ- ইবনে যুবায়ের বর্ণনা করেন, যাম'আর একজন দাসী ছিল, সে তার সাথে মেলা-মেশা করত, লোকেরা তাকে যিনার অপবাদ দেয় এবং এর দ্বারা তার একটি বাচ্চাও হয়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম (যাম'আর মেয়ে উম্মুল মুমিনীন) হযরত সাওদা (রাযি.) কে বললেনঃ সে যাম'আর মীরাছ পাবে, কেননা সে যাম'আর দাসীর ঘরে জন্ম নিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে যেহেতু সে তোমার ভাই নয় তাই তুমি তার থেকে পর্দা করবে।[৪৭০]

উক্ত হাদীসে ঐ বাচ্চাটি আতাবার বীর্য থেকে জন্ম নেয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তার সাথে মীরাছের সম্পর্ক না

---

469 أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه، باب الرجلان يدَّعِيان الولد، ٧: ٤٤٣/٣٥٤، رقم الحديث: ١٣٨٩٥، وأحمد فى مسنده، ٤: ٥، رقم الحديث: ١٦٢٢٦ .

৪৭০ মুসান্নাফু আবদির রায্যাক, খ. ৭, পৃ. ৩৫৪/৪৪৩, হাদীস নং ১৩৮৯৫, মুসনাদু আহমাদ, খ. ৪, পৃ. ৫, হাদীস নং ১৬২২৬

হওয়ার সিদ্ধান্ত দিলেন। অতএব, ক্লোনিং এর ব্যাপারেও একই হুকুম হবে। তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিমে উল্লেখ আছেঃ

ثم أنه صلى الله عليه وسلم ألحق الولد بالفراش فى هذه الصورة التى يشهد فيها الظاهر لغير الفراش، فثبت أن النسب لايبتنى على حقيقة العلوق، وإنما يدور مع الفراش، ولوكان ظاهر الحال يشهد أن الولد من الزنا، وليس فى الصورة المبحوث عنها الاشتباه الظاهر بخلاف الفراش، وقد نص الحديث على ترك اعتباره.[٤٧١]

অর্থ- প্রকাশ্য ঘটনায় বাচ্চা ফেরাশের বিপক্ষে হওয়া সত্ত্বেও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বাচ্চাকে ফেরাশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সিদ্ধান্তই প্রদান করলেন। ফলে সাব্যস্ত হলো নসব (ও মীরাছ) এর ভিত্তি বাস্তব বীর্যের উপর নির্ভর করে না। বরং তা নির্ভর করে ফেরাশের উপর। যদিও এ কথা স্পষ্ট যে, বাচ্চা যিনার মাধ্যমে যিনাকারীর বীর্য থেকেই জন্ম নিয়েছে। এতদসত্ত্বেও হাদীস তা প্রত্যাখ্যান করল।[৪৭২]

তবে যাদের কোষ (Cell) থেকে নিউক্লিয়াস (Nucleus) গ্রহণ করার পরেও বংশ ও মীরাছনীতি সাব্যস্ত হয়নি তাদের সাথে ক্লোনিংকৃত বাচ্চার হুরমাতে মুছাহারাত সাব্যস্ত হবে। কেননা হুরমাতে মুছাহারাতের আসল কারণ (سبب) হল, 'বাচ্চা' তথা جزئية وبعضية বা পারস্পরিক অংশাঅংশী এর সম্পর্ক। আর তা এখানে বিদ্যমান। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য 'নাজায়েয টেস্ট টিউব বেবি ও হুরমাতে মুছাহারাত' দ্রষ্টব্য।

***

---

471 تكملة فتح الملهم، ١: ٨٠ .

৪৭২ তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, খ. ১. পৃ. ৮০

ডাক্তার ও হুরমাতে মুছাহারাত

যদি কোন ডাক্তার কামভাব ব্যতীত কোন প্রাপ্তবয়স্কা মহিলাকে স্পর্শ করে অথবা তার যোনিদ্বারের ভিতরাংশ দেখে এতদসত্ত্বেও ঐ মহিলার সাথে উক্ত ডাক্তারের 'হুরমতে মুছাহারাত' (حرمة مصاهرة) সাব্যস্ত (ثابت) হবে না। অর্থাৎ ঐ ডাক্তারের জন্য উক্ত মহিলার মা, দাদী, নানী ও তার কোন সন্তানাদির (তথা اصول وفروع) কে বিবাহ করা হারাম হবে না। কারণ 'হুরমাতে মুছাহারাত' সাব্যস্ত হওয়ার জন্য কোন প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলাকে ধরা-ছোঁয়া অথবা তার যোনিদ্বারের ভিতরাংশ দেখার সময় কাম-ভাব তথা যৌন উত্তেজনা (شهوة) থাকা আবশ্যক। ধরা, স্পর্শ কিংবা দেখার দ্বারা বা পরে (شهوة) তথা কামভাবের জন্ম হলে 'হুরমাতে মুছাহারাত' সাব্যস্ত হয় না।

فى الدر المختار (كتاب النكاح ، فصل المحرمات مع الرد ، ٤: ١٠٨) : والعبرة للشهوة عند المس والنظر ، لا بعدهما .

وفى فتح القدير (٣: ٢١٣) : وقوله : "بشهوة" فى موضع الحال ، فيفيد اشتراط الشهوة حال المس ، فلو مسَّ بغير شهوة، ثم اشتهى عن ذلك المس ، لا تحرم عليه ، إلخ .

وفى البحر الرائق (٣: ٧٨) : وكذالك فى النظر (أى: إلى داخل الفرج) ، إلخ .

وفى رد المحتار (٤: ١٠٨) : فلو اشتهى بعد ما غض بصره لاتحرم .

অর্থ- 'আদ্দুররুল মুখতারে' আছে, (হুরমতে মুছাহারাত সাব্যস্ত হওয়ার জন্য) ঐ شهوة তথা কাম-ভাব ধর্তব্য হবে যা ধরা, স্পর্শ কিংবা দেখার সময় থাকে, পরে সৃষ্টি হলে হবে না। 'ফাতহুল কাদীরে' আছেঃ ধরা বা স্পর্শ করার সময় কাম-ভাব থাকা শর্ত। যদি কাম-ভাব ব্যতীত ধরে বা স্পর্শ করে আর এ ধরা বা স্পর্শ করার কারণে কাম-ভাব সৃষ্টি হয়

তাহলে হারাম হবে না তথা হুরমতে মুছাহারাত সাব্যস্ত হবে না। 'আল বাহরুর রায়িকে' আছে যে, দেখার বেলায়ও একই শর্ত। 'রদ্দুল মুহতার' এ (ফাতাওয়ায়ে শামীতে) আছে যদি দেখার পরে কাম-ভাবের সৃষ্টি হয় তাহলে হারাম হবে না।[৪৭৩]

তবে যদি কোন ডাক্তারের আগেই কাম-ভাব হয়ে যায়, অতঃপর স্পর্শ করে কিংবা যোনিদ্বারের ভিতরাংশ দেখে তাহলে এতে 'হুরমাতে মুছাহারাত' (حرمة مصاهرة) সাব্যস্ত (ثابت) হয়ে যাবে।

❖ ❖ ❖

৪৭৩ আদ্দুররুল মুখতার [রদ্দুল মুহতার সংযুক্ত], খ. ৪, পৃ. ১০৮, ফাতহুল কাদীর, খ. ৩, পৃ. ২১৩, আল বাহরুর রায়িক, খ. ৩, পৃ. ৭৮, রদ্দুল মুহতার, খ. ৪. পৃ. ১০৮

কন্যা ও পুত্র সন্তান জন্মের রহস্য

অজ্ঞতার দরুন মেয়ে শিশু জন্ম দেয়ার কারণে অনেকেই স্ত্রীকে দায়ী করে থাকে। এ ভুল ধারণার প্রেক্ষিতে বহু পরিবারে কলহ দেখা দেয়। এমনকি এর জের ধরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ পর্যন্ত ঘটতে দেখা যায়। অথচ এর জন্য স্ত্রী মোটেও দায়ী নয়। এ ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আল্লাহ পাকের কুদরতের উপর নির্ভরশীল। তিনি বলেনঃ

يهب لمن يشاء إناثا و يهب لمن يشاء الذكور.[٤٧٤]

অর্থ- তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন।[৪৭৫]

মহিলাদের তলপেটে জরায়ুর দু'পার্শ্বে ২টি ডিম্বাশয় (Ovary) থাকে, এ ডিম্বাশয়ের কাজ হল (প্রাপ্ত বয়স্কা হওয়ার পর) ডিম্বাণু (Ovum) প্রস্তুত করা ও ফুটানো এবং স্ত্রী হরমোন (Estrogen ও Progesterone) তৈরী ও নিঃসরণ।

সাধারণত মহিলাদের মাসিক চক্রের (Menstrual Cycle) মাঝামাঝি সময়ে ডিম্বাশয় থেকে একটি পরিপক্ক ডিম্বাণু বের হয়। এভাবে প্রতি মাসিক চক্রেই ডিম্বাণু জন্ম হতে থাকে।

আর পুরুষের অন্ডকোষের কাজ হল (প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর) শুক্রকীট (Spermatazoa) তৈরী করা এবং হরমোন (Testosterone) প্রস্তুত ও নিঃসরণ। প্রতিনিয়ত লক্ষ লক্ষ শুক্রকীট অন্ডকোষে তৈরী হয় ও বীর্যের সাথে মিলিত হয়। প্রতিবার বীর্যপাতের সাথে কোটি কোটি শুক্রকীট বের হয়ে আসে। কিন্তু সন্তান জন্মের জন্য পুরুষের এ কোটি কোটি শুক্রকীটের মধ্যে শুধুমাত্র একটি শুক্রকীট নারীর ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হওয়ার প্রয়োজন পড়ে। তাই যৌনক্রিয়াকালে এ কোটি কোটি শুক্রকীট সর্বাগ্রে স্ত্রীর ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করে যোনিপথ হতে জরায়ুর দিকে দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে। এভাবে যে

---

474 سورة شورى ، آية: ٤٩ .

৪৭৫ সূরা-শুরা, আয়াত নং ৪৯

শুক্রকীটটি প্রথমে নারীর ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হতে পারে পরবর্তীতে এর দ্বারাই সন্তানের জন্ম হয়। একাধিক শুক্রকীট মিলিত হতে পারলে একাধিক সন্তানের জন্ম হয়। আর বাকি শুক্রকীটগুলো পথেই বিনষ্ট হয়ে যায়। কারণ এ পথে এসিড জাতীয় এক ধরণের পদার্থ থাকে যা শুক্রকীটগুলোকে জ্বালিয়ে নষ্ট করে দেয়। যদি এগুলো নষ্ট না হত তাহলে মায়ের পেটে একসাথে কোটি কোটি সন্তান জন্ম নিত, আর এভাবে সন্তান জন্মালে এরা এত ক্ষুদ্রাকারের মানুষ হত। যাদেরকে অনুবিক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখাও কঠিন হত।

فتبارك الله أحسن الخالقين. [٤٧٦]

অর্থ- নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা কত কল্যাণময়।[৪৭৭]

সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণে ক্রোমোসোম

মানব দেহের প্রতিটি নিউক্লিয়াস (Nucleus) তথা দেহ কোষে ৪৬টি ক্রোমোসোম থাকে। তন্মধ্য হতে ৪৪টি নারী-পুরুষ উভয়ের একই রকম হয়। যা দেখতে ইংরেজি X বর্ণের ন্যায় দেখায়। এগুলোকে অটোসোম বলা হয়। এগুলো দেহের গঠনপ্রণালী ও জৈবিক কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। বাকি দুইটি ক্রোমোসোম ভিন্ন থাকে। যাকে সেক্স ক্রোমোসোম বলা হয়। এ এক জোড়া ক্রোমোসোমই সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ করে।

নারীর ডিপ্লয়েড কোষে দু'টি লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোসোমই থাকে ইংরেজি X বর্ণের ন্যায় (X X) আর পুরুষের দু'টি লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোসোমের মধ্যে একটি থাকে X বর্ণের ন্যায় আর অপরটি থাকে Y বর্ণের ন্যায় (X Y)।

গর্ভধারণকালে X ক্রোমোসোম বাহী শুক্রাণু যদি নারীর ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করে তবে নিষিক্ত ডিম্বের ক্রোমোসোম হবে XX , এতে সন্তান হবে কন্যা। আর যদি Y ক্রোমোসোম বাহী শুক্রাণু নারীর ডিম্বাণুকে

---

476 سورة المؤمنون، آية: ١٤ .

৪৭৭ সূরা আল মুমিনূন, আয়াত: ১৪

নিষিক্ত করে তবে নিষিক্ত ডিম্বের ক্রোমোসোম হবে X Y , ফলে সন্তান হবে পুত্র।

পুরুষের কোন্ শুক্রাণু X না Y নারীর ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করবে তা সম্পূর্ণ আল্লাহ পাকের ইচ্ছাধীন। এখানে নারী-পুরুষের কোন হাত নেই যে, এরা চাইলেই পুরুষের Y ক্রোমোসোম দিয়ে নারীর ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করবে, আর পুত্র সন্তান জন্ম দিবে মোটেও সম্ভব নয়। যার পুত্র সন্তান হয় না এখানে তার কিছুই করার নেই। বিষয়টি সম্পূর্ণ আল্লাহ পাকের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।[৪৭৮]

অতএব কন্যা সন্তান জন্ম হলে নারীকে দোষারোপ করে কলহ সৃষ্টি করা মোটেও উচিত নয়। এটা একটি কুসংস্কার ও অজ্ঞতার পরিচয় মাত্র।

---

৪৭৮ পুত্র সন্তান হওয়ার তাদবীর :মিলনের সময় যদি এভাবে নিয়্যাত করে যে, হে আল্লাহ! এ মিলনের দ্বারা যে সন্তান হবে তার নাম রাখব "মুহাম্মাদ", তাহলে আল্লাহর রহমতে পুত্র সন্তান হয়। [পরিক্ষিত]

৩য় অধ্যায়

الطب الحديث و ضابط المفطرات
আধুনিক চিকিৎসা ও রোযা ভঙ্গের বিধান
Modern Medical Treatment & Principles of Fast Breaking

কিছু কিছু চিকিৎসা এমন আছে যা গ্রহণ করলে রোযা ভেঙ্গে যায়, আবার কিছু কিছু চিকিৎসা এমন রয়েছে যা গ্রহণ করলে রোযা ভঙ্গ হয় না। বর্তমানে এমন বহু আধুনিক চিকিৎসা আবিস্কৃত হয়েছে যা পূর্বের যুগে ছিল না, তাই নতুন আবিস্কৃত চিকিৎসার বিধান পুরাতন কিতাবাদিতে পাওয়া যায় না বিধায় এ ব্যাপারে নতুন করে গবেষণার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ইসলামী ফিকাহশাস্ত্রবিদগণ চিকিৎসা ও রোযা ভাঙ্গা বা না ভাঙ্গার বিষয়ে তাদের রচিত কিতাবাদিতে যথেষ্ট আলোচনা করেছেন। কিন্তু তা তাদের যুগে প্রচলিত চিকিৎসাবিজ্ঞানের আলোকে ছিল। (যেমন ঢুস, শিঙা ও দাগ লাগানো ইত্যাদি) বর্তমান যুগ হল চিকিৎসাবিজ্ঞানের উৎকর্ষের যুগ। এ যুগের চিকিৎসা পদ্ধতি অনেকটা সঠিক ও বাস্তব সম্মত। পক্ষান্তরে, পূর্বের চিকিৎসা পদ্ধতি ছিল অনেকটা ধারণা নির্ভর। সুতরাং দু'যুগের চিকিৎসাবিজ্ঞানের মাঝে বিস্তর পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। এজন্যই দেখা যায় বিভিন্ন অঙ্গের গঠন প্রণালী সম্পর্কে আদি যুগের অনুমান ভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতি যে ধারণা দিয়েছে বর্তমানে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি তা অস্বীকার করছে। তাই রোযা ভাঙ্গা না ভাঙ্গার ব্যাপারে পূর্ব ও বর্তমান যুগের ফকীহদের মধ্যে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

উল্লেখ্য যে, পূর্ব যুগের ফকীহদের আলোচনা ইসলামী শরীআতের মূলনীতি তথা কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের আলোকে ছিল বিধায় তারা আমাদের জন্য এমন কিছু ضابطة বা মূলনীতি ও مثال তথা দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন যার উপর ভিত্তি করে উভয় যুগের চিকিৎসাবিজ্ঞানের মাঝে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও রোযা ভাঙ্গা ও না ভাঙ্গার ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে

উপনীত হওয়া অসাধ্যের কিছু নয়। তাদের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত ও বর্ণনাকে সামনে রেখে রোযা ভাঙ্গা ও না ভাঙ্গার ব্যাপারে কিছু ضابطة ও মূলনীতি উদ্‌ঘাটন করে তা নিম্নে পেশ করা হল।

দেহের অভ্যন্তরে কোন বস্তু প্রবেশের দিক দিয়ে রোযা ভাঙ্গা ও না ভাঙ্গার কিছু মূলনীতি (Principles / ضوابط)

এ ব্যাপারে ফকীহগণ ঐক্যমত পোষণ করেন যে, ততক্ষণ পর্যন্ত রোযা ভঙ্গ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত পাঁচটি বস্তু একত্রিত না হবে। অর্থাৎ কোন বস্তু দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেই রোযা ভঙ্গ হয় না। যে পর্যন্ত-

১. রোযা ভঙ্গের কোন গ্রহণযোগ্য বস্তু (الواصل المعتبر) প্রবেশ না করবে।
২. কোন গ্রহণযোগ্য খালী জায়গা (الجوف المعتبر) এ না পৌঁছাবে।
৩. কোন গ্রহণযোগ্য রাস্তা বা ছিদ্র (المنفذ المعتبر) দিয়ে না পৌঁছাবে।
৪. কোন গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি (الوصول المعتبر) তে না পৌঁছাবে।
৫. রোযা ভঙ্গ হওয়ার পরিপন্থী ও প্রতিবন্ধক কোন বস্তু (المانع المعتبر) অনুপস্থিত না থাকবে।

উপরোক্ত পাঁচটি বস্তু সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হলঃ

১. গ্রহণযোগ্য বস্তুর প্রবেশ (الواصل المعتبر) অর্থাৎ যে কোন বস্তু দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেই রোযা ভঙ্গ হবে না বরং শরীআতের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য কিছু বস্তুর প্রবেশে রোযা ভঙ্গ হবে, সুতরাং সে বস্তুগুলোর নির্ধারণ আবশ্যক।

২. দেহের অভ্যন্তরের গ্রহণযোগ্য খালিস্থান (الجوف المعتبر) অর্থাৎ দেহের ভিতরের যে কোন খালিস্থানেই যে কোন বস্তু প্রবেশ করলে রোযা ভঙ্গ হবে না। রোযা ভঙ্গ হতে হলে শরীআতের দৃষ্টিতে جوف معتبر তথা গ্রহণযোগ্য খালিস্থানে রোযা ভঙ্গকারী কোন বস্তু প্রবেশ করতে হবে। আর গ্রহণযোগ্য খালিস্থান কোনটি প্রথমে তার নির্ধারণ আবশ্যক।

৩. দেহের বাহির থেকে ভিতরে প্রবেশের গ্রহণযোগ্য বিশেষ পথ ও ছিদ্র (المنفذ المعتبر) অর্থাৎ যে কোন রাস্তা বা পথ দিয়ে কোন বস্তু প্রবেশ করলেই রোযা ভাঙ্গবে না বরং কিছু নির্দিষ্ট রাস্তা বা পথ আছে যেগুলোর মাধ্যমে প্রবেশ করলে রোযা ভঙ্গ হবে। সে নির্দিষ্ট গ্রহণযোগ্য রাস্তা কোনটি তা নির্ধারণ করা আবশ্যক।

৪. গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে প্রবেশ (الوصول المعتبر) অর্থাৎ যে কোন পদ্ধতিতে কোন কিছু প্রবেশ করলেই রোযা ভাঙ্গবে না বরং কিছু বিশেষ পদ্ধতি আছে সে পদ্ধতিতে প্রবেশ করলে রোযা ভাঙ্গবে। তাই সে পদ্ধতিগুলোর নির্ধারণ আবশ্যক।

৫. গ্রহণযোগ্য প্রতিবন্ধকের অনুপস্থিতি (المانع المعتبر) অর্থাৎ এমন কিছু বিষয়-বস্তু আছে যার উপস্থিতিতে রোযা ভাঙ্গবে না বরং রোযা ভঙ্গ হতে হলে সে গুলোর অনুপস্থিতি আবশ্যক। তাই সে সব প্রতিবন্ধক ও অন্তরায় বিষয়গুলো কি তা জেনে নিতে হবে।

পূর্বের আলোচনা সহজে বুঝার জন্য নিম্নে ধারাবাহিকভাবে বিষয়গুলোর উপর আলোকপাত করা হল। তবে এর পূর্বে রোযার আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা ইত্যাদি সম্পর্কে জানা প্রয়োজন; এতে পরবর্তী আলোচনা বুঝতে সুবিধা হবে।

সাওম এর আভিধানিক সংজ্ঞা (تعريف الصوم لغة)

الصوم لغة: هو الإمساك.[٤٧٩]

অর্থ- 'সাওম' এর আভিধানিক অর্থ- 'বিরত থাকা'।[৪৮০]

সাওমের পারিভাষিক সংজ্ঞা (تعريف الصوم شرعاً)

الصوم فى الشريعة: عبارة عن إمساك مخصوص، وهو الكف عن قضاء الشهوتين: شهوة البطن، وشهوة الفرج، من شخص مخصوص، وهو أن يكون

---

479 تاج العروس، ١٧: ٤٢٣، المبسوط للسرخسى، ٣: ٥٤ .

৪৮০ তাজুল আরূস, খ. ১৭, পৃ. ৪২৩, আল মাবসূত, খ. ৩, পৃ. ৫৪

مسلما طاهراً من الحيض والنفاس، فى وقت مخصوص، وهو ما بعد طلوع الفجر إلى وقت غروب الشمس، بصفة مخصوصة، وهو أن يكون على قصد التقرب.[٤٨١]

অর্থ- কোন মুসলমানের হায়েয-নেফাস থেকে পবিত্র হয়ে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ছাওয়াবের উদ্দেশ্যে পানাহার ও যৌন চাহিদা মেটানো থেকে বিরত থাকাকে শরীআতের দৃষ্টিতে সাওম বা রোযা বলে।[৪৮২]

পেট ও শরীরের অভ্যন্তরের খালি স্থানের অর্থ (معنى الجوف والبطن)

রোযা ভাঙ্গা ও না ভাঙ্গার সাথে جوف ও بطن এর সম্পৃক্ততা অপরিহার্য বিধায় جوف ও بطن দ্বারা কি বুঝায় তা প্রথমে জানা আবশ্যক। আভিধানিক অর্থে, দেহের অভ্যন্তরের যে কোন খালিস্থানকে ‘جوف’ বলা হয়।[৪৮৩]

তেমনিভাবে প্রত্যেক বস্তুর খালিস্থান কে ‘بطن’ বলা হয়।[৪৮৪]

---

481 المبسوط لشمس الأئمة السرخسى، ٣: ٥٤ .

৪৮২ আল মাবসূত, খ. ৩, পৃ. ৫৪

৪৮৩ আল-মু’জামুল অসীত, পৃ. ১৪৭-১৪৮

৪৮৪ আল-ইফছাহ, খ. ১, পৃ. ৮৫, তাজুল আরূস, খ. ৯, পৃ. ১৪০-১৪১

(الإفصاح فى فقه اللغة، لحسين يوسف موسى وعبد الفتاح الصعيدى، ١: ٨٥، وتاج العروس، للزبيدى الهندى، ٩: ١٤٠-١٤١)

الواصل المعتبر فى الفطر
রোযা ভাঙ্গা ও না ভাঙ্গার ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য প্রবেশকারী বস্তুর বর্ণনা

যে কোন বস্তু দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেই রোযা ভাঙ্গে না। কি প্রবেশ করলে ভাঙ্গে তা বুঝার জন্য প্রথমে বুঝতে হবে যে, আল্লাহ পাকের সৃষ্টি দুই প্রকার। যথা-

১. দেহবিশিষ্ট সৃষ্টি, যেমন ভাত, মাছ, পানি ও ধোঁয়া ইত্যাদি।

২. দেহবিহীন সৃষ্টি, যেমন বাতাস, ঘ্রাণ, ঠান্ডা ও গরম ইত্যাদি।

প্রথম প্রকার সৃষ্টি রোযা ভাঙ্গার ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য, চাই তা দেহের জন্য উপকারী হোক বা না হোক (যেমন খাবার ও ওষুধ ইত্যাদি), কিংবা তা কোন খাদ্য দ্রব্য হোক বা না হোক, তরল হোক বা শক্ত, অথবা বস্তুটি পেটে যাওয়ার পর গলে যায় এমন হোক বা না হোক। এক কথায় সব ধরণের দেহবিশিষ্ট বস্তুই রোযা ভাঙ্গার ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য, তবে কিছু সংখ্যক হানাফী ফকীহ রোযা ভাঙ্গার ব্যাপারে একটি শর্ত আরোপ করেন যে, প্রবেশের কোন কোন অবস্থায় প্রবেশকারী বস্তুটি এমন হতে হবে যা দেহের জন্য উপকারী।

দ্বিতীয় প্রকার দেহবিহীন সৃষ্টি, রোযা ভাঙ্গার ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য নয়, অর্থাৎ দেহবিহীন কোন বস্তু শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে রোযা ভাঙ্গবে না। কারণ, উল্লিখিত বস্তুসমূহ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। এ অবস্থাকে ফিকহের পরিভাষায় 'গালাবা' (غلبة) তথা আধিক্য বলে[৪৮৫], আর غلبة অবস্থায় 'দেহবিশিষ্ট' বস্তু দ্বারাও রোযা ভাঙ্গে না। অতএব, 'দেহবিহীন' বস্তু দ্বারা ভাঙ্গার প্রশ্নই আসে না।

---

৪৮৫ গালাবা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা "রোযা ভাঙ্গার গ্রহণযোগ্য প্রতিবন্ধক সমূহ" শিরোনামে সামনে দ্রষ্টব্য। (দিলাওয়ার হোসাইন)

الجوف المعتبر فى الفطر
রোযা ভঙ্গের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য খালিস্থানের বর্ণনা

মানব দেহের অভ্যন্তরে অনেকগুলো খালিস্থান (جوف) পাওয়া যায়। যেমন-

(১) পাকস্থলী
(২) পিত্ত
(৩) বাচ্চাদানি বা গর্ভাশয়
(৪) মূত্রথলি
(৫) নাড়িভুঁড়ি
(৬) বুকের অভ্যন্তরে খালিস্থান
(৭) মাথার অভ্যন্তরের খালিস্থান
(৮) হৃদপিন্ডের অভ্যন্তরের খালিস্থান
(৯) ও কর্ণকুহরের গহবরের খালিস্থান ইত্যাদি।

এগুলোর মধ্যে কিছু কিছু খালিস্থান এমন রয়েছে যেগুলোতে কোন বস্তু প্রবেশ করলে রোযা ভাঙ্গে না। আর কিছু খালিস্থান এমন আছে যেগুলোর মধ্যে রোযা ভঙ্গকারী কোন কিছু প্রবেশ করলে রোযা ভেঙ্গে যায়। তাই যেসব খালিস্থানে কোন কিছু প্রবেশ করলে রোযা ভাঙ্গে, প্রথমে তা নির্ধারণ অপরিহার্য।

কুরআন, হাদীস ও ফিকহের কিতাব সমূহের কোথাও এ কথার স্পষ্ট বর্ণনা নেই যে, রোযা ভাঙ্গার ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ খালিস্থান গ্রহণযোগ্য। তবে نصوص شرعية তথা কুরআন ও হাদীসে এবং ফুকাহায়ে কিরাম তাদের কিতাবাদিতে যে সমস্ত মাসয়ালা-মাসায়েল উল্লেখ করেছেন, তা গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে রোযা ভাঙ্গার গ্রহণযোগ্য খালিস্থান তিনটি বুঝে আসে। যথা-

(১) খাদ্যনালী,
(২) পাকস্থলী,
(৩) ও নাড়িভুঁড়ি।

যাকে এক কথায় الجهاز الهضمي অর্থাৎ খাদ্যনালীর শুরু থেকে পাকস্থলীর পূর্ণপরিপাক পর্যন্ত প্রণালীকে বলা হয়।[৪৮৬] এ ছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত খালিস্থানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, উল্লিখিত তিনটি খালিস্থানের সাথে সরাসরি বা অন্য কোন খালিস্থানের মাধ্যমে যেগুলোর যোগাযোগ রয়েছে, সেসব খালিস্থান গুলোকেও রোযা ভাঙ্গার গ্রহণযোগ্য খালিস্থান বলে গণ্য করা হয়। অর্থাৎ উক্ত তিনটি খালিস্থানের যে হুকুম, হুবহু ঐ খালিস্থান গুলোর ব্যাপারেও একই হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর যে সমস্ত খালিস্থানের উক্ত তিনটি খালিস্থানের সাথে সরাসরি বা অন্য কোন খালিস্থানের মাধ্যমে যোগাযোগ নেই, রোযা ভাঙ্গার ব্যাপারে ঐসব খালিস্থানের কোন ধর্তব্য নেই। এ জন্যই মাথার ঐ খালিস্থান, যেখানে মস্তিষ্ক থাকে সেখানে কোন প্রবাহিত বস্তু পৌঁছলে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) রোযা ভাঙ্গার যে হুকুম প্রদান করেন, ফকীহগণ তার কারণ এ বলে উল্লেখ করেন যে, মাথার খালিস্থান ও খাদ্যনালীর মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে; ফলে মাথার খালিস্থানে কোন বস্তু পৌঁছালে তা খাদ্যনালীতে পৌঁছে যায়। এ থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, মাথার খালিস্থান মূলত রোযা ভাঙ্গার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত নয়। বরং খাদ্যনালীর সাথে মাথার খালিস্থানের যোগাযোগ আছে বিধায় খাদ্যনালীর ন্যায় রোযা ভাঙ্গার ব্যাপারে ধর্তব্য হয়েছে।

ফকীহগণের এ অভিমতটি পূর্ব যুগের চিকিৎসা বিজ্ঞানিদের মতের উপর নির্ভর ছিল। কিন্তু বর্তমান আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানিরা উল্লিখিত খালিস্থানদ্বয়ের মাঝে যোগাযোগের রাস্তাকে অস্বীকার করে। তবে যদি মাথার খুলির নিম্নাংশের হাড় ভাঙা থাকে তাহলে ভিন্ন কথা। অর্থাৎ তখন সেখান থেকে কোন বস্তুর খাদ্যনালীতে পৌঁছা অসম্ভব কিছু নয়। তেমনি ভাবে মহিলাগণ তাদের যোনিদ্বারের ভিতরে কোন বস্তু প্রবেশ করালে

---

৪৮৬ কারণ, কুরআন ও হাদীসে পানাহার থেকে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে, অন্যথায় রোযা ভেঙ্গে যাবে। অতএব, খাবার ভক্ষণ করার পর কিংবা কিছু পান করার পর খাবার অথবা ঐ পানীয় বস্তু যে সমস্ত খালিস্থানে পৌঁছায় সেগুলোই ধর্তব্য হবে। (দিলাওয়ার হোসাইন)

রোযা ভাঙ্গার যে হুকুম দেয়া হয়েছে তাও এজন্য নয় যে, যোনিদ্বার منفذ معتبر অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য নালীগুলোর একটি, বরং ঐ যুগের চিকিৎসাবিজ্ঞানের ধারণা অনুযায়ী বাচ্চাদানি ও পেটের সাথে যোগাযোগের রাস্তা রয়েছে বলে মনে করা হত। তাই যোনিদ্বারের মাধ্যমে কোন বস্তু বাচ্চাদানিতে প্রবেশ করলে স্বাভাবিক ভাবে তা পেটে পৌঁছাবেই। পক্ষান্তরে, আধুনিক চিকিৎসকরা উক্ত যোগাযোগের রাস্তাকে অস্বীকার করে।

অনুরূপভাবে হযরত ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) মূত্রনালি দিয়ে কোন বস্তু প্রবেশ করালে তা যদি মূত্রথলি পর্যন্ত পৌঁছে যায় তাহলে রোযা ভঙ্গের যে হুকুম প্রদান করেন, তার ভিত্তিও ছিল এ ধারণার উপর যে, মূত্রথলি ও পেটের মাঝে যোগাযোগের রাস্তা বিদ্যমান।

এমনি ভাবে কোন মহিলা তার পেশাবের রাস্তা দিয়ে কোন বস্তু প্রবেশ করালে মাশায়েখগণ রোযা ভাঙ্গার ব্যাপারে যে ঐক্যমত উল্লেখ করেছেন, তার ভিত্তিও ছিল মহিলাদের মূত্রথলি ও পেটের মাঝে যোগাযোগের রাস্তা রয়েছে এ ধারণার উপর, কিন্তু বর্তমান আধুনিক চিকিৎসকরা সেটাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। তাদের মতে যেভাবে পুরুষের মূত্রথলি ও পেটের মাঝে যোগাযোগের কোন রাস্তা নেই, তেমনি ভাবে মহিলাদেরও মূত্রথলি ও পেটের মাঝে যোগাযোগের কোন রাস্তা নেই।

উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যে সকল ফকীহ মনে করেন মাথার খালিস্থান, পুরুষ ও মহিলা উভয়ের মূত্রথলি, বাচ্চাদানী এবং পেটের মাঝে যোগাযোগের রাস্তা রয়েছে, তাদের মতে এখানে কোন বস্তু পৌঁছালে রোযা ভেঙ্গে যাবে। যদি তাদের নিকট রাস্তা না থাকা প্রমাণিত হতো তাহলে তাঁরা রোযা ভাঙ্গার হুকুম দিতেন না। বর্তমান আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, এগুলোর ও পাকস্থলীর মাঝখানে কোন রাস্তা নেই। অতএব, এগুলোতে কোন বস্তু প্রবেশ করলে তাদের নিকটও রোযা ভাঙ্গার হুকুম দেয়া যাবে না।[৪৮৭]

---

৪৮৭ যাবিতুল মুফাত্তিরাত, পৃ. ২১-২২

المنافذ المعتبرة للفطر
রোযা ভঙ্গের গ্রহণযোগ্য রাস্তাসমূহ

দেহের বহিরাংশ থেকে যেসব ছিদ্রপথ ভিতরের অংশে প্রবেশ করেছে, এর মধ্য থেকে যে কোন রাস্তা দিয়ে কোন কিছু গ্রহণযোগ্য খালিস্থানে পৌঁছালেই রোযা ভাঙ্গে না, বরং কিছু কিছু নির্দিষ্ট পথ (রাস্তা) দিয়ে প্রবেশ করলে রোযা ভেঙ্গে যায়। যে সব নির্ধারিত পথ (রাস্তা) দিয়ে প্রবেশ করলে রোযা ভঙ্গ হয় তা নির্ধারণ আবশ্যক ও অতীব প্রয়োজন। এর পূর্বে এ ব্যাপারে তিনটি মূলনীতি জেনে নেয়া জরুরী। যথা-

১. মাযহাব চতুষ্টয়ের ঐক্যমতে একমাত্র منفذ معتبر অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য রাস্তা দিয়ে কোন কিছু جوف معتبر অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য খালিস্থানে প্রবেশ করলে রোযা ভঙ্গ হবে। গ্রহণযোগ্য রাস্তা ছাড়া অন্য কোন রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করলে রোযা ভঙ্গ হবে না।

২. যে সকল ছিদ্র দেহের বহিরাংশে পরিলক্ষিত হয় কিন্তু তা جوف معتبر (গ্রহণযোগ্য খালিস্থান) পর্যন্ত সরাসরি অথবা অন্য কোন جوف এর মাধ্যমে পৌঁছায় না, সে সকল ছিদ্র দিয়ে কোন কিছু অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে রোযা ভঙ্গ হবে না, চাই সে ছিদ্র সৃষ্টিগত হোক কিংবা কৃত্রিম।

৩. যে সকল ছিদ্র দেহের প্রকাশ্য অংশে দেখা যায় তা সাধারণত দু' ধরণেরঃ

(ক) এমন ছিদ্র যার গ্রহণযোগ্য খালিস্থান (جوف معتبر) পর্যন্ত পৌঁছা স্বাভাবিক ও স্পষ্ট। যেমন- মুখ, নাক ও মলদ্বার। এগুলোর ব্যাপারে ডাক্তারদের মতামত নেয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

(খ) এমন ছিদ্র যেগুলো গ্রহণযোগ্য খালিস্থান (جوف معتبر) পর্যন্ত পৌঁছেছে কিনা তা স্পষ্ট নয়; যেমনঃ মূত্রথলি, যোনিদ্বার ও মূত্রনালি ইত্যাদি। তাই দৃঢ়তার সাথে এগুলোর গ্রহণযোগ্য খালিস্থান (جوف معتبر) পর্যন্ত পৌঁছা বা না পৌঁছার সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া

ডাক্তারদের মতামতের উপরই নির্ভরশীল। কেননা মূলতঃ এটা দেহের গঠনপ্রণালী ও চিকিৎসা শাস্ত্রের বিষয়, ফিকাহ্ শাস্ত্রের বিষয় নয়।[৪৮৮]

সুতরাং এ ব্যাপারে মুসলমান বিজ্ঞ ডাক্তারদের মতামতের উপরই নির্ভর করা আবশ্যক। কারণ 'لكل فن رجال' অর্থাৎ প্রত্যেক বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞ মানুষ রয়েছে।

ফকীহগণের আলোচিত ছিদ্র বা রাস্তা (منفذ) এগারটি

প্রকাশ্য ভাবে দেহের বাহ্যিক অংশে মোট এগারটি ছিদ্র পরিলক্ষিত হয়। যথা-

(১) মুখ
(২) নাক
(৩) কান
(৪) মলদ্বার
(৫) যোনিদ্বার
(৬) মূত্রনালি
(৭) নেত্রনালী
(৮) মাথার লোমকূপ
(৯) মাথার ক্ষত
(১০) পেটের ক্ষত
(১১) ও পেটের ক্ষত থেকে সামান্য মোটা ছিদ্র পাকস্থলীর উপর বা নিচের।

উল্লিখিত এগারটির মধ্য হতে প্রথম চারটি অর্থাৎ মুখ, নাক, কান ও মলদ্বার মাযহাব চতুষ্টয়ের সকলের মত অনুযায়ী রোযা ভাঙ্গার ব্যাপারে 'গ্রহণযোগ্য রাস্তা'। শুধুমাত্র ইবনে তাইমিয়া (রহ.) মলদ্বার সম্পর্কে দ্বিমত

---

488 المسبوط للسرخسى، كتاب الصوم، ٣: ٦٨، والبحر الرائق،كتاب الصوم، ٢: ٢٧٨، والهداية مع الفتح، ٢: ٢٦٧-٢٦٨ .

আল মাবসূত, খ. ৩, পৃ. ৬৮, আল-বাহরুর রায়িক, খ. ২, পৃ. ২৭৮, আল-হিদায়া [ফাতহুল কাদীর সংযুক্ত], খ. ২, পৃ. ২৬৭-২৬৮)

পোষণ করেন অর্থাৎ তাঁর মতে মলদ্বারে ঢুস ইত্যাদি ব্যবহার করলে রোযা ভাঙ্গবে না।

যাহোক, উল্লিখিত 'চারটি' রাস্তা (منفذ) এর মধ্য হতে যে কোনটির মধ্য দিয়ে রোযা ভঙ্গকারী বস্তু গ্রহণযোগ্য খালিস্থান (جوف معتبر) এ পৌঁছালে মাযহাব চতুষ্টয়ের সকলের রায় মোতাবেক রোযা ভেঙ্গে যাবে। আর বাকী 'সাতটি' রাস্তা বা ছিদ্র (منفذ) দিয়ে কোন বস্তু প্রবেশ করলে রোযা ভাঙ্গা বা না ভাঙ্গার ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের মতানৈক্য রয়েছে।

রাস্তা/ছিদ্র (منافذ) এর ব্যাপারে ফকীহগণের মতানৈক্যর কারণ

ফকীহগণের নিকট منافذ (রাস্তা/ছিদ্র) নিয়ে মতানৈক্যর কারণ তিনটি। যথা-

১. ফিকাহ সম্বন্ধীয় গবেষণামূলক চিন্তাধারার পার্থক্য (المدارك الفقهية المحضة)

যেমন- পেটের ক্ষতের ব্যাপারে ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহ.) ও তাঁর শিষ্যদ্বয় ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) এর মাঝে মতবিরোধ বিদ্যমান।

ইমাম আযম (রহ.) এর নিকট, পেটের ক্ষত রোযা ভাঙ্গার ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য রাস্তা। পক্ষান্তরে, তার শিষ্যদ্বয়ের নিকট, গ্রহণযোগ্য রাস্তা নয়। কেননা উক্ত রাস্তা সৃষ্টিগত নয়, বরং কৃত্রিম রাস্তা। ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহ.) এর অভিমত হল, রাস্তা চাই প্রাকৃতিক (সৃষ্টিগত) হোক কিংবা কৃত্রিম, উভয় প্রকার রাস্তা রোযা ভাঙ্গার ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ কৃত্রিম-অকৃত্রিম যে কোন রাস্তা দিয়ে রোযা ভঙ্গকারী কোন বস্তু গ্রহণযোগ্য খালিস্থানে প্রবেশ করলেই রোযা ভেঙ্গে যাবে।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) শুধু সৃষ্টিগত বা জন্মগত রাস্তাকেই রোযা ভাঙ্গার ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য রাস্তা

হিসেবে গণ্য করেন। তাদের নিকট কৃত্রিম রাস্তার কোন ধর্তব্য নেই। অতএব, গবেষণামূলক পার্থক্যের কারণে পেটের ক্ষত ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহ.) এর নিকট গ্রহণযোগ্য, আর সৃষ্টিগত বা জন্মগত না হওয়ার কারণে ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) এর নিকট গ্রহণযোগ্য রাস্তা নয়।

মালেকী ও হানাফী মতাবলম্বী ফকীহগণের মাঝে মাথার লোমকূপ ও নেত্রনালী নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। মালেকী মাযহাবের অনুসারীরা রোযা ভাঙ্গার ব্যাপারে এ দু'টিকে গ্রহণযোগ্য রাস্তা হিসেবে গণ্য করেন। কারণ, তাদের নিকট দেহের উপরের দিকের লোমকূপ গ্রহণযোগ্য রাস্তা আর মাথা ও নেত্রনালী যেহেতু দেহের উপরের দিকের সেহেতু এগুলো গ্রহণযোগ্য রাস্তা। পক্ষান্তরে, হানাফী ফকীহগণ এ দু'টিকে গ্রহণযোগ্য রাস্তা মনে করেন না। তাই উক্ত দু'রাস্তার মাধ্যমে কোন বস্তু দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে মালেকী মাযহাব মতে রোযা ভেঙ্গে যাবে, আর হানাফী মাযহাব মতে রোযা ভঙ্গ হবে না।

২. দেহ ও অঙ্গের গঠন-প্রণালী এবং তৎসংশ্লিষ্ট তথ্য নিয়ে ডাক্তারদের পারস্পরিক মত পার্থক্য।

যেমন- পেশাবের রাস্তা নিয়ে ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহ.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) এর মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। আর এ মতবিরোধের ভিত্তি ছিল ডাক্তারদের মতভেদের উপর। কেননা মূত্রনালি এবং পেটের মাঝে সরাসরি কোন রাস্তা ও যোগাযোগ আছে কি না এ ব্যাপারে ঐ যুগের ডাক্তারদের মতবিরোধ ছিল। কোন কোন ডাক্তারদের মতে এ অঙ্গদ্বয়ের মাঝে কোন রাস্তা নেই। এ মতটি হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে, কোন কোন ডাক্তারদের মতে এ অঙ্গদ্বয়ের মাঝে যোগাযোগের রাস্তা আছে। আর এ মতটি ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) গ্রহণ করেছেন। তাই পেশাবের রাস্তা দিয়ে কোন বস্তু

ভিতরে প্রবেশ করলে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) রোযা না ভাঙ্গার কথা বলেন। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) রোযা ভাঙ্গার কথা বলেন।[৪৮৯]

৩. جوف معتبر (গ্রহণযোগ্য খালিস্থানের) ব্যাপারে মতানৈক্য।

শাফেয়ী মাযহাব মতে, দেহের অভ্যন্তরে যে কোন খালিস্থান রোযা ভঙ্গের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য। পক্ষান্তরে, হানাফী ও মালেকী মাযহাবে রোযা ভঙ্গ হওয়ার ব্যাপারে যে কোন খালিস্থান গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং গ্রহণযোগ্য খালিস্থান পর্যন্ত যে সকল রাস্তা গিয়ে পৌঁছেছে সে রাস্তাগুলো গ্রহণযোগ্য। যেমন- নাক ও মূত্রথলী। শাফেয়ীগণের নিকট, কানের ভিতরের অংশ ও মূত্রথলী রোযা ভাঙ্গার ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য খালিস্থান। কানের বাইরের ছিদ্র ও মূত্রথলি যেহেতু গ্রহণযোগ্য খালিস্থান পর্যন্ত পৌঁছেছে তাই তাদের নিকট, এ দু'রাস্তা গ্রহণযোগ্য রাস্তা বলে গণ্য। পক্ষান্তরে, কানের ভিতরের খালিস্থান এবং মূত্রথলি হানাফীদের নিকট, গ্রহণযোগ্য খালিস্থান নয়। তাই কানের বাইরের ছিদ্র ও মূত্রনালি তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য রাস্তা নয়। সুতরাং কান ও মূত্রনালি দিয়ে কোন কিছু প্রবেশ করলে শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ী রোযা ভেঙ্গে যাবে, পক্ষান্তরে হানাফীদের নিকট ভাঙ্গবে না।

উপরোল্লেখিত ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে এ কথা বলা যায় যে, যে সকল রাস্তা গ্রহণযোগ্য খালিস্থান পর্যন্ত পৌঁছায়, ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর নিকট রোযা ভাঙ্গার ব্যাপারে সে সকল রাস্তাই গ্রহণযোগ্য। চাই তা সৃষ্টিগত ও জন্মগত হোক অথবা কৃত্রিম, তবে তাঁর নিকট লোমকূপ, নেত্রনালী ও মূত্রনালি গ্রহণযোগ্য রাস্তা নয়। পক্ষান্তরে, ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) কৃত্রিম রাস্তার ব্যাপারে

---

489 المبسوط للسرخسى، كتاب الصوم، ٣: ٦٧-٦٨، والبحر الرائق،كتاب الصوم، ٢: ٢٧٥.

আল মাবসূত লিস সারাখসী, খ. ৩, পৃ. ৬৭-৬৮, আল বাহরুর রায়িক, খ. ২, পৃ. ২৭৫

দ্বিমত পোষণ করেছেন। যেমন, পেট ও মাথার ক্ষত। এ রাস্তাদ্বয় উক্ত ইমামদ্বয়ের নিকট কৃত্রিম হওয়ার কারণে রোযা ভাঙ্গার ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য নয়।

তেমনিভাবে ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) এর নিকট, পেশাবের রাস্তা গ্রহণযোগ্য। আর ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর নিকট, গ্রহণযোগ্য নয়। এ হিসেবে মুখ, নাক, কান, মলদ্বার, যোনিদ্বার, মাথার ক্ষত, পেটের ক্ষত ও পেটের ছিদ্র ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর নিকট গ্রহণযোগ্য। আর শেষ তিনটি অর্থাৎ মাথার ক্ষত, পেটের ক্ষত ও পেটের ছিদ্র ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) এর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। তদ্রুপ মূত্রনালি ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) এর নিকট গ্রহণযোগ্য, পক্ষান্তরে হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

উল্লিখিত আলোচনার সার সংক্ষেপ

ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) এর নিকট, রোযা ভাঙ্গার ব্যাপারে বাহির থেকে কোন কিছু দেহের ভিতরে প্রবেশ করার গ্রহণযোগ্য পথ পাঁচটি। যথা- (১) মুখ (২) নাক (৩) কান (৪) মলদ্বার (৫) ও যোনিদ্বার

ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) এর নিকট ছয়টি, তিনি উল্লিখিত পাঁচটির সাথে মূত্রনালিকেও গ্রহণযোগ্য রাস্তা মনে করেন।

ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহ.) ও মাশায়িখে হানাফীয়্যার নিকট, গ্রহণযোগ্য পথ সাতটি। উল্লিখিত পাঁচটি অর্থাৎ মুখ, নাক, কান, মলদ্বার ও যোনিদ্বারের সাথে তাঁরা 'মাথার ক্ষত' ও 'পেটের ক্ষত'কেও অন্তর্ভুক্ত করেন।

মালেকীদের নিকট গ্রহণযোগ্য রাস্তা আটটি। তবে তাঁরা উল্লিখিত আটটি থেকে 'মাথার ক্ষত', 'পেটের ক্ষত' ও 'মূত্রনালি'কে গ্রহণযোগ্য রাস্তা মনে করেন না, কিন্তু তাঁরা (১) মাথার লোমকূপ (২) নেত্রনালী (৩) ও পেটের ছিদ্র কে অবশিষ্ট পাঁচটির সাথে যোগ করেন।

উল্লেখ্য যে, হানাফী মতাবলম্বীগণ 'পেটের ছিদ্র'কে ভিন্ন রাস্তা হিসেবে গণ্য করেন না। বরং 'পেটের ক্ষত' ও 'ছিদ্র'কে একই রাস্তা

হিসেবে গণ্য করেন। পেটের ছিদ্র কে ভিন্ন ধরলে হানাফীদের নিকট গ্রহণযোগ্য রাস্তা 'নয়টি' হয়ে যায়।

آراء الأطباء المهرة فى المنافذ المعتبرة
গ্রহণযোগ্য রাস্তাগুলোর ব্যাপারে বিজ্ঞ ডাক্তারদের মতামত

রোযা ভাঙ্গা না ভাঙ্গার ব্যাপারে মুখ, নাক ও মলদ্বার এ রাস্তাত্রয় 'جوف معتبر' তথা গ্রহণযোগ্য খালিস্থান পর্যন্ত পৌঁছা সম্পর্কে ডাক্তারদের কোন দ্বিমত নেই। তদ্রূপ 'পেটের ক্ষত' যদি 'পাকস্থলী' কিংবা 'নাড়িভুঁড়ি' পর্যন্ত পৌঁছে তাহলে এ রাস্তাটিও গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা এখানে কোন তরল পদার্থ যেমন, ওষুধ ইত্যাদি দিলে তা গ্রহণযোগ্য খালিস্থান পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

মাথার ক্ষত, কানের ছিদ্র, মূত্রনালি ও যোনিদ্বারের ব্যাপারে পূর্ব যুগের ডাক্তার ও বর্তমান ডাক্তারদের মাঝে দ্বিমত রয়েছে। পূর্ব যুগের ডাক্তারদের মতে মস্তিষ্ক থেকে খাদ্য নালী পর্যন্ত কোন কিছু পৌঁছানোর রাস্তা রয়েছে। পক্ষান্তরে বর্তমান ডাক্তাররা বলেন মাথার মস্তিস্কের নিচের হাড় ভাঙ্গা না থাকলে মাথার ক্ষতে কোন তরল ওষুধ ব্যবহার করলেও তা খাদ্যনালী পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব নয়। ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহ.) মাথার ক্ষতে তরল ওষুধ ব্যবহার করলে রোযা ভাঙ্গার কথা এ জন্য বলেননি যে, কোন কিছু মস্তিস্কে পৌঁছলেই রোযা ভেঙ্গে যাবে বরং তিনি রোযা ভাঙ্গার যে কারণ উল্লেখ করেন তা হল, মস্তিস্ক থেকে খাদ্যনালী পর্যন্ত কোন কিছু পৌঁছার রাস্তা রয়েছে। তিনি ঐ যুগের ডাক্তারদের মতামতের উপর নির্ভর করেই এ কথা বলেছেন বলে প্রতীয়মান হয়। আর যেহেতু ডাক্তারদের এ মতামত আধুনিক বাস্তব গবেষণায় ভুল সাব্যস্ত হয়েছে। অর্থাৎ মস্তিস্ক থেকে খাদ্যনালী পর্যন্ত কোন রাস্তা নেই, যদি মস্তিষ্কের নিচের হাড় ভাঙ্গা না থাকে। আর হাড় ভাঙ্গা না থাকাই স্বাভাবিক। সুতরাং ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহ.) এর মতেও মস্তিষ্কের ক্ষতে কোন তরল ওষুধ ব্যবহার করলে রোযা না ভাঙ্গার হুকুমই প্রযোজ্য হবে।

তেমনিভাবে কান গ্রহণযোগ্য রাস্তা হওয়ার ব্যাপারে সকল ইমামগণ যে মতামত পোষণ করেছেন এর ভিত্তিও পূর্ব যুগের ডাক্তারদের মতামতের উপর নির্ভর ছিল। তাদের অভিমত ছিল, কানে কোন তরল বস্তু দিলে তা খাদ্যনালী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। পক্ষান্তরে বর্তমান ডাক্তারদের ভাষ্যমতে, কান থেকে গলা পর্যন্ত কোন বস্তু পৌঁছার রাস্তা নেই। তারা বলেন- কান তিন ভাগে বিভক্ত (১) কানের বাহিরাংশ (২) কানের ভিতরাংশ (৩) ও কানের মধ্যাংশ। প্রত্যেক দু'অংশের মধ্যখানে একটি করে পর্দা রয়েছে।

প্রথমাংশ ও মধ্যাংশের মাঝের পর্দাটির গঠন প্রনালী দেহের চামড়ার ন্যায় অর্থাৎ যেমনিভাবে লোমকূপের মাধ্যমে তরল পদার্থ চামড়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে তেমনিভাবে কানের ঐ পর্দাটি দিয়েও লোম কূপের মাধ্যমে কোন তরল পদার্থ অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে। আর এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, লোমকূপের মাধ্যমে কোন কিছু ভিতরে প্রবেশ করলে রোযা ভঙ্গ হয় না, অতএব কানের এ পর্দা দিয়ে কোন কিছু ভিতরে পৌঁছালেও রোযা ভঙ্গ হবে না। তবে যদি কানের পর্দা ফাটা থাকে তাহলে ঐ ফাটল দিয়ে কোন তরল পদার্থ কানের মধ্যাংশে পৌঁছতে পারে, সেখান থেকে কানের মধ্যাংশ ও শেষাংশের মাঝখানে যে পর্দা রয়েছে ঐ পর্দায় ছোট ছোট ছিদ্র রয়েছে, ঐ ছিদ্রগুলো দিয়ে খাদ্যনালী পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। কিন্তু কানের প্রথম পর্দায় ফাটল না থাকাই স্বাভাবিক, তাই যে পর্যন্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারা ফাটল প্রমাণিত না হবে সে পর্যন্ত কানে কোন তরল পদার্থ দিলে তা খাদ্যনালী পর্যন্ত পৌঁছার হুকুম দেয়া যাবে না। এ হিসেবে কানে কোন তরল পদার্থ দিলে মালেকী মাযহাব ব্যতীত অন্য সকল ফকীহগণের নিকট রোযা ভঙ্গ না হওয়ার হুকুমই দেয়া যায়।

মহিলাদের মূত্রনালিকে মাশায়িখে কিরাম গ্রহণযোগ্য রাস্তা বলে যে অভিমত পেশ করেছেন তা পূর্ববর্তী ডাক্তারদের অভিমতের উপর নির্ভরশীল ছিল। তাদের মতে, 'মহিলাদের মূত্রনালি' এর جوف معتبر তথা গ্রহণযোগ্য খালিস্থানের সাথে যোগাযোগের রাস্তা আছে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) পুরুষের মূত্রনালিকেও গ্রহণযোগ্য রাস্তা মনে করেন তার এ অভিমতের ভিত্তিও ঐ যুগের ডাক্তারদের এ অভিমতের উপর ছিল যে, পুরুষের মূত্রনালি এবং جوف معتبر তথা গ্রহণযোগ্য খালিস্থানের সাথে যোগাযোগের রাস্তা আছে। কিন্তু বর্তমান যুগের ডাক্তারদের মতে পুরুষ ও মহিলা কারোই মূত্রনালি ও جوف معتبر তথা গ্রহণযোগ্য খালিস্থানের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের কোন রাস্তা নেই। মূত্রনালিটি মূত্রথলি পর্যন্ত গিয়েই শেষ হয়ে গেছে। প্রস্রাব পাকস্থলী থেকে সরাসরি কোন রাস্তা ব্যতীত ঘামের ন্যায় চুয়ে চুয়ে ও বেয়ে বেয়ে কিডনী হয়ে মূত্রথলিতে একত্রিত হয়।[৪৯০]

তাই যারা মূত্রনালিতে তরল কিছু প্রবেশ করালে রোযা ভেঙ্গে যাওয়ার হুকুম দিয়েছেন তাদের মতেও এখন রোযা না ভাঙ্গার হুকুম দেয়া অধিক যুক্তিসঙ্গত।

যোনিদ্বারের ব্যাপারে হানাফী মাশায়িখে কিরাম বলেছেন যে, যোনিদ্বারে কোন তরল পদার্থ দিলে রোযা ভেঙ্গে যাবে এর ভিত্তিও পূর্ব যুগের ডাক্তারদের ধারণার উপর নির্ভর ছিল। তা হল, 'বাচ্চাদানী' এবং جوف معتبر তথা গ্রহণযোগ্য খালিস্থানের মধ্যে যোগাযোগের রাস্তা আছে, তাই যোনিদ্বারে কোন তরল পদার্থ ব্যবহার করলে তা বাচ্চাদানীর মাধ্যমে جوف معتبر তথা গ্রহণযোগ্য খালিস্থান পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কিন্তু বর্তমান যুগের ডাক্তারদের মতানুযায়ী বাচ্চাদানী ও গ্রহণযোগ্য খালিস্থান (جوف معتبر) এর মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের কোন রাস্তা নেই। সুতরাং এর উপর ভিত্তি করে যোনিদ্বারে কোন তরল পদার্থ ব্যবহার করলে যারা রোযা ভাঙ্গার অভিমত পোষণ করেছেন তাদের মতে এখন রোযা না ভাঙ্গার বিধান দেয়াই যুক্তির দাবি।[৪৯১]

---

490 رد المحتار،كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لايفسده، تحت مطلب في حكم الإستمناء بالكف، ٣: ٣٧٢ .

৪৯১ রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৭২

লোমকূপ গ্রহণযোগ্য রাস্তা নয়

লোমকূপের মাধ্যমে কোন তরল পদার্থ দেহের ভিতরে প্রবেশ করলে রোযা না ভাঙ্গার ব্যাপারে নিম্ন বর্ণিত দলীলসমূহ পেশ করা যায়। যথা-

১. উযূ-গোসল ইত্যাদির সময় কিছু না কিছু পানি লোমকূপ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করাই স্বাভাবিক[৪৯২], যার থেকে কখনো নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। আর অসম্ভব ও সাধ্যাতীত কোন হুকুম আল্লাহ তা'আলা কখনোই মানুষের জন্য প্রদান করেন না। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছেঃ

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.[٤٩٣]

অর্থ- আল্লাহ তাআলা কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার বা হুকুম প্রদান করেন না।[৪৯৪]

২. হযরত আয়েশা (রাযি.) ও উম্মে সালামা (রাযি.) বলেনঃ

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر، وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم، إلخ.[٤٩٥]

অর্থ- কখনও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর জানাবত (গোসল ফরয হওয়া) অবস্থায় ফজরের সময় হয়ে যেত। অতঃপর তিনি রোযা অবস্থায় গোসল করতেন।[৪৯৬]

---

৪৯২ তাইতো পিপাসা অবস্থায় অনেকক্ষণ পানিতে থাকলে পিপাসা মিটে যায়।

493 سورة البقرة، آية: ٢٨٦ .

৪৯৪ সূরা বাকারা, আয়াত: ২৮৬

495 أخرجه البخارى فى الصوم، باب الصائم يصبح جنبا، ١: ٢٥٨، رقم الحديث: ١٩٢٦ .

৪৯৬ বুখারী, খ. ১, পৃ. ২৫৮, হাদীস নং ১৯২৬

৩.

عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال... الذى حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء، وهو صائم من العطش الخ.[٤٩٧]

অর্থ- হযরত আবূ বকর ইবনে আবদুর রহমান (রহ.) জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে রোযা অবস্থায় পিপাসার কারণে "আরাজ" নামক স্থানে মাথায় পানি ঢালতে দেখেছি।[৪৯৮]

এছাড়া আরো বহু দলীল দ্বারা প্রমাণিত যে, লোমকূপের মাধ্যমে পানি, তেল ও ওষুধ ইত্যাদি যে কোন ধরণের তরল পদার্থ ভিতরে প্রবেশ করলে রোযা ভাঙ্গবে না।[৪৯৯]

নেত্রনালী গ্রহণযোগ্য রাস্তা নয়

নেত্রনালী থেকে খাদ্যনালী পর্যন্ত সরাসরি যোগাযোগের রাস্তা থাকা সত্ত্বেও তার বিপরীত হাদীস ও আছার থাকার কারণে এর ধর্তব্য হয়নি।

أبوعاتكة عن أنس بن مالك –رضي الله تعالى عنه–، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اشتكت عيني، أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم.[٥٠٠]

---

497 رواه أبوداؤد فى الصوم، باب الصائم يصب عليه الماء من العطـــش، إلخ. ١: ٣٢٢، رقم الحديث: ٢٣٦٢ .

৪৯৮ আবূ দাউদ, খ. ১, পৃ. ৩২২, হাদীস নং ২৩৬২

৪৯৯ আলহিদায়া [ফাতহুল কাদীর সংযুক্ত], খ. ২, পৃ. ২৬৬-২৬৭

500 أخرجه الترمذى فى الصوم، باب ماجاء فى الكحل للصائم، ١: ١٥٤، رقم الحديث: ٧٢٦، وقال: إسناده ليس بالقوى، ولا يصح عن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا البـــاب شئ، وأبوعاتكة يضعف. انتهى ما قال الترمذى، وقال الحافظ فى "التلخيص" (٢: ١٩١):

অর্থ- হযরত আবূ আতিকা আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেনঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে চোখের সমস্যার কথা ব্যক্ত করে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! রোযা অবস্থায় আমি কি সুরমা ব্যবহার করতে পারব? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন: হ্যাঁ, রোযা অবস্থায় তুমি সুরমা ব্যবহার করতে পারবে।[৫০১]

عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدى صاحب بقية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة –رضي الله تعالى عنها–، قالت: اكتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم.[٥٠٢]

অর্থ- হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম রোযা অবস্থায় চোখে সুরমা ব্যবহর করতেন।[৫০৩]

এছাড়া বহু হাদীস এবং সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে'তাবেয়ীদের বাণী ও আমল দ্বারা একথা প্রমাণিত যে, সুরমা ব্যবহার করলে রোযা ভাঙ্গে

ورواه أبوداؤد من فعل أنس، ولا بأس بإسناده، وفى الباب عن بريرة مولاة عائشة فى الطبرانى "الأوسط"، وعن ابن عباس فى "شعب الإيمان" للبيهقى بإسناد جيد. كذا فى تعليق الشيخ عبدالقادر أرناؤوط على جامع الأصول، ٦: ٢٩٥ .

৫০১ তিরমিযী, খ. ১, পৃ. ১৫৪, হাদীস নং ৭২৬

502 أخرجه ابن ماجه، ص: ١٢١، رقم الحديث: ١٦٨٠، وفى مجمع الزوائد: إسناده ضعيف، والبيهقى فى السنن الكبرى، ٤: ٢٦٢، وقال: "وسعيد الزبيدى من مجاهيل شيوخ بقية، ينفرد بما لا يتابع عليه." قلت: قول البيهقى هذا فى سعيد الزبيدى سهو، قال ابن التركمانى فى الجوهر النقى مع السنن الكبرى للبيهقى، (٤: ٢٦٢): سعيد شيخ بقية،كما ذكره البيهقى نفسه فيما بعد، فقوله: 'صاحب بقية' سهو، ووثق سعيدا هذا الخطيب، وذكر أن اسم أبيه عبد الجبار وذكره ابن حبان أيضا فى الثقات، وأنه من أهل الشام، وأن أهل بلده رووا عنه، وهذا ينفى عنه الجهالة، وصرح المزى أيضا فى أطرافه بأنه سعيد بن عبدالجبار.

৫০৩ ইবনে মাজাহ্, পৃ. ১২১, হাদীস নং ১৬৮০, বায়হাকী, খ. 8, পৃ. ২৬২

না। অথচ চোখে সুরমা ব্যবহারের পর তার স্বাদ ও রং গলায় প্রকাশ পায়।

এখানে উল্লেখ্য যে, সুরমা সম্পর্কীয় হাদীসগুলো সূত্রগত দিক দিয়ে যদিও দূর্বল কিন্তু متن (ভাষ্য) ও سند (সূত্র) এর একাধিকতার কারণে ঐ দূর্বলতা আর বাকি থাকেনা। বিচ্ছিন্নভাবে হাদীসগুলো দলীলের যোগ্যতা না রাখলেও সব হাদীসগুলো সমষ্টিগত ভাবে দলীল হওয়ার যোগ্য, এতে কোন সন্দেহ নেই। হাদীসগুলোর পাশাপাশি আছার (آثار) তথা বড় বড় সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কথা ও আমল (যেগুলো বুখারী, আবূ দাউদ ইত্যাদি হাদীসগ্রন্থে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত আছে) এর সমর্থনের কারণে দলীলগুলোর গ্রহণ যোগ্যতা আরো জোরদার হয়ে যায়।[৫০৪]

এছাড়া নেত্রনালী অতি সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে এটিকে লোমকূপের মতই ধরা যায়। আর এটা সকলের জানা কথা যে, লোমকূপের মাধ্যমে কোন বস্তু দেহের ভিতরে প্রবেশ করলে রোযা ভঙ্গ হয় না। সুতরাং নেত্রনালীর মাধ্যমে কোন কিছু ভিতরে প্রবেশ করলে রোযা ভাঙ্গবে না।[৫০৫]

❖ ❖ ❖

৫০৪ ফাতহুল কাদীর [কিফায়া সংযুক্ত], খ. ২, পৃ. ২৬৯, যাবিতুল মুফাততিরাত, পৃ. ৬৪

৫০৫ আল মাবসূত লিস সারাখসী, খ. ৩, পৃ. ৬৭

الوصول المعتبر فى الفطر
রোযা ভাঙ্গা ও না ভাঙ্গার ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য প্রবেশের বর্ণনা

কোন বস্তু দেহে প্রবেশ করলেই রোযা ভাঙ্গে না। বরং রোযা ভঙ্গ হতে হলে কিছু নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে প্রবেশ করতে হয়। ঐ নির্দিষ্ট পদ্ধতি পাওয়া যেতে হলে নিম্ন বর্ণিত শর্তগুলোর উপস্থিতি আবশ্যক। যথা-

(ক) প্রবেশকারী বস্তুটি সম্পূর্ণভাবে ভিতরে প্রবেশ করতে হবে। অতএব কেউ যদি মলদ্বার দিয়ে কাঠের শলা ইত্যাদি সম্পূর্ণ প্রবেশ না করে আংশিক প্রবেশ করায় তাহলে রোযা ভাঙ্গবে না। তবে সম্পূর্ণ প্রবেশ করালে রোযা ভেঙ্গে যাবে। আর এ দু'টি শর্তের ব্যাপারে সকল ফকীহ ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

(খ) প্রবেশকারী বস্তুটি দেহের ভিতরে প্রবেশ করার পর সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করতে হবে। সুতরাং কেউ যদি কোন গোস্তের টুকরায় সুতা বেঁধে গিলে ফেলার সাথে সাথে পুনরায় টেনে টুকরাটি বের করে নিয়ে আসে, আর ঐ টুকরার কোন অংশ ভিতরে থেকে না যায় তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে না।

একদল হানাফী ফকীহ উল্লিখিত শর্তের সাথে আরেকটি শর্ত বৃদ্ধি করেন। আর তা হলো, 'صورة فطر' অথবা 'معنى فطر' পাওয়া যেতে হবে। অর্থাৎ ততক্ষণ পর্যন্ত রোযা ভঙ্গ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত'معنى فطر' তথা এমন বস্তু পেটে প্রবেশ না করবে যার মধ্যে শরীরের জন্য উপকার রয়েছে (যেমনঃ খাবার, ওষুধ ইত্যাদি) অথবা 'صورة فطر' পাওয়া যেতে হবে। আর 'صورة فطر' কাকে বলে এ ব্যাপারে ফকীহগণের দু'টি মতামত রয়েছেঃ

১. 'صورة فطر' অর্থ ابتلاع তথা গলধঃকরণ। এ মতটি হিদায়ার প্রণেতা ইমাম মারগিনানী (রহ.) ও একদল হানাফী ফকীহ গ্রহণ করেছেন।

২. ‘صورة فطر’ এর অর্থ الإدخال بصنع الصائم অর্থাৎ বস্তুটি প্রবেশের ক্ষেত্রে রোযাদারের নিজস্ব হস্তক্ষেপ থাকতে হবে।

এ মতটি ফাতাওয়ায়ে কাযীখান প্রণেতা ইমাম কাযীখান (রহ.) ও ফাতহুল কাদীর প্রণেতা আল্লামা কামাল ইবনে হুমাম (রহ.) ও একদল ফকীহ গ্রহণ করেছেন। এ ব্যাখ্যাটি পূর্বের ব্যাখ্যার (অর্থাৎ গিলে ফেলার) তুলনায় আরো ব্যাপক।

‘صورة فطر’ এর ব্যাপারে ইমাম সারাখসী (রহ.), ইমাম কাসানী (রহ.) এবং ইমাম ফখরুদ্দীন যায়লায়ী (রহ.) দ্বিমত পোষণ করেন, তাঁরা দু’টি متفق عليه (সর্বজন সমর্থিত) শর্ত আরোপ করেছেন। যথা (১) প্রবেশকারী বস্তুটি সম্পূর্ণভাবে ভিতরে প্রবেশ করা (২) ও ভিতরে কিছুক্ষণ অবস্থান করা। এছাড়া অন্য কোন শর্তারোপ করেননি। তেমনিভাবে তাঁরা প্রবেশকারী বস্তুর দেহের উপকারী হওয়ার শর্তটিও আরোপ করেননি।

উল্লিখিত আলোচনার সার সংক্ষেপ

উল্লিখিত আলোচনার সার সংক্ষেপ এই যে, وصول তথা প্রবেশ গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে হানাফী মাযহাবে তিনটি অভিমত রয়েছে। যথা-

১. ইমাম মারগিনানী (রহ.) ও তাঁর অনুসারীদের অভিমত, অর্থাৎ বস্তুটি গলধঃকরণ করা।
২. ইমাম কাযীখান (রহ.) ও তাঁর অনুসারীদের অভিমত, অর্থাৎ বস্তুটি রোযাদারের নিজস্ব হস্তক্ষেপে প্রবিষ্ট হওয়া।
৩. ইমাম সারাখসী (রহ.) ও তাঁর অনুসারীদের অভিমত, অর্থাৎ প্রথম متفق عليه (সর্বজন সমর্থিত) দু’টি শর্ত ব্যতীত ভিন্ন কোন শর্তারোপ না করা।

মতানৈক্যের ফলাফল

উল্লিখিত মতানৈক্যের কারণে রোযা ভাঙ্গার হুকুমের মাঝে এ ব্যবধান পরিলক্ষিত হয় যে, কেউ যদি রোযাদারের পেটে বর্শা, গুলী ও

তীর নিক্ষেপ করে এবং বর্শা, গুলী ও তীরের লৌহ অংশ পেটে থেকে যায় এতে তৃতীয় মত পোষণকারীদের নিকট রোযা ভেঙ্গে যাবে। কেননা এখানে প্রবেশকারী বস্তু সম্পূর্ণ পেটের ভিতরে প্রবিষ্ট হওয়া ও অবস্থান করা দুটি শর্তই উপস্থিত। পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় মত পোষণকারীদের নিকট রোযা ভাঙ্গবে না। কেননা এর পিছনে রোযাদারের নিজস্ব কোন হস্তক্ষেপ পাওয়া যায়নি। তেমনিভাবে প্রথম মত প্রকাশকারীদের নিকটও রোযা ভাঙ্গবে না। কারণ, এখানে ابتلاع তথা গলধঃকরণ পাওয়া যায়নি।

তদ্রূপ যদি রোযাদার ব্যক্তি তার পেটে গলধঃকরণ ব্যতীত এমন বস্তু প্রবিষ্ট করে যা দেহের জন্য উপকারী নয়, তাহলে দ্বিতীয় মত পোষণকারীদের নিকট রোযা ভেঙ্গে যাবে। কেননা এখানে তার হস্তক্ষেপ পাওয়া গেছে। তেমনিভাবে তৃতীয় মত পোষণকারীদের নিকটও রোযা ভেঙ্গে যাবে। কেননা এখানে সম্পূর্ণ প্রবেশের সাথে সাথে ভিতরে তার অবস্থান করাও পাওয়া গেছে। পক্ষান্তরে, প্রথম মত পোষণকারীদের নিকট গলধঃকরণ না পাওয়া যাওয়ার কারণে রোযা ভাঙ্গবে না।

কারো দেহের ভিতরে যদি কোন উপকারী বস্তু। যেমনঃ তেল ইত্যাদি পৌঁছে তাহলে সকলের নিকটই রোযা ভেঙ্গে যাবে। চাই বস্তুটি নিজে নিজেই প্রবেশ করুক কিংবা রোযাদার নিজে অথবা অন্য কেউ প্রবেশ করিয়ে দেয়। কেননা তেল এমন বস্তু যার মাঝে দেহের উপকার রয়েছে বিধায় এর মধ্যে معنى فطر পাওয়া গেছে। সুতরাং এর দ্বারা রোযা ভাঙ্গার জন্য صورة فطر তথা গলধঃকরণ অথবা রোযাদারের হস্তক্ষেপ পাওয়া যাওয়া শর্ত নয়। তৃতীয় মত পোষণকারীদের নিকট এখানে صورة فطر তথা وصول مع الاستقرار পাওয়া গেছে। কেননা তারা وصول مع الاستقرار কেই صورة فطر মনে করেন।

গ্রহণযোগ্য রাস্তার আলোচনা থেকে আরেকটি বিষয় জানা গেছে যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) وصول তথা প্রবেশ গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য আরেকটি শর্তারোপ করেন। আর তা হলো, বস্তুর প্রবেশ সৃষ্টিগত রাস্তা দিয়ে হতে হবে। মাথার ক্ষত, পেটের ক্ষত ইত্যাদি কৃত্রিম রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করলে এ প্রবেশ গ্রহণযোগ্য হবে না।

তাই এতে রোযাও ভাঙ্গবে না। ইমাম আবূ জা'ফর ত্বাহাবী (রহ.) তাঁদের এ মতের সাথে একমত পোষণ করেন।

ইবনে হযম উন্দুলুসী (রহ.) এর অভিমত

ইবনে হযম উন্দুলুসী (রহ.) রোযা ভাঙ্গা ও না ভাঙ্গার ব্যাপারে জমহুর উম্মতের বিপরীত মত পোষণ করেছেন। তিনি বলেন, রোযা শুধু পাঁচ কারণে ভাঙ্গবে । যথাক্রমে কারণগুলো-

১. ইচ্ছাকৃত ভক্ষণ করা
২. ইচ্ছাকৃত পান করা
৩. ইচ্ছাকৃত যৌন সঙ্গম করা
৪. ইচ্ছাকৃত বমি করা
৫. ইচ্ছাকৃত গুনাহ করা

সুতরাং মাথার ক্ষত ও পেটের ক্ষতে ওষুধ ব্যবহার, নাক দিয়ে কিছু টানা, ঢুস ব্যবহার, শিঙা লাগানো, স্বপ্নদোষ, হস্তমৈথুন, স্ত্রীর কিংবা দাসীর যোনিদ্বার ব্যতীত দেহের অন্য কোন অঙ্গের মধ্যে যৌন সঙ্গম, চুম্বণ, অনিচ্ছাকৃত বমি ও দাঁত দিয়ে রক্ত পড়া ইত্যাদির কারণে রোযা ভাঙ্গবে না। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে রোযা অবস্থায় পানাহার, যৌন সঙ্গম, ইচ্ছাকৃত বমি ও গুনাহ থেকে নিষেধ করেছেন। ঢুস ব্যবহার, মূত্রনালি, নেত্রনালি, কান, নাক, মাথা ও পেটের ক্ষত ইত্যাদিতে তরল পদার্থ ব্যবহার করাকে পানাহার বলা হয় না। আর পানাহার ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতিতে পেটে কোন কিছু পৌঁছানোকে নিষেধ করা হয়নি। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত পানাহার, যোনিদ্বার দিয়ে যৌন সঙ্গম ও গুনাহ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এগুলো রোযা অবস্থায় নিষেধ হবে না। তাই ইচ্ছাকৃত পানাহার না করে অন্য যে কোনভাবে পানাহার হয়ে গেলে অনিচ্ছাকৃত যে কোনভাবে যৌন সঙ্গম কিংবা বমি হওয়া তাঁর নিকট রোযা ভঙ্গের কারণ হবে না।[৫০৬]

---

৫০৬ আল মুহাল্লা ,খ. ৬, পৃ. ২১৪, ২১৭, ২২২, ২২৩, ২২৪

ইবনে তাইমিয়া (রহ.) এর অভিমত

ইবনে তাইমিয়া (রহ.) চোখে সুরমা লাগানো, ঢুস ব্যবহার, মূত্রনালি, পেট ও মাথার ক্ষত ইত্যাদিতে তরল পদার্থ ব্যবহার করলে রোযা ভাঙ্গার ব্যাপারে ইবনে হযম (রহ.) এর সাথে একমত পোষণ করেন। তবে হাদীসের কারণে শিঙা লাগানোর ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন।[৫০৭]

ইবনে হযম (রহ.) ও ইবনে তাইমিয়া (রহ.) এর অভিমতদ্বয়ের পর্যালোচনা

ইবনে হযম (রহ.) ও ইবনে তাইমিয়া (রহ.) পবিত্র কুরআনের যে আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করেন, তা হল-

قال الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل.[508]

অর্থ- তখন তোমরা স্ত্রী সম্ভোগ কর ও অন্বেষণ কর যা আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন এবং তোমরা পানাহার কর, যতক্ষণ কালো রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা না যায়।[৫০৯]

উল্লিখিত আয়াতের উপর ভিত্তি করে শুধুমাত্র পানাহার ও যৌন সঙ্গম ব্যতীত অন্য যে কোন কারণে রোযা না ভাঙ্গার যে অভিমত পেশ করেছেন তা ইজমায়ে উম্মতের পরিপন্থী। কেননা এ আয়াতে “উল্লিখিত তিন বস্তু থেকে বিরত থাকাকে শরয়ী রোযা বলা হয়েছে মাত্র, এ তিন বস্তু ছাড়া অন্য কোন বস্তু থেকে বিরত থাকার নাম রোযা নয়” এমন কোন কথার উল্লেখ করা হয়নি। বহু হাদীস এবং ইজমায়ে উম্মত দ্বারা প্রমাণিত যে, আয়াতে উল্লিখিত তিন বস্তু ব্যতীত অন্যান্য আরও কিছু এমন বস্তু রয়েছে যেগুলো থেকে বিরত থাকাকেও শরয়ী রোযা বলে।

---

৫০৭ মাজমূআয়ে ফাতাওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়া, খ. ২৫, পৃ. ২৩৩-২৩৫

508 سورة البقرة، الآية: ١٨٧ .

৫০৯ সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৭

١- عن لقيط بن صبرة-رضي الله تعالى عنه-، عن النبى صلى الله عليه وسلم، قال: بالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائما.[٥١٠]

(১) অর্থ- হযরত লাকীত ইবনে সাবুরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ (উযূর সময়) নাকে ভালভাবে পানি পৌঁছাও, তবে রোযা অবস্থায় নয়।[৫১১]

উল্লিখিত হাদীসে রোযা অবস্থায় নাকে ভালভাবে পানি না পৌঁছানোর আদেশ এ কথা প্রমাণ করে যে, নাক দিয়ে পানি পৌঁছালে রোযা ভেঙ্গে যায়। নতুবা রোযা অবস্থায় নাকে ভালভাবে পানি না পৌঁছানোর আদেশ দেয়ার কী অর্থ? অথচ রোযা না থাকা অবস্থায় ভালভাবে পানি পৌঁছানোর আদেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং উক্ত সহীহ হাদীস থেকে এ মূলনীতি উদঘাটিত হয় যে, কোন কিছু খাদ্যনালীর মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করলে যেভাবে রোযা ভেঙ্গে যায়, দেহের অন্যান্য গ্রহণযোগ্য রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করলেও তদ্রুপ রোযা ভেঙ্গে যায়।

٢- عن أبى هريرة-رضي الله تعالى عنه-، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الصيام جنة فلا يرفث، ولايجهل، فإن امرء قاتله، أو شاتمه، فليقل إنى صائم -مرتين-، والذى نفسى بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من

---

510 أخرجه الترمذى فى باب ماجاء فى كراهية الاستنشاق للصائم، ١: ١٦٣، واللفظ له، رقم الحديث: ٧٨٨، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأبوداؤد فى الصوم، باب الصائم يصب عليه الماء، ١: ٣٢٢، رقم الحديث: ٢٣٦٦، والنسائى فى الطهارة ، المبالغة فى الاستنشاق ، ١: ١٢، رقم الحديث: ٨٧٠ .

৫১১ তিরমিযী, খ. ১, পৃ. ১৬৩, হাদীস নং ৭৮৮, আবূ দাউদ, খ. ১, পৃ. ৩২২, হাদীস নং ২৩৬৬, নাসায়ী, খ. ১, পৃ. ১২, হাদীস নং ৮৭০

ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلى، الصيام لى وأنا أجزى به، والحسنة بعشر أمثالها.[٥١٢]

(২) অর্থ- হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ রোযা হল ঢাল স্বরূপ। অতএব রোযা অবস্থায় অশ্লীল কথা বার্তা, যৌন সঙ্গম ও যৌনকার্যের ভূমিকা সমূহ এবং অসদাচারণ থেকে বেঁচে থাক। কেউ ঝগড়া বা অশ্লীল গালি-গালাজ করলে তার উত্তরে বলবেঃ 'আমি রোযাদার, আমি রোযাদার'। শপথ ঐ সত্তার যার হাতে আমার জীবন, নিঃসন্দেহে রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ তা'আলার নিকট মেশকের ঘ্রাণের চেয়েও উত্তম। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ সে আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পানাহার ও যৌন কার্যকলাপ থেকে বিরত রয়েছে, রোযা আমার জন্যই রাখা হয়, আর আমি নিজেই তার প্রতিদান এবং নেকী দশগুণ বেশী বৃদ্ধি হয়।[৫১৩]

উক্ত হাদীসে شهوة (কামভাব) শব্দ যেভাবে যৌন সঙ্গম কে বুঝায় তেমনিভাবে অন্যান্য সকল যৌন কার্যকলাপ, হস্তমৈথুন ও যোনিদ্বার ব্যতীত অন্য যে কোন পন্থায় ধাতু নির্গত করা ইত্যাদি বিষয়গুলোকেও বুঝায়, তদ্রূপ অশ্লীল কথাবার্তা যেভাবে 'فلا يرفث' শব্দের অন্তর্ভুক্ত তেমনিভাবে সকল যৌন কার্যকলাপও এর অন্তর্ভুক্ত।[৫১৪]

এ হাদীস দ্বারা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, যেমনিভাবে যৌন সঙ্গম দ্বারা রোযা ভেঙ্গে যায় তেমনিভাবে সকল প্রকার যৌন কার্যকলাপ দ্বারাও রোযা ভেঙ্গে যায়। অর্থাৎ যোনিদ্বারে যৌনাঙ্গ প্রবেশ করানো ও এমন যৌন কার্যকলাপ যা উত্তেজনা সৃষ্টির মাধ্যমে ধাতু নির্গত করে; এমন কাজ দ্বারা রোযা ভেঙ্গে যাবে। তবে ঐ সমস্ত কার্যকলাপ দ্বারা রোযা ভাঙ্গবে না

---

512 أخرجه البخارى فى الصوم، باب فضل الصوم، ١: ٢٥٤، رقم الحـــديث: ١٨٩٤، ومسلم فى الصيام،باب فضل الصيام، ١: ٣٦٣، رقم الحديث: ١١٥١ .

৫১৩ বুখারী, খ. ১, পৃ. ২৫৪, হাদীস নং ১৮৯৪, মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৩৬৩, হাদীস নং ১১৫১

৫১৪ ফাতহুল বারী, খ. ৪, পৃ. ১০৪

যেগুলোর ব্যাপারে রোযা না ভাঙ্গার কথা হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। যেমনঃ চুম্বণ ইত্যাদি।

٣– عن عائشة–رضي الله تعالى عنها–، قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت.[٥١٥]

(৩) অর্থ- হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম রোযা অবস্থায় তার কোন কোন স্ত্রীকে চুমু খেতেন। অতঃপর (একথা বলে) তিনি হেসে দিলেন।[৫১৬]

٤– عن زينب ابنة أم سلمة، عن أمها، قالت ... وكانت هى و رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد، وكان يقبلها وهو صائم.[٥١٧]

(8) অর্থ- হযরত উম্মে সালামা (রাযি.) থেকে বর্ণিত ... তিনি এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একটি পাত্র থেকে গোসল করতেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম রোযা অবস্থায় তাকে চুমু খেতেন।[৫১৮]

হাদীসদ্বয় দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, ধাতু নির্গত হওয়া ছাড়া যে কোন যৌনকর্ম দ্বারা রোযা ভাঙ্গবে না। বরং কিছু কিছু যৌনকর্ম দ্বারা রোযা ভাঙ্গবে। আর তা হচ্ছে, যৌনাঙ্গকে যোনিদ্বারে প্রবেশ করানো অথবা উত্তেজনার সাথে বীর্য নির্গত হওয়া।

٥– عن أبي هريرة–رضي الله تعالى عنه– ... يدع الشراب من أجلى، ويدع لذته من أجلى،ويدع زوجته من أجلى، إلخ .[٥١٩]

---

515 أخرجه البخارى فى الصوم، باب القبلة للصائم، ١: ٢٥٨، رقم الحديث: ١٩٢٨ .

৫১৬ বুখারী, খ. ১, পৃ. ২৫৮, হাদীস নং ১৯২৮

517 أخرجه البخارى فى باب القبلة للصائم، ١: ٢٥٨، رقم الحديث: ١٩٢٩ .

৫১৮ বুখারী, খ. ১, পৃ. ২৫৮, হাদীস নং ১৯২৯

519 أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه، باب ذكر إعطاء الرب –عزوجل– الصائم أجره بغـــير حساب، رقم الحديث: ١٨٩٧.

(৫) অর্থ- হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, ... (আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ) সে কেবল আমার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে পান করা, স্বাদ আস্বাদন এবং স্ত্রী সম্ভোগ থেকে বিরত থেকেছে।[৫২০]

উক্ত হাদীস থেকে এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, 'لذة' শব্দ দ্বারা শুধু যৌন সঙ্গম উদ্দেশ্য নয় বরং সর্ব প্রকার উত্তেজনামূলক যৌন কার্যকলাপসহ সব ধরণের স্বাদ আস্বাদন করা থেকে বিরত থাকাই উদ্দেশ্য। অন্যথায় এর পর 'زوجته' শব্দ উল্লেখ করার কোন অর্থ থাকতে পারে না।

সুতরাং শুধু পানাহার ও যোনিদ্বার ব্যবহারের মাধ্যমে যৌন ক্ষুধা মেটানোর মধ্যে রোযা ভাঙ্গার কারণগুলোকে সীমিত রাখা কোনভাবে যুক্তি সঙ্গত হতে পারেনা।[৫২১]

❖ ❖ ❖

الموانع المعتبرة من الفطر
রোযা ভাঙ্গার গ্রহণযোগ্য প্রতিবন্ধক সমূহ

রোযা ভাঙ্গার ব্যাপারে উল্লিখিত চারটি বস্তু পাওয়া সত্ত্বেও কোন্ প্রতিবন্ধকতার কারণে রোযা ভাঙ্গে না এবং ঐ প্রতিবন্ধকগুলো কি কি? তা নিয়ে আলোচনা করা আবশ্যক। রোযা ভাঙ্গার ব্যাপারে ফকীহগণ যে সমস্ত প্রতিবন্ধক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, এর সংখ্যা মোট আটটি। যথা-

১. বিস্মৃতি النسيان
২. আধিক্য - الغلبة

---

৫২০ সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস নং ১৮৯৭

৫২১ আহকামুল কুরআন লিল জাস্সাস, খ. ১, পৃ. ১৯১-১৯২, আহকামুল কুরআন লিত থানভী, খ. ১, পৃ. ১৬৬

(أحكام القرآن للجصاص، ١: ١٩١-١٩٢، وأحكام القرآن للتهانوى، الجزء الأول من المجلد الأول، ص: ١٦٦)

৩. বাধ্য করা - الإكراه
৪. অনিচ্ছা - الخطاء
৫. নিদ্রা - النوم
৬. অজ্ঞান - الإغماء
৭. পাগলামি - الجنون
৮. হারাম সম্পর্কে অজ্ঞতা - الجهل بالتحريم

নিম্নে পর্যায়ক্রমে এগুলোর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ পেশ করা হল।

১- বিস্মৃতি (النسيان)

বিস্মৃতি (نسيان) এর সংজ্ঞা

حقيقة النسيان عدم استحضار الشيئ وقت حاجته. [٥٢٢]

অর্থ- প্রয়োজনের সময় কোন বস্তু স্মরণে না আসাকে বিস্মৃতি (نسيان) বলে।[৫২৩]

বিস্মৃতি (نسيان) এর হুকুম

জমহুর ফুকাহার নিকট বিস্মৃতি (نسيان) مانع فطر তথা রোযা ভাঙ্গার প্রতিবন্ধক।

অতএব, বিস্মৃতি (نسيان) অবস্থায় কিছু ভক্ষণ করলে রোযা ভাঙ্গবে না।

عن أبي هريرة –رضي الله تعالى عنه–، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا، فلا يفطر، فإنما هو رزق رزقه الله. [٥٢٤]

---

522 البحر الرائق، ٢: ٢٧١ .

৫২৩ আল বাহরুর রায়িক, খ. ২, পৃ. ২৭১

অর্থ- হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি রোযা অবস্থায় ভুলে পানাহার করবে তার রোযা ভাঙ্গবে না। কেননা ইহা আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে রিযিক, যা তাকে খাওয়ানো হয়েছে।[৫২৫]

২- আধিক্য (الغلبة)

আধিক্য (غلبة) এর সংজ্ঞা

الغلبة مالا يستطاع الامتناع منها.[٥٢٦]

আধিক্য (غلبة) বলা হয়, যার থেকে বেঁচে থাকা অসম্ভব।[৫২৭]

যেমনঃ মশা-মাছি, ধুলা-বালি, ধোঁয়া, কুয়াশা, বাষ্পসহ সকল ধরণের উড়ন্ত গুঁড়ি, যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও নাক-মুখ দিয়ে শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে থাকে।

আধিক্য (غلبة) এর হুকুম

আধিক্য (غلبة) রোযা ভাঙ্গার গ্রহণযোগ্য প্রতিবন্ধক। অতএব, আধিক্য (غلبة) অবস্থায় কোন কিছু দেহের ভিতরে প্রবেশ করলে রোযা ভাঙ্গবে না। তাইতো ইচ্ছাপূর্বক বিড়ি, সিগারেট ও আগরবাতির ধোঁয়া ইত্যাদি গ্রহণ করলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। কারণ, এগুলো আধিক্য (غلبة) এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

---

524 أخرجه البخارى فى الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، ١: ٢٥٩، رقم الحديث: ١٩٣٣،وانظر أيضا رقم الحديث: ٦٦٦٩، والترمذى فى الصوم، باب ماجاء فى الصائم يأكل ويشرب ناسيا، ١: ١٥٣، رقم الحديث: ٧١٧ واللفظ له .

৫২৫ বুখারী, খ. ১, পৃ. ২৫৯, হাদীস নং ১৯৩৩, ৬৬৬৯, তিরমিযী, খ. ১, পৃ. ১৫৩, হাদীস নং ৭১৭

526 المبسوط للسرخسى، ٣: ٩٣ .

৫২৭ আল মাবসূত লিস সারাখসী, খ. ৩, পৃ. ৯৩

وإذا دخل الغبار أو الدخان حلق الصائم لم يضره، لأن هذا لا يستطاع الامتناع منه، فالتنفس لا بد منه للصائم، والتكليف بحسب الوسع. [٥٢٨]

অর্থ- রোযাদার ব্যক্তির মুখে ধুলা-বালি অথবা ধোঁয়া ঢুকলে রোযার কোন ক্ষতি হয় না। কারণ, এর থেকে বাঁচা সম্ভব নয়। যেহেতু তাকে তো নিঃশ্বাস নিতেই হবে। আর দায়িত্ব সাধ্য অনুযায়ী অর্পিত হয়।[৫২৯]

وفى كتاب الأصل للإمام محمد (٢: ٣٣٩)، قلت: أرأيت الصائم يدخل الذباب جوفه أو الشئ من الطعام يكون بين أسنانه، فيدخل جوفه، هل يفطر ذلك؟ وقد دخل جوفه وهو ذاكر لصومه وكاره؟ قال: لا يفطره ذلك، وهو على صومه ... لأنه مغلوب.

وفى المبسوط للسرخسى (٣: ٩٣): لأنه لايستطاع الامتناع منه، فإن الصائم لا يجد بداً من أن يفتح فمه، فيتحدث مع الناس، ومالا يمكن التحرز عنه، فهو عفو.

অর্থ- ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর 'কিতাবুল আছল' (খ. ২, পৃ. ৩৩৯) এ উল্লেখ আছে, তিনি বলেনঃ আমি ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহ.) কে জিজ্ঞেস করলাম যে, রোযাদারের পেটে মাছি অথবা দাঁতের ফাঁকে আটক থাকা বুট থেকে কম পরিমাণের সামান্য খাদ্য-দ্রব্য ঢুকলে রোযা কি ভেঙ্গে যাবে? পেটে ঢুকা অবস্থায় রোযার কথা তার স্মরণ ছিল এবং সে তা পেটে ঢুকাকে অপছন্দ করেছিল। তিনি উত্তরে বললেনঃ এতে রোযা ভাঙ্গবে না, তার রোযা বহাল থাকবে ... কেননা সে مغلوب তথা অপারগ ছিল।

'আল মাবসূত লিস সারাখসী' (খ. ৩, পৃ. ৯৩) -তে এর কারণ উল্লেখ আছে যে, এর থেকে বাঁচা সম্ভব নয়। যেহেতু রোযাদার কথা বার্তা ইত্যাদির জন্য মুখ খুলতে বাধ্য। আর যে সকল বস্তু থেকে বাঁচা সম্ভব নয় সেগুলো ক্ষমার্হ।

---

528 المبسوط للسرخسى، كتاب الصوم، ٣: ٩٨ .

529 আল মাবসূত লিল ইমাম সারাখসী, খ. ৩, পৃ. ৯৮

৩- বাধ্যকরণ (الإكراه)

বাধ্যকরণ (إكراه) এর সংজ্ঞা

هو إجبار أحد على أن يعمل عملا بغير حق من دون رضاه بالإخافة.[٥٣٠]

অর্থ- অন্যায়ভাবে ভীতি প্রদর্শন করে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাউকে কোন কাজ করতে বাধ্য করা।[৫৩১]

বাধ্যকরণ (إكراه) এর হুকুম

বাধ্যকরণ (إكراه) রোযা ভাঙ্গার গ্রহণযোগ্য প্রতিবন্ধক নয়। অতএব 'إكراه' অবস্থায় রোযা ভঙ্গের কোন কারণ পাওয়া গেলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। তবে এতে রোযার কাযা ওয়াজিব হবে, কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না।

إذا أكره الصائم حتى صب الماء فى حلقه والشراب، فعليه القضاء، ولا كفارة عليه.[٥٣٢]

অর্থ- রোযাদার ব্যক্তির গলায় জোরপূর্বক পানি অথবা পানীয় কোন বস্তু ঢেলে দিলে (তার রোযা ভেঙ্গে যাবে)। অতএব, তার উপর ঐ রোযার কাযা ওয়াজিব হবে, কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না।[৫৩৩]

৪- অনিচ্ছা (الخطاء)

অনিচ্ছা (خطاء) এর সংজ্ঞা

حقيقة الخطاء أن يقصد بالفعل غير المحل الذى يقصد به الجناية، كالمضمضة تسرى إلى الحلق.[٥٣٤]

---

530 **مجموعة قواعد الفقه، للمفتى عميم الإحسان، ص: ١٨٨.**

531 মাজমূআয়ে কাওয়ায়িদুল ফিকহ, পৃ. ১৮৮

532 **المبسوط للإمام محمد، ٢: ٢٤٤ .**

533 আল মাবসূত লিল ইমাম মুহাম্মাদ, খ. ২, পৃ. ২৪৪

অর্থ- 'خطاء' ঐ ভুল কে বলা হয় যে ভুল ইচ্ছাধীন কাজে অনিচ্ছায় সংঘটিত হয়। যেমন- ইচ্ছাধীন কাজ উযূর কুলির সময় রোযা স্মরণ থাকা অবস্থায় অনিচ্ছায় পানি ভিতরে চলে যাওয়া।[৫৩৫]

অনিচ্ছা (خطاء) এবং বিস্মৃতি (نسيان) এর পার্থক্য

والفرق بين صورة الخطاء والنسيان هنا أن المخطى ذاكر للصوم و غير قاصد للشرب، والناسى عكسه.[٥٣٦]

অর্থ- ভুল ও অনিচ্ছার মধ্যে পার্থক্য হল, 'خطاء' তথা- অনিচ্ছা অবস্থায় রোযা স্মরণ থাকে, কিন্তু পান করার ইচ্ছা থাকে না। পক্ষান্তরে, 'نسيان' তথা ভুল- এর অবস্থায় পান করার ইচ্ছা থাকে, রোযা স্মরণ থাকে না।[৫৩৭]

অনিচ্ছা (خطاء)এর হুকুম

অনিচ্ছা (خطاء) রোযা ভাঙ্গার গ্রহণযোগ্য প্রতিবন্ধক নয়। অতএব, রোযা স্মরণ থাকাবস্থায় কুলি কিংবা নাকে পানি দেয়ার সময় অনিচ্ছাকৃত ভাবে পানি ভিতরে প্রবেশ করলেও রোযা ভেঙ্গে যাবে। চাই কুলি ও নাকে পানি দেয়ার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করা হোক বা না হোক, তিন বা ততোধিক বার পানি ব্যবহার করুক বা না করুক।

قال محمد: أخبرنا أبوحنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: فى الرجل يمضمض أو يستنشق وهو صائم، فيسبقه الماء، فيدخل حلقه، قال: يتم صومه، ثم

---

534 البحر الرائق، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لايفسده، ٢: ٤٧٥

535 আল বাহরুর রায়িক, খ. ২, পৃ. ৪৭৫

536 البحر الرائق، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لايفسده، ٢: ٤٧٥، عن الغاية

.

537 আল বাহরুর রায়িক, খ. ২, পৃ. ৪৭৫

يقضى يوما مكانه، قال محمد: وبه نأخذ إن كان ذاكرا لصومه، فإذا كان ناسيا للصوم فلا قضاء عليه، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.[٥٣٨]

অর্থ- ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) বলেনঃ ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) হযরত হাম্মাদ থেকে, তিনি ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেনঃ কোন রোযাদার ব্যক্তি কুলি অথবা নাকে পানি দেওয়ার সময় পানি গলায় পৌঁছে গেলে (তার রোযা ভেঙ্গে যাবে তবে) সে পূর্ণ দিন রোযাদারের মতই থাকবে, পরবর্তীতে এ রোযার কাযা করে নিবে। ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) বলেনঃ আমরা এ মতকেই গ্রহণ করে থাকি। (এই হুকুমটি ঐ অবস্থার) যখন রোযা স্মরণ থাকে। আর রোযা স্মরণ না থাকলে রোযা ভাঙ্গবে না, সুতরাং এর কাযাও লাগবে না। এটাই ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর মত।[৫৩৯]

৫- নিদ্রা (النوم)

নিদ্রা (النوم) এর সংজ্ঞা

غياب الإرادة والوعى، وتوقف بعض الأعضاء عن العمل بغير عاهة.[٥٤٠]

অর্থ- ইচ্ছা ও সংরক্ষণ ক্ষমতার অনুপস্থিতে কোন প্রকার ব্যাধি ব্যতীত কোন কোন অঙ্গের কার্যক্ষমতা বন্ধ থাকাকে নিদ্রা (نوم)বলে।[৫৪১]

নিদ্রা (النوم) এর হুকুম

নিদ্রা রোযা ভাঙ্গার গ্রহণযোগ্য প্রতিবন্ধক নয়। অতএব ঘুমন্ত ব্যক্তির গলায় খাদ্য ও পানি ইত্যাদি পৌঁছালে রোযা ভেঙ্গে যাবে।

---

538 كتاب الأثار للإمام محمد مع الأزهار، باب ما ينقض الصوم، ٢: ٤٥٠، مطبع دار التصنيف، باكستان.

539 কিতাবুল আছার [আয্‌হার সংলগ্ন], খ. ২, পৃ. ৪৫০

540 معجم لغة الفقهاء، ص: ٤٦١.

541 মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা, পৃ. ৪৬১

فإذا صب فى جوف النائم ماء أو شراب وهو نائم فعليه القضاء، ولا كفارة عليه، وكذلك المرأة بمنــزلة الرجل فى ذلك.[٥٤٢]

অর্থ- ঘুমন্ত ব্যক্তির পেটে পানি অথবা শরবত প্রবিষ্ট করালে (তার রোযা ভেঙ্গে যাবে, ফলে) তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে, কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। পুরুষদের ন্যায় মহিলাদেরও এই হুকুম।[৫৪৩]

একটি প্রশ্ন ও তার জওয়াব

এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, নিদ্রা যখন রোযা ভঙ্গের প্রতিবন্ধক নয়, তাহলে স্বপ্নদোষ হলে রোযা ভাঙ্গবে না কেন?

উত্তর: স্বপ্নদোষ غلبة তথা আধিক্যের অন্তর্ভুক্ত। তাই এতে রোযা ভাঙ্গবে না। কেননা আধিক্য রোযা ভঙ্গ হওয়ার গ্রহণযোগ্য প্রতিবন্ধক।

৬- অজ্ঞান হওয়া (الإغماء)

অজ্ঞান হওয়া (إغماء) এর সংজ্ঞা

هو نوع مرض يزيل القوة أى تعطلها، ولا يزيل العقل، بخلاف الجنون، فإنه يزيل العقل.[٥٤٤]

অর্থ- إغماء (অজ্ঞান হওয়া) এমন রোগকে বলা হয়, যে রোগ ইন্দ্রিয় শক্তিকে দূরীভূত ও অকেজো করে দেয়, কিন্তু আকলকে দূরীভূত করে না। পক্ষান্তরে, পাগলামি আকলকে দূরীভূত করে দেয়।[৫৪৫]

---

542 المبسوط للإمام محمد، ٢: ٢٤٤.

543 আল মাবসূত লিল ইমাম মুহাম্মদ, খ. ২, পৃ. ২৪৪

544 منتخب الحسامى، ص: ١٧٨، وتسهيل الوصول، ص: ٣٠٩، وكنــز الوصول إلى معرفة الأصول المعروف بأصول البزدوى، ص: ٣٣٢ .

অজ্ঞান হওয়া (إغماء) এর হুকুম

হানাফী ও মালেকী মাযহাবের কিতাবাদিতে অজ্ঞান অবস্থায় রোযা ভাঙ্গা বা না ভাঙ্গার ব্যাপারে পরিষ্কার ভাবে কোন কিছু পাওয়া যায় না, তাদের এ ব্যাপারে নিরবতা থেকে একথা বুঝা যায় যে, অজ্ঞান হওয়া (إغماء) রোযা ভাঙ্গার গ্রহণযোগ্য প্রতিবন্ধক নয়। এছাড়া أصول (ইসলামী মূলনীতি) বিশারদগণের কথা দ্বারা এর সমর্থনও পাওয়া যায়, তাদের ভাষ্যমতে "রোযা কাযা করার ব্যাপারে অজ্ঞান হওয়া (إغماء) এর হুকুম নিদ্রার হুকুমের ন্যায়।" আর এর উপরই দারুল উলূম দেওবন্দের সাবেক প্রধান মুফতী হযরত মাওলানা মুফতী আযীযুর রহমান (রহ.) ফতোয়া দিয়েছেন।[৫৪৬]

৭- পাগলামি (الجنون)

পাগলামি (جنون) এর সংজ্ঞা

زوال العقل أو إختلاله بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادرا... بسبب خلط أو آنة.[٥٤٧]

অর্থ- বিবেক লোপ পাওয়া ও মস্তিষ্কে বিকৃতি ঘটা অথবা কোন ব্যাধির কারণে এমনভাবে বিবেক-বুদ্ধিতে ত্রুটি দেখা দেয়া যা বুদ্ধি-বিবেচনা সম্মত কথা ও কাজ করতে অধিকাংশ সময় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।[৫৪৮]

---

৫৪৫ মুনতাখাবুল হুসামী, পৃ. ১৭৮, তাসহীলুল উসূল, পৃ. ৩০৯, উসূলুল বাযদাভী, পৃ. ৩৩২

৫৪৬ ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ, খ. ৬, পৃ. ৪৮৬

547 معجم المصطلحات للألفاظ الفقهية، ١: ٥٤٢.

548 মু'জামুল মুসতালাহাতি লিল আলফাযিল ফিকহিয়্যা, খ. ১, পৃ. ৫৪২

পাগলামি (جنون) এর হুকুম

পাগলামি (جنون) রোযা ভাঙ্গার গ্রহণযোগ্য প্রতিবন্ধক নয়। অতএব, কেউ যদি পাগল অবস্থায় কিছু খায় অথবা সহবাস করে তাহলে তার রোযা ভেঙ্গে যাবে।

وكذا ... المجنونة جامعها زوجها فسد صومها.[৫৪৯]

অর্থ- পাগল মহিলার সাথে তার স্বামী সহবাস করলে তার (ঐ মহিলার) রোযা ভেঙ্গে যাবে।[৫৫০]

৮- হারাম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা (الجهل بالتحريم)

হারাম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা (الجهل بالتحريم) এর হুকুম

ফিক্‌হের কিতাবাদিতে الجهل بالتحريم অর্থাৎ না জানার কারণে রোযা ভঙ্গকারী কোন কারণ পাওয়া গেলে তা রোযা ভঙ্গের প্রতিবন্ধক হিসেবে গণ্য হবে কি না? এ ব্যাপারে স্পষ্ট কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে উসূল (ইসলামী মূলনীতি) বিশারদগণের ভাষ্যমতে ইসলামী রাষ্ট্রকে জানার স্থলাভিষিক্ত মনে করা হয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে নাজানাকে উযর হিসেবে গণ্য করা হবে না।

এখান থেকে একথা বুঝা যায় যে, অমুসলিম রাষ্ট্রে হারাম সম্পর্কে অজ্ঞতা (الجهل بالتحريم) উযর হিসেবে গণ্য হবে। উল্লেখ্য যে, الجهل بالتحريم কে উযর হিসেবে মানা না মানার যে কারণ দর্শানো হয়েছে অর্থাৎ জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম ও সুযোগ সুবিধা না থাকা।

এর থেকে এ বিষয় স্পষ্ট বুঝে আসে যে, যদি কোন অমুসলিম রাষ্ট্র এমন হয় যেখানে আলেম-উলামা ও মুসলমান থাকার কারণে ইসলামী হুকুম-আহকাম বহুল প্রচারিত, সেখানে অতি সহজেই ইসলামী জ্ঞান

---

549 بدائع الصنائع، فصل ركن الصوم، ٢: ٩١.

550 বাদায়েউস সানায়ে, খ. ২, পৃ. ৯১

অর্জন করা যায়, যেমন ভারত, এমন অমুসলিম রাষ্ট্রে না জানা (الجهل بالتحريم) রোযা ভাঙ্গার প্রতিবন্ধক হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা এমন স্থানে আলেমদের থেকে জিজ্ঞেস করে মাসআলা-মাসাইল জেনে নেয়া অসম্ভব কিছু নয়। আর এর উপরই অদ্যাবধি ভারতবর্ষের মুফতীগণের আমল চলে আসছে। তাই ভারতবর্ষে মাসআলা-মাসাইল না জানাকে রোযা না ভাঙ্গার কারণ হিসেবে গ্রহণ করা হবে না। বরং সেখানে রোযা ভাঙ্গার হুকুমই প্রযোজ্য হবে।[৫৫১]

❖ ❖ ❖

551 কানযুল ওয়াসূল ইলা মা'রিফাতিল উসূল লি ফখরিল ইসলাম আল বাযদাভী, পৃ. ৩৪৫, কাশফুল আসরার লিল ইমাম আন্নাছাফী মাআ' নূরিল আনওয়ার, খ. ২, পৃ. ৫৩১-৫৩২, তাইসিরুত্ তাহরীর লি মুহাম্মদ আমীন (আমীর বাদশাহ), খ. ৪, পৃ. ২২৫, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ (জাদীদ), খ. ৬, পৃ. ১৬১

৪র্থ অধ্যায়

المسائل الجديدة المتعلقة بالصوم

রোযা সংক্রান্ত আধুনিক মাসাইল

Modern Problem About Fast

১. মস্তিষ্ক অপারেশন

রোযা অবস্থায় মস্তিষ্ক অপারেশন করলে রোযা ভঙ্গ হবে না। যদিও মস্তিষ্কে কোন তরল কিংবা শক্ত ওষুধ ব্যবহার করা হয়। কেননা মস্তিষ্ক থেকে গলা পর্যন্ত সরাসরি কোন ছিদ্র ও পথ নেই। তাই মস্তিষ্কে কোন কিছু দিলে তা গলায় পৌঁছে না। পূর্ব যুগে ছিদ্র ও পথ আছে ধারণা করেই এতে রোযা ভেঙ্গে যাওয়ার কথা বিভিন্ন কিতাবাদিতে উল্লেখ রয়েছে।

২. কানে ওষুধ বা ড্রপ ব্যবহার

কানে ড্রপ, ওষুধ, তেল ও পানি ইত্যাদি দিলে রোযা ভঙ্গ হবে না। কারণ, কান থেকে গলা পর্যন্ত কোন রাস্তা নেই। তাই কানে কিছু দিলে তা গলায় পৌঁছে না। আদি যুগে ছিদ্র পথ আছে বলে ধারণা করা হতো বিধায় সে যুগের কিতাবাদিতে রোযা ভেঙ্গে যাওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে।

৩. চোখে ওষুধ বা ড্রপ ব্যবহার

চোখে ড্রপ, সুরমা ও মলম ইত্যাদি ব্যবহার করলে রোযা ভঙ্গ হবে না। যদিও এগুলোর স্বাদ গলায় উপলব্ধি হয়। কারণ চোখে কিছু দিলে রোযা না ভাঙ্গার কথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

৪. নাকে ওষুধ বা ড্রপ ব্যবহার

নাকে ড্রপ, পানি ইত্যাদি দিয়ে ভেতরে টেনে নিলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কারণ নাক রোযা ভঙ্গ হওয়ার গ্রহণযোগ্য রাস্তা। নাকে ড্রপ ইত্যাদি দিলে তা গলা পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

৫. অক্সিজেন (OXIZEN) ব্যবহার

নাকে অক্সিজেন নিলে রোযা ভঙ্গ হবে না। কারণ অক্সিজেন দেহবিশিষ্ট কোন বস্তু নয়। রোযা ভঙ্গ হতে হলে দেহবিশিষ্ট কোন বস্তু দেহের অভ্যন্তরের গ্রহণযোগ্য জায়গায় পৌঁছাতে হয়।

৬. মুখে ওষুধ ব্যবহার

মুখে কোন ওষুধ ব্যবহার করে তা গিলে ফেললে রোযা ভেঙ্গে যাবে। চাই তা যতই অল্প হোক।

৭. সালবুটামল (SULBUTAMOL), ইনহেলার (INHALER) ব্যবহার

সালবুটামল, ইনহেলার ব্যবহার করলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। শ্বাস কষ্ট দুর করার জন্য ওষুধটি মুখের ভেতর স্প্রে করা হয়। এতে যে জায়গায় শ্বাসরুদ্ধ হয় ঐ জায়গাটি প্রশস্ত হয়ে যায়। ফলে শ্বাস চলাচলে আর কোন কষ্ট থাকে না। ওষুধটি যে শিশিতে যে পরিমাণে থাকে ঐ শিশির মুখ একবার টিপলে শিশির আকারভেদে ঐ পরিমাণের একশত কিংবা দুইশত ভাগের এক ভাগ বেরিয়ে আসে। অতি স্বল্প পরিমাণে গ্যাসের ন্যায় বের হওয়ার কারণে কেউ ওষুধটিকে বাতাস জাতীয় মনে করতে পারে। কিন্তু বাস্তবে এমন নয় বরং ওষুধটি দেহবিশিষ্ট। কাঠ ইত্যাদি কোন বস্তুতে স্প্রে করলে দেখা যায় যে, ঐ বস্তুটি ভিজে গেছে। তাই এতে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

অনেককে বলতে শুনা যায় যে, 'ইনহেলার অতি প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়, তাই এতে রোযা ভঙ্গ হবে না।' কথাটি একেবারেই হাস্যকর। কেননা কেহ যদি ক্ষুধায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে অতি প্রয়োজনে কিছু খেয়ে

ফেলে তাহলে কি অতি প্রয়োজনে খাওয়ার কারণে তার রোযা ভঙ্গ হবে না? অবশ্যই হবে। অতি প্রয়োজনের সময় রোযা ভাংলে পরবর্তিতে কাযা করা ও এতে গুনাহ না হওয়া ভিন্ন কথা। আর রোযা ভঙ্গ না হওয়া ভিন্ন কথা।

হ্যাঁ, যদি মুখে ইনহেলার স্প্রে করার পর না গিলে থুথু দিয়ে তা বাইরে ফেলে দেয়া হয়, তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে না। এভাবে কাজ চললে তো বিষয়টি অনেক সহজ হয়ে যাবে। এতে শ্বাস কষ্ট থেকে রেহাই পাওয়ার পাশাপাশি রোযাও ভঙ্গ হলো না।

রোযা অবস্থায় ইনহেলার ব্যবহারের নিয়ম

কোন কোন চিকিৎসক বলেনঃ সাহরীতে এক ডোজ ইনহেলার নেয়ার পর সাধারণত ইফতার পর্যন্ত আর ইনহেলার নেয়ার প্রয়োজন পড়ে না। তাই এভাবে ইনহেলার ব্যবহার করে রোযা রাখা চাই। হ্যাঁ, যদি কারো বক্ষব্যাধি এমন জটিল ও মারাত্মক আকার ধারণ করে যে, ইনহেলার নেয়া ব্যতীত ইফতার পর্যন্ত অপেক্ষা করা যায় না, তাদের ক্ষেত্রে শরীআতে এ সুযোগ রয়েছে যে, তারা প্রয়োজনভেদে ইনহেলার ব্যবহার করবে ও পরবর্তিতে রোযার কাযা করে নিবে। আর কাযা সম্ভব না হলে 'ফিদিয়া' আদায় করবে।

৮. এন্ডোস্কপি (ENDOSCOPY)

এন্ডোসকপি করালে রোযা ভঙ্গ হবে না। চিকন একটি পাইপ মুখ দিয়ে ঢুকিয়ে পাকস্থলীতে পৌছানো হয়। পাইপটির মাথায় বাল্ব জাতীয় একটি বস্তু থাকে। পাইপটির অপর প্রান্তে থাকা মনিটরের মাধ্যমে রোগীর পেটের অবস্থা নির্ণয় করা হয়। একে "এন্ডোস্কপি" বলে।

সাধারণত এন্ডোসকপিতে নল বা বাল্বের সাথে কোন মেডিসিন লাগানো থাকে না। তাই এন্ডোসকপির কারণে রোযা ভঙ্গ হবে না। নল বা বাল্বে কোন মেডিসিন লাগানো থাকলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

তেমনিভাবে টেষ্টের প্রয়োজনে কখনও পাইপের ভেতর দিয়ে পানি ছিটানো হয়। এমন করলেও রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

৯. নাইট্রোগ্লিসারিন (NITROGLYCERINE)

নাইট্রোগ্লিসারিন ব্যবহার করলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এ্যারোসল জাতীয় একটি ওষুধ যা হার্টের রোগীদের এভাবে ব্যবহার করানো হয় যে, ২/৩ ফোটা ওষুধ জিহবার নিচে দিয়ে মুখ বন্ধ করে রাখা হয়। এতে ঐ ওষুধটি যদিও শিরার মাধ্যমে রক্তের সাথে মিশে যায়। তারপরেও ওষুধের কিছু অংশ গলায় পৌঁছে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। এতে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর এর মধ্যেই সতর্কতা (وفيه الاحتياط)। তবে যদি ওষুধটি ব্যবহারের পর না গিলে থুথু দিয়ে ফেলে দেয়া হয় তাহলে আর রোযা ভঙ্গ হবে না। কারণ, না গিলে শুধু শিরার মাধ্যমে কিছু ঢুকলে রোযা ভঙ্গ হয় না।

১০ . ওষুধ সেবন করে হায়েয বন্ধ করে রোযা রাখা

মহিলাদের ঋতু আসা একটি স্বভাবজাত বিষয়। সৃষ্টিগত ভাবে তাদের সাথে সম্পৃক্ত। তাই ইসলামী শরীআতে উক্ত দিনগুলোতে মহিলাদেরকে মা'যূর গণ্য করে তাদের থেকে নামায-রোযা ইত্যাদির যিম্মাদারী উঠিয়ে নিয়েছে। সনাতন ও আধুনিক চিকিৎসার দৃষ্টিতেও ঋতু মহিলাদের সুস্থতার প্রমাণ বহন করে। এর ব্যতিক্রম ঘটলে স্বাস্থের জন্য ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং স্বাস্থের ক্ষতি হয় এমন কাজ থেকে বিরত থাকা চাই। তারপরও যদি কোর মহিলা ওষুধ সেবন করে তা বন্ধ করে রাখে তাহলে তার কোন গোনাহ হবে না এবং তাকে নামায, রোযা ইত্যাদি সবই আদায় করতে হবে।

ইমাম সারাখসী আল মাবসূতে লিখেছেন,

الصوم ... وفي الشريعة عبارة عن إمساك مخصوص ، وهو الكف عن قضاء الشهوتين ، شهوة البطن وشهوة الفرج ، من شخص مخصوص ، وهو أن يكون

مسلما طاهرا من الحيض والنفاس ، في وقت مخصوص ، وهو ما بعد طلوع الفجر إلى وقت غروب الشمس ، بصفة مخصوصة ، وهو أن يكون على قصد التقرب.[552]

অর্থ: হায়েয-নেফাস থেকে পবিত্র কোন মুসলমান ব্যক্তি সাওয়াবের নিয়্যাতে ফজর উদিত হওয়া থেকে নিয়ে সূর্য্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌন চাহিদা মিটানো থেকে বিরত থাকার নাম রোযা।[৫৫৩]

হায়েয-নেফাস থেকে পবিত্র থাকা রোযা ফরয হওয়ার শর্ত। যেভাবেই পবিত্র থাকা হোক তা ধর্তব্য নয়।[৫৫৪]

১১ . রক্ত দেয়া ও নেয়া

রক্ত দিলে অথবা নিলে কোন অবস্থাতেই রোযা ভঙ্গ হবে না। কারণ রক্ত দিলেতো কোন বস্তু দেহের অভ্যন্তরে ঢুকেনি, তাই এতে রোযা ভঙ্গ হওয়ার প্রশ্ন আসে না।

আর রক্ত নিলে যদিও তা দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে কিন্তু তা রোযা ভঙ্গ হওয়ার গ্রহণযোগ্য খালি জায়গায় প্রবেশ করে না। তেমনি ভাবে গ্রহণযোগ্য রাস্তা দিয়েও প্রবেশ করে না বিধায় এতে রোযা ভঙ্গ হবে না।

১২. এনজিওগ্রাম (ANGIOGRAM)

এনজিওগ্রাম করলে রোযা ভঙ্গ হবে না। হার্টের রক্তনালী ব্লক হয়ে গেলে উরুর গোড়ার দিকে কেটে একটি বিশেষ ধমনীর ভেতর দিয়ে (যা হার্ট পর্যন্ত পোঁছে) ক্যাথেটার ঢুকিয়ে পরীক্ষা করাকে "এনজিওগ্রাম" বলে।

উক্ত ক্যাথেটারে কোন মেডিসিন লাগানো থাকলেও যেহেতু ক্যাথেটারটি রোযা ভঙ্গের কোন গ্রহণযোগ্য খালি জায়গায় ঢুকে না এবং গ্রহণযোগ্য রাস্তা দিয়েও ঢুকে না, তাই এতে রোযা ভঙ্গ হবে না।

---

552 المبسوط للسرخسي ، كتاب الصوم ، ٣ :٥٤ .

৫৫৩ আল মাবসূত লিস সারাখসী, খ. ৩, পৃ. ৫৪

৫৫৪ দেখুন, রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩২১

১৩. ইনজেক্শন (INJECTION)

ইন্জেকশন নিলে রোযা ভঙ্গ হবে না। চাই তা গোস্তে নেয়া হোক কিংবা রগে। কারণ যে রাস্তায় ইন্জেকশন দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ঐ রাস্তা রোযা ভঙ্গ হওয়ার গ্রহণযোগ্য ছিদ্র ও রাস্তা নয়।

১৪. স্যালাইন (SALINE)

স্যালাইন নিলে রোযা ভঙ্গ হবে না। কারণ স্যালাইন নেয়া হয় রগে। আর রগ রোযা ভঙ্গের গ্রহণযোগ্য ছিদ্র ও রাস্তা নয়। তবে রোযার দুর্বলতা দূর করার লক্ষ্যে স্যালাইন নেয়া মাকরূহ্।

১৫. ইনসুলিন (INSULINE)

ইনসুলিন নিলে রোযা ভঙ্গ হবে না। কারণ ইনসুলিন রোযা ভঙ্গ হওয়ার গ্রহণযোগ্য রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করে না এবং গ্রহণযোগ্য খালি জায়গায়ও পৌঁছে না।

১৬. পেশাবের রাস্তায় ওষুধ ব্যবহার (URINARY TRACT)

পেশাবের রাস্তায় ওষুধ ইত্যাদি ব্যবহার করলে রোযা ভঙ্গ হবে না। কারণ পেশাবের রাস্তা রোযা ভঙ্গ হওয়ার গ্রহণযোগ্য রাস্তা নয়। তেমনি ভাবে পেশাবের রাস্তা দিয়ে কোন বস্তু ভেতরে প্রবেশ করলে তা মুত্রথলীতে পৌঁছে মাত্র আর মুত্রথলী রোযা ভঙ্গ হওয়ার গ্রহণযোগ্য খালি জায়গা নয়।

১৭. যোনিদ্বারে ওষুধ ব্যবহার (VAGINA)

যোনিদ্বারে ওষুধ ইত্যাদি ব্যবহার করলে রোযা ভঙ্গ হবে না। কারণ যোনিদ্বার রোযা ভঙ্গ হওয়ার গ্রহণযোগ্য রাস্তা নয়। তেমনি ভাবে যোনিদ্বার দিয়ে কোন বস্তু ভেতরে প্রবেশ করলে তা এমনকোন খালি জায়গায় ঢুকে না, যেখানে ঢুকলে রোযা ভঙ্গ হয়। বরং জরায়ু তথা গর্ভাশয়ে ঢুকে আর গর্ভাশয় রোযা ভঙ্গের গ্রহণযোগ্য খালি জায়গা নয়।

১৮. সিষ্টোসকপি (CYSTOSCOPY)

সিষ্টোসকপি করলে রোযা ভাঙ্গবে না। অর্থাৎ পেশাবের রাস্তায় ক্যাথেটার লাাগালে ১৫ নং মাসআলায় উল্লিখিত কারণে রোযা ভঙ্গ হবে না।

১৯. গর্ভপাত (ABORTION) إسقاط الحمل

ক) এম, আর (M. R)

এম, আর করলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়। এম, আর হল, (Menstrual Regulation) মাসিক নিয়মিতকরণ।

গর্ভ ধারণের পাঁচ থেকে আট সপ্তাহের মধ্যে যোনিদ্বার দিয়ে জরায়ুতে “এম, আর” সিরিঞ্জ (Cannula) ঢুকিয়ে জীবিত কিংবা মৃত ভ্রূণ বের করে নিয়ে আসাকে “এম, আর” বলে। গর্ভ ধারণের কারণে ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায়, “এম, আর” এর কারণে ঋতুস্রাব নিয়মিত হয়ে যায় বিধায় এ পদ্ধতিকে "Menstrual Regulation" সংক্ষেপে "M. R" বলে।

উল্লেখ্য, যদিও “এম, আর” ডাক্তারদের পরিভাষায় গর্ভপাত কিন্তু শরীআতের দৃষ্টিতে “এম, আর” গর্ভপাতের হুকুমে নয়। কেননা “এম, আর” আট সপ্তাহের ভেতরে হয় আর এ সময়ে সাধারণত বাচ্চার কোন অঙ্গ, নখ, চুল ইত্যাদি প্রকাশ পায় না। আর কোন অঙ্গ প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে ভ্রূণ বেরিয়ে আসলে একে গর্ভপাত কিংবা وضع حمل বলা হয় না এবং এরপর যে স্রাব হয় একে ‘নিফাস’ও বলা হয় না। তথাপিও এম, আর করলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। কেননা এম, আর এর কারণে যে রক্ত বের হয় একে ‘মাসিক’ ধরা হয়। অতএব স্রাব শুরু হওয়ার কারণে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। হ্যাঁ যদি কোন মহিলার ইফতারের আগ মুহূর্তে “এম, আর” শুরু করা হয় ও ইফতারের সময় হওয়ার পর স্রাব শুরু হয় তাহলে তার ঐ দিনের রোযা হয়ে যাবে।

তবে কখনো ৪২ দিন মতান্তরে ৫২ দিনেও কোন অঙ্গ প্রকাশ হয়ে যায়। যদি কারোর ক্ষেত্রে এমন দেখা যায় তাহলে তা গর্ভপাত হিসেবে

ধর্তব্য হবে। তখন এক্ষেত্রে গর্ভপাতের কারণে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং পরবর্তী স্রাবও 'নিফাস' হিসেবে গণ্য হবে।

খ) ডি এন্ড সি (DILATATION AND CURETTAGE)

ডি এন্ড সি করলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। D&C (Dilatation and Curettage) হল, রাস্তা প্রসস্ত করা ও চেছে নিয়ে আসা।

আট সপ্তাহ থেকে দশ সপ্তাহের মধ্যে Dilator এর মাধ্যমে জীবিত কিংবা মৃত বাচ্চা বের করে নিয়ে আসাকে "Dilatation and Curettage" সংক্ষেপে "D&C" বলে।

এ সময়ের মধ্যে যেহেতু বাচ্চার অঙ্গ প্রকাশ পেয়ে যায়, তাই তা গর্ভপাতের হুকুমে হবে এবং এতে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে আর এর পরবর্তী স্রাব নিফাস হিসেবে গণ্য হবে।

২০. কপার-টি (COPER-T)

কপার-টি করলে রোযা ভাঙ্গবে না। কপার-টি বলা হয়, যোনিদ্বারে প্লাষ্টিক ফিট করা যাতে সহবাসের সময় বীর্য জরায়ুতে পৌঁছাতে না পারে। এমন করলে রোযা ভঙ্গ হবে না। কারণ যোনিদ্বার রোযা ভঙ্গ হওয়ার গ্রহণযোগ্য রাস্তা নয়। তবে কপার-টি লাগিয়ে সহবাস করলে রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং কাযা ও কাফ্‌ফারা উভয়টিই ওয়াজিব হবে।

২১. সাপজিটরি-ভোল্টালিন (SUPPOSITORY - VOLTALIN)

সাপজিটরি-ভোল্টারিন ব্যবহার করলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। অতিরিক্ত জ্বর কিংবা খুব বেশি ব্যথা দেখা দিলে ওষুধটি মলদ্বারে ব্যবহার করা হয়। এতে রোযা ভেঙ্গে যাবে। কারণ, যে সমস্ত রাস্তা দিয়ে দেহের অভ্যন্তরে কোন কিছু প্রবেশ করলে রোযা ভেঙ্গে যায় মলদ্বার তার একটি।

২২. ডুশ (DOUCHE)

ডুশ নিলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কারণ ডুশ মলদ্বারের মাধ্যমে দেহের ভেতরে প্রবেশ করে। মলদ্বার রোযা ভঙ্গ হওয়ার গ্রহণযোগ্য রাস্তা

এবং ডুশ যে জায়গায় প্রবেশ করে ঐ জায়গাও রোযা ভঙ্গ হওয়ার গ্রহণযোগ্য খালিস্থান।

২৩. প্রক্টোসকপি (PROCTOSCOPY)

প্রক্টোসকপি করলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। পাইলস, ফিশার, ফিষ্টুলা, অর্শ, বুটি ও হারিশ ইত্যাদি রোগের পরীক্ষাকে 'প্রক্টোসকপি' বলে। মলদ্বার দিয়ে নল ঢুকিয়ে এ পরীক্ষাটি করা হয়। যদিও নলটি পরোপুরি ভিতরে ঢুকে না, একাংশ বাইরে থাকে কিন্তু যাতে রোগী ব্যথা না পায় সে জন্য নলের মধ্যে গ্লিসারিন জাতীয় পিচ্ছিল কোন বস্তু ব্যবহার করা হয়। ডাক্তারদের মতানুসারে যদিও ঐ পিচ্ছিল বস্তুটি নলের সাথে চিমটে থাকে এবং নলের সাথেই বেরিয়ে আসে ভেতরে থাকে না, আর থাকলেও তা পরবর্তীতে বেরিয়ে চলে আসে শরীর তা চোষে না তথাপিও ঐ বস্তুটি ভেজা হওয়ার কারণে এবং কিছু সময় ভেতরে থাকার দরুণ রোযা ভেঙ্গে যাবে। আর এর মধ্যেই সতর্কতা। (وفيه الاحتياط)

২৪. ল্যাপারসকপি-বায়োপসি (LAPAROSCOPY-BIOPSY)

পেট ছিদ্র করে সিক জাতীয় একটি মেশিন ঢুকিয়ে পেটের ভেতরের কোন অংশ, গোস্ত ইত্যাদি পরীক্ষার জন্য বের করে আনা হয়। এতে রোযা ভঙ্গ হবে না। কারণ রোযা ভঙ্গ হওয়ার জন্য রোযা ভঙ্গকারী বস্তু ভেতরে পরিপূর্ণ ভাবে প্রবেশ করা ও প্রবেশের সাথে সাথে বের না হয়ে ভেতরে ততক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ী থাকা আবশ্যক, যতক্ষণ ভেতরে থাকলে ঐ বস্তু বা তার অংশবিশেষ হজম হয়ে যায়। এখানে এর কোনটিই পাওয়া যায়নি। তবে সিকের মধ্যে কোন প্রকার মেডিসিন লাগানো থাকলে এবং তা গলদ্বার থেকে নিয়ে মলদ্বার পর্যন্ত নাড়িভুঁড়ির যে কোন জায়গায় পৌঁছলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

২৫. সিরোদকার অপারেশন (SHIRODKAR OPERATION)

সিরোদকার অপারেশন করলে রোযা ভাঙ্গবে না। সিরোদকার অপারেশন হল অকাল গর্ভপাতের আশংকা থাকলে জরায়ুর মুখের

চতুরদিক সেলাই করে মুখকে খিচিয়ে রাখা হয়। এতে করে অকাল গর্ভপাত রোধ হয়। এর দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয় না। কেননা এমন করলে কোন বস্তু রোযা ভঙ্গ হওয়ার গ্রহণযোগ্য কোন খালি স্থানে পৌঁছে না।

উল্লেখ্য যে, সেলাই এর সময় সাধারণত কিছু রক্তক্ষরণ হয়ে থাকে। এতেও রোযা ভাঙ্গবে না। কেননা রক্ত বের হওয়া রোযা ভঙ্গের কোন কারণ নয়।

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه خير ال وأصحاب، وأسأل الله تعالى القبول وحسن ماب.

সমাপ্ত

তথ্যপুঞ্জি

ثبت المصادر والمراجع

١. القران الكريم

كتب التفسير وعلوم القرآن

٢-١. أحكام القران للجصاص

الإمام أبوبكر أحمد بن على الرازى الجصاص (٣٠٥-٣٧٠هـ)

٣-٢. أحكام القران للتهانوى

مجموعة من أعيان العلماء المفسرين والفقهاء المحدثين، مثل:

شيخ الإسلام العلامة ظفر أحمد العثمانى التهانوى (١٣١٠-١٣٩٤هـ)،

والشيخ العلامة محمد إدريس الكاندهلوى (١٣١٧-١٣٩٤هـ)،

والشيخ العلامة المفتى محمد شفيع الديوبندى (-١٣٩٦هـ)،

والشيخ العلامة المفتى جميل أحمد خان التهانوى، تحت إشراف حكيم الأمة مجدد الملة شاه أشرف على التهانوى (١٢٨٠-١٣٦٢هـ)

٤-٣. الجامع لأحكام القران للقرطبى

الإمام أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى (-٦٧١هـ)

٥-٤. تفسير عثمانى

شيخ الإسلام شبير أحمد العثمانى (-١٣٦٩هـ)

كتب الحديث و شروحه وتعليقاته

٦-١. إعلاء السنن

شيخ الإسلام العلامة ظفر أحمد العثمانى التهانوى (١٣١٠-١٣٩٤هـ)

٧-٢. أوجز المسالك

شيخ الحديث العلامة زكريا الكاندهلوى (١٣١٥-١٤٠٢هـ)

٨-٣. بذل المجهود شرح أبى داود

الإمام المحدث خليل أحمد السهارنفورى (١٢٦٩-١٣٤٦هـ)

٩-٤. بغية الزوائد فى تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

الشيخ عبدالله محمد الدرويش

١٠-٥. التعليق على جامع الأصول فى أحاديث الرسول

الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط

١١-٦. تكملة فتح الملهم

شيخ الإسلام العلامة المفتى محمد تقى العثمانى

١٢-٧. تلخيص الحبير فى تخريج أحاديث الرافعى الكبير

الحافظ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن على العسقلانى الشافعى (٧٧٣-٨٥٢هـ)

١٣-٨. تنظيم الأشتات شرح مشكاة المصابيح

العلامة أبو الحسن الجاتجامى البنغلاديشى

١٤-٩. جامع الأصول فى أحاديث الرسول

الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثيرالجزرى (٥٤٤-٦٠٦هـ)

١٥-١٠. الجامع السنن للترمذى

الأمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذى (٢١٠-٢٧٩هـ)

١٦-١١. الجامع الصحيح للبخارى

أمير المؤمنين فى الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخارى (-٢٥٦هـ)

١٧-١٢. الجامع الصحيح لمسلم

الإمام أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى (٢٠٤-٢٦١هـ)

١٨-١٣. الجوهر النقى

الإمام علاء الدين بن على بن عثمان الماردينى الشهير بابن التركمانى (-٧٤٥هـ)

١٩-١٤. حاشية الشيخ أحمد على السهارنفورى على صحيح البخارى

الشيخ المحدث أحمد على السهارنفورى الحنفى (-١٢٩٧هـ)

٢٠-١٥. السنن لابن ماجه

الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزوينى (٢٠٩-٢٧٣هـ)

٢١-١٦. السنن لأبى داؤود

الإمام أبو داؤود سليمان بن الأشعث السجستانى (٢٠٢-٢٨٥هـ)

٢٢-١٧. السنن للدارقطنى

الإمام أبو الحسن على بن عمر الشهير بالحافظ البغدادى (٣٠٦-٣٨٥هـ)

٢٣-١٨. السنن للدارمى

الإمام أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن بهرام الدارمى السمرقندى (-٢٥٥هـ)

٢٤-١٩. السنن الكبرى

الإمام الحافظ أبوبكر أحمد بن الحسن البيهقى (-٤٥٨هـ)

٢٥-٢٠. السنن للنسائى

الإمام عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن على النسائى (٢١٥-٣٠٣هـ)

٢٦-٢١. شرح معانى الآثار

الإمام أبوجعفر أحمد بن محمد بن سلمة الأزدى الطحاوى (-٣٢١هـ)

٢٧-٢٢. شمائل الترمذى

الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذى (٢١٠-٢٧٩هـ)

٢٨-٢٣. صحيح ابن حبان

الإمام الحافظ محمد بن حبان بن أحمد بن حبان (-٢٧٠هـ)

٢٩-٢٤. صحيح ابن خزيمة

الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمى النيسابورى (٢٢٣-٣١١هـ)

٣٠-٢٥. عارضة الأحوذى بشرح صحيح الترمذى

الإمام الحافظ أبوبكر محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله
المعروف بابن العزلى المالكى (-٥٤٣هـ)

٣١-٢٦. عمدة القارى شرح صحيح البخارى

شيخ الإسلام بدر الدين أبو محمد محمود ابن أحمد الحلبى العينى (٧٢٥-٨٥٥هـ)

٣٢-٢٧. عون المعبود شرح سنن أبى داود

الشيخ أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادى

٣٣-٢٨. فتح البارى شرح صحيح البخارى

الحافظ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن على العسقلانى الشافعى (٧٧٣-٨٥٢هـ)

٣٤-٢٩. فيض البارى شرح صحيح البخارى

إمام العصر العلامة أنور شاه الكشميرى (-١٣٥٢هـ)

٣٥-٣٠. كتاب الآثار

الإمام محمد بن الحسن الشيباني (١٣٢-١٨٩هـ)

٣٦-٣١. كنـــز العمال في سنن الأقوال والأفعال

الإمام علاء الدين على المتقى بن حسام الدين الهندى البرهانفورى (-٩٧٥هـ)

٣٧-٣٢. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

الإمام الحافظ نور الدين على بن أبي بكر الهيثمى (٧٣٥-٨٠٧هـ)

٣٨-٣٣. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

الإمام على بن سلطان محمد القارى (-١٠١٤هـ)

٣٩-٣٤. المستدرك للحاكم

الإمام الحافظ أبو عبدالله محمد بن عبدالله النيسابورى المعروف بالحاكم (-٤٠٥هـ)

٤٠-٣٥. مسند الإمام أحمد بن حنبل

الإمام الحافظ أبو عبدالله أحمد بن حنبل (١٤٦-٢٤١هـ)

٤١-٣٦. مسند الإمام الأعظم أبي حنيفة

الإمام الأعظم أبو حنيفة نعمان بن ثابت الكوفى (٨٠-١٥٠هـ)

٤٢-٣٧. مسند البزار

الإمام الحافظ أبوبكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار (-٢٩٢هـ)

٤٣-٣٨. مسند الدارمى

الإمام أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن بهرام الدارمى السمرقندى (-٢٥٥هـ)

٤٤-٣٩. مشكاة المصابيح

الإمام ولى الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله الخطيب التبريزى (-٧٣٧هـ)

٤٥-٤٠. المصنف لابن أبي شيبة

الإمام الحافظ عبدالله بن محمد ابن شيبة إبراهيم بن عثمان
بن أبي بكر بن شيبة الكوفى (-٢٣٥هـ)

٤٦-٤١. المصنف لعبد الرزاق

الإمام الحافظ أبو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعانى (١٢٦-٢١١هـ)

٤٧-٤٢. معارف السنن

علامة العصر السيد محمد يوسف البنورى (-١٣٩٧هـ)

٤٨-٤٣. المعجم الأوسط للطبرانى

الإمام أبوالقاسم سليمان بن أحمد الطبرانى (٢٦٠-٣٦٩هـ)

٤٩-٤٤. المعجم الصغير للطبرانى

الإمام أبوالقاسم سليمان بن أحمد الطبرانى (٢٦٠-٣٦٩هـ)

٥٠-٤٥. المعجم الكبير للطبرانى

الإمام أبوالقاسم سليمان بن أحمد الطبرانى (٢٦٠-٣٦٩هـ)

٥١-٤٦. المنهاج فى شرح صحيح مسلم بن الحجاج

شيخ الإسلام الإمام محى الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووى (٦٣١-٦٧٧هـ)

٥٢-٤٧. موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

الإمام الحافظ نور الدين على بن أبى بكر الهيثمى (٧٣٥-٨٠٧هـ)

كتب الفقه والفتاوى

٥٣-١. أحسن الفتاوى

العلامة المفتى رشيد أحمد اللدهيانوى

٥٤-٢. إمداد الفتاوى

حكيم الأمة مجدد الملة شاه أشرف على التهانوى (١٢٨٠-١٣٦٢هـ)

٥٥-٣. البحر الرائق شرح كنــز الدقائق

الشيخ العلامة زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم المصرى الحنفى (٩٢٦-٩٧٠هـ)

٥٦-٤. بحوث فى قضايا فقهية معاصرة

شيخ الإسلام العلامة المفتى محمد تقى العثمانى

٥٧-٥. بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع

الشيخ علاء الدين أبوبكر بن سعود الكاسانى الحنفى الملقب بملك العلماء (-٥٨٧هـ)

٥٨-٦. التاج والإكليل لمختصر خليل على هامش مواهب الجليل

الشيخ العلامة أبوعبدالله محمد بن يوسف المواق (-٨٩٧هـ)

٥٩-٧. تبيين الحقائق شرح كنــز الدقائق

الشيخ العلامة فخر الدين عثمان بن على الزيلعى الحنفى (-٧٤٣هـ)

٦٠-٨. تحفة الفقهاء

الشيخ العلامة علاء الدين محمد بن أحمد بن أبى أحمد السمرقندى (-٥٣٩هـ)

٦١-٩. حاشية الخرشى على مختصر سيدى الخليل

الشيخ العلامة أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن على الخرشى (-١١٠١هـ)

٦٢-١٠. خلاصة الفتاوى

الشيخ الإمام الفقيه طاهر بن عبدالرشيد البخارى (-٥٤٣هـ)

٦٣-١١. الدر المختار شرح تنوير الأبصار

الشيخ العلامة علاء الدين محمد بن على بن محمد الدمشقى

الشهير بالحصكفى (١٠٢٥-١٠٨٨هـ)

٦٤-١٢. رد المحتار الشهير بالفتاوى الشامية

خاتمة المحققين محمد بن أمين بن عمر المعروف بابن عابدين الشامى (١١٩٨-١٢٥٢هـ)

٦٥-١٣. روضة الطالبين وعمدة المفتين

شيخ الإسلام الإمام محى الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووى (٦٣١-٦٧٧هـ)

٦٦-١٤. السعاية

الشيخ العلامة محمد عبدالحى اللكنوى (١٢٦٤-١٣٠٤هـ)

٦٧-١٥. شرح السير الكبير

الشيخ الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن أبى سهل

المعروف بشمس الأئمة السرخسى (-٤٨٣هـ)

٦٨-١٦. شرح السير الكبير

الإمام الفقيه فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندى المعروف بقاضيخان (-٥٩٢هـ)

٦٩-١٧. الشرح الكبير على متن المقنع بهامش المغنى

الشيخ العلامة شمس الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن

أبى عمر محمد بن محمد ابن قدامة المقدسى (-٦٨٢هـ)

٧٠-١٨. ضابط المفطرات

الشيخ العلامة المفتى الأعظم بباكستان محمد رفيع العثمانى

٧١-١٩. العناية شرح الهداية على هامش فتح القدير

الإمام اكمل الدين محمد بن محمود البابرتى (-٧٨٦هـ)

٧٢-٢٠. الفتاوى الخانية المعروف بفتاوى قاضيخان على هامش الهندية

الإمام الفقيه فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندى المعروف بقاضيخان (-٥٩٢هـ)

٧٣-٢١. فتاوى دارالعلوم ديوبند (جديد)

العلامة المفتى الأعظم عزيز الرحمن العثمانى (١٢٧٥-١٣٣٤هـ)

٧٤-٢٢. الفتاوى الهندية المعروف بالعالمكيرية

العلامة نظام وجماعة من علماء الهند الأعلام

٧٥-٢٣. فتح العلى المالك فى الفتوى على مذهب مالك

الشيخ محمد بن أحمد بن محمد عليش المغربى مفتى المالكية بمصر (١٢١٧-١٢٩٩هـ)

٧٦-٢٤. فتح القدير

الإمام المحقق كمال الدين محمد بن عبدالواحد المعروف بابن الهمام (٧٩٠-٨٦١هـ)

٧٧-٢٥. الفقه الإسلامى وأدلته

الدكتور وهبة الزحيلى

٧٨-٢٦. قرارات مجلة المجمع الفقه الإسلامى

جماعة من العلماء الأعلام

٧٩-٢٧. الكفاية شرح الهداية على هامش فتح القدير

الإمام السيد جلال الدين الكرلانى الخوارزمى (-٧٦٧هـ)

٨٠-٢٨. المبسوط للإمام محمد

الإمام محمد ابن الحسن الشيبانى (١٣٢-١٨٩هـ)

٨١-٢٩. المبسوط لشمس الأئمة السرخسى

الشيخ الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن أبى سهل
المعروف بشمس الأئمة السرخسى (-٤٨٣هـ)

٨٢-٣٠. المحلى فى الخلاف العالى

الحافظ أبومحمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهرى (٣٨٤-٤٥٦هـ)

٨٣-٣١. مجموعة فتاوى ابن تيمية

شيخ الإسلام تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (٦٦١-٧٢٨هـ)

٨٤-٣٢. مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة

الشيخ عبد العزيز بن باز

٨٥-٣٣. مراقى الفلاح (إمداد الفتاح) شرح نور الإيضاح

الشيخ العلامة حسن بن عمار الشرنبلالى (-١٠٦٩هـ)

٨٦-٣٤. المغنى

الشيخ الإمام موفق الدين أبومحمد عبدالله بن أحمد بن قدامة (-٦٢٠هـ)

٨٧-٣٥. منتخبات نظام الفتاوى

المفتى محمد نظام الدين الأعظمى

٨٨-٣٦. منح الجليل شرح مختصر الخليل

الشيخ محمد بن أحمد بن محمد عليش المغربى مفتى المالكية بمصر (١٢١٧-١٢٩٩هـ)

٨٩-٣٧. مواهب الجليل بشرح مختصر خليل

الإمام أبوعبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن المغربى

المعروف بالحطاب الرعينى (٩٠٢-٩٥٤هـ)

٩٠-٣٨. الهداية

شيخ الإسلام برهان الدين على بن أبى بكر المرغينانى (٥١١-٥٩٣هـ)

كتب أصول الفقه وقواعده

٩١-١. الأشباه والنظائر

الشيخ زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم المصرى الحنفى (٩٢٦-٩٧٠هـ)

٩٢-٢. أصول الإفتاء

شيخ الإسلام العلامة المفتى محمد تقى العثمانى

٩٣-٣. أصول الفقه الإسلامى

٩٤-٤. تسهيل الوصول إلى علم الأصول

الشيخ العلامة محمد عبدالرحمن المحلاوى الحنفى

٩٥-٥. تيسير التحرير

الشيخ العلامة محمد أمين بن الشريف المعروف بأميربادشاه البخارى الحنفى (-٩٧٢هـ)

٩٦-٦. حاشية نور الأنوار المسماة بقمر الأقمار

الشيخ العلامة عبد الحليم اللكنوى (١٢٣٩-١٢٨٥هـ)

٩٧-٧. شرح الحموى على الأشباه والنظائر

الشيخ العلامة السيد أحمد بن محمد الحموى (-١٠٩٨هـ)

٩٨-٨. شرح عقود رسم المفتى

خاتمة المحققين محمد بن أمين بن عمر المعروف بابن عابدين الشامى (١١٩٨-١٢٥٢هـ)

٩٩-٩. شرح المجلة

العلامة محمد خالد الأتاسى

١٠٠-١٠. الشرح الناضر (تسكين الأرواح والضمائر) فى شرح الأشباه والنظائر [المخطوطة]

الشيخ العلامة المفتى محمد دلاورحسين

١٠١-١١. كشف الأسرار فى شرح المنار

الشيخ الإمام أبوالبركات عبدالله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفى (-٧١٠هـ)

١٠٢-١٢. كنــز الوصول إلى معرفة الأصول المعروف بأصول البزدوى

الإمام فخر الإسلام على بن محمد البزدوى (-٤٨٢هـ)

١٠٣-١٣. مجموعة قواعد الفقه

العلامة المفتى عميم الإحسان المجددى البنغلاديشى (١٣٢٩-١٣٩٠هـ)

١٠٤-١٤. منتخب الحسامى

الشيخ العلامة أبوعبد الله محمد حسام الدين بن محمد بن عمر الحسامى (-٦٤٤هـ)

١٠٥-١٥. نور الأنوار

العلامة الشيخ أحمد المدعو بملاجيون الجونفورى (-١١٣٠هـ)

كتب اللغات

١٠٦-١. الإفصاح فى فقه اللغة

حسين يوسف موسى و عبد الفتاح الصعيدى

١٠٧-٢. تاج العروس للزبيدى الهندى

محب الدين أبو الفيض السيد محمد مرتضى الزبيدى الهندى الحسينى (١١٤٥-١٢٠٥هـ)

١٠٨-٣. لسان العرب

العلامة أبوالفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقى المصرى (٦٣٠-٧١١هـ)

١٠٩-٤. معجم لغة الفقهاء (عربى-انكليزى-إفرنسى)

محمد رواس قلعة جى

١١٠-٥. معجم المصطلحات للألفاظ الفقهية

الدكتور عبد الرحمن عبد المنعم

١١١-٦. المورد (عربى-انكليزى)

الدكتور روحى البعلبكى

١١٢-٧. المورد (انكليزى-عربى)

منير البعلبكى

كتب الرجال والتاريخ والسيرة

١١٣-١. الاستيعاب فى معرفة الأصحاب

الحافظ أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد ابن عبدالبر النمرى القرطبى (٣٦٨-٤٦٣هـ)

١١٤-٢. تاريخ ابن خلدون

العلامة عبد الرحمن بن خلدون (٧٣٢-٨٠٨هـ)

١١٥-٣. تهذيب التهذيب

الحافظ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن على العسقلانى الشافعى (٧٧٣-٨٥٢هـ)

١١٦-٤. زاد المعاد فى هدى خير العباد

الإمام شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبى بكر الزرعى الدمشقى المعروف بابن قيم الجوزية (٦٩١-٧٥١هـ)

١١٧-٥. سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد

الإمام محمد بن يوسف الصالحى الشامى (-٩٤٢هـ)

١١٨-٦. الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة

الإمام الحافظ أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى (-٧٤٨هـ)

المتفرقات

١١٩-١. إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

السيد محمد بن محمد الحسينى الزبيدى (١١٤٥-١٢٠٥هـ)

١٢٠-٢. التشريع الجنائى الإسلامى

الدكتور عبد القادر عودة (-١٣٧٤هـ)

١٢١-٣. جهان ديده

شيخ الإسلام العلامة المفتى محمد تقى العثمانى

١٢٢-٤. حجة الله البالغة

شيخ الإسلام المحدث شاه ولى الله الدهلوى (-١١٧٦هـ)

١٢٣-٥. الطب النبوى لابن القيم

شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبى بكر المعروف بابن القيم الجوزية (-٧٥١هـ)

١٢٤-٦. القانون لأبن سينا

- - - -

١٢٥-٧. الموافقات فى أصول الشريعة

الشيخ أبوإسحاق ابراهيم بن موسى اللخيمى الغرناطى المالكى (-٧٩٠هـ)

١٢٦-٨. বিজ্ঞানের আলোকে কুরআনের অলৌকিকতা

ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আব্দুল হাই

١٢٧-٩.قرارات مجلة مجمع الفقه الإسلامي

١٢٨-١٠. جينتيك سائنس

বের হয়েছে!! বের হয়েছে!!!

শবে বরাত সম্পর্কে সব ধরণের বিভ্রান্তি খন্ডন করে শবে বরাতের বাস্তবতা, ফযীলত এবং করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে অত্যন্ত তথ্যবহুল ও প্রামাণ্য আলোচনা স্থান পেয়েছে এ গ্রন্থটিতে।

শবে বরাতের তত্ত্বকথা

শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী
মাওলানা মুফতী দিলাওয়ার হোসাইন

শীঘ্রই আসছে!! শীঘ্রই আসছে!!!

শিক্ষা কি ও কেন? কুরআন-হাদীসের পাশাপাশি যুক্তিভিত্তিক ও আকর্ষণীয় দৃষ্টান্তবলীর সমন্বয়ে এক অতুলনীয় বয়ান সংকলন। যা আলেম-উলমা ও জেনারেল শিক্ষিতসহ সকল স্তরের মানুষের আত্মার খোরাক যোগাবে। ইনশাআল্লাহ!

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড, তবে কোন শিক্ষা?

মাওলানা মুফতী দিলাওয়ার হোসাইন

যোগাযোগ ঃজামি'আ ইসলামিয়া দারুল উলূম ঢাকা (মসজিদুল আকবার), ব্লক-সি ও ই, প্লট- ম-৩, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬। মোবাইল: ০১৯১৯-০০১২০০